মাছ চাষ ম্যানুয়েল

মৎস্য অধিদপ্তর
মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়

সম্পাদনায়
সমরেন্দ্র নাথ চৌধুরী, জাতীয় সমন্বয়কারী, মাচ প্রকল্প
ডঃ এম জি হোসেন, পরিচালক, বাংলাদেশ মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট
মোঃ মোকাম্মেল হোসেন, উপ-পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
মুহম্মদ শহীদুল ইসলাম, উপ-পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
এস,এম, মাহবুর রশিদ খাঁন, জনসংযোগ কর্মকর্তা, বিএফডিসি

প্রকাশনায়
মহাপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

প্রকাশকাল
আগষ্ট ২০০২

আর্থিক সহায়তায়
চতুর্থ মৎস্য প্রকল্প,
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ।

প্রচ্ছদ
সৈয়দ রাকিবুল মইন রুমী, উর্দ্ধতন ফটো আর্টিষ্ট, সামুদ্রিক মৎস্য জরীপ ব্যবস্থাপনা ইউনিট, চট্টগ্রাম

চিত্রাঙ্কন
মোঃ নজরুল ইসলাম তাপস, উপ-সহকারী পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর

মুদ্রণ
আলম প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস
১১৯/৩, ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

প্রচার সংখ্যা
৬৫০০ কপি

যারা লিখেছেন

ক্রমিক নং	নাম	অধ্যায়
১।	সমরেন্দ্র নাথ চৌধুরী, মাচ প্রকল্প	প্রথম ও দ্বিতীয়
২।	মোঃ মনিরুজ্জামান, মৎস্য অধিদপ্তর	তৃতীয়
৩।	মোঃ আবুল হাছানাত, মৎস্য অধিদপ্তর	চতুর্থ
৪।	মোঃ অহিদুজ্জামান, মৎস্য অধিদপ্তর	পঞ্চম
৫।	ডঃ খবির উদ্দিন আহমেদ, বিএআরসি	ষষ্ঠ
৬।	ডঃ এম জি হোসেন, বিএফআরআই হাবিবুর রহমান খন্দকার, মৎস্য অধিদপ্তর মোঃ রেজাউল করিম, মৎস্য অধিদপ্তর	সপ্তম
৭।	ডঃ এস এম নাজমুল ইসলাম, মৎস্য অধিদপ্তর ডঃ এম জি হোসেন, মৎস্য অধিদপ্তর কে ইউ এম সহিদুর রহমান, মৎস্য অধিদপ্তর	অষ্টম
৮।	মোঃ আবুল হাছানাত, মৎস্য অধিদপ্তর	নবম
৯।	মোঃ সানাউল্লাহ, মৎস্য অধিদপ্তর	দশম
১০।	মালিক জুলফিকার আহমদ, মৎস্য অধিদপ্তর	একাদশ
১১।	মোঃ রফিকুল ইসলাম, মৎস্য অধিদপ্তর	দ্বাদশ
১২।	বিজয় রঞ্জন সাহা, মৎস্য অধিদপ্তর	ত্রয়োদশ
১৩।	মোঃ অহিদুজ্জামান , মৎস্য অধিদপ্তর বিজয় রঞ্জন সাহা, মৎস্য অধিদপ্তর মোঃ মনিরুজ্জামান, মৎস্য অধিদপ্তর	চতুর্দশ

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

১. **প্রথম অধ্যায়** ১৫-১৮

ম্যানুয়েলের উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু

- বাংলাদেশে মাছের গুরুত্ব
- মাছ চাষে জনগণের ভূমিকা
- বাংলাদেশে মাছ চাষ যোগ্য জলাভূমি

২. **দ্বিতীয় অধ্যায়** ১৯-৩৬

চাষ যোগ্য মাছের প্রজাতি

- কতিপয় মাছ চাষ যোগ্য প্রজাতির জীবন-বৃত্তান্ত ,
  রুই,কাতলা, মৃগেল, কালবাউস, পাংগাস(থাই), নাইলোটিকা, শিং,মাগুর, কই,পাবদা, গলদা চিংড়ি, গ্রাস কার্প, সিলভার কার্প, বিগহেড কার্প,মিরর কার্প,কমন কার্প,রাজপুঁটি।

৩. **তৃতীয় অধ্যায়** ৩৭-৮০

গ্রামীণ পুকুরে মাছচাষ প্রযুক্তি প্রয়োগ ও ব্যবস্থাপনা

- স্থায়ী পুকুরে মাছচাষ
- কার্পজাতীয় মাছের মিশ্রচাষ
  পুকুরের স্থান নির্বাচন, পুকুর প্রস্তুতি, জলজ আগাছা পরিস্কার, রাক্ষুসে ও অচাষযোগ্য মাছ অপসারণ, চুন ও সার প্রয়োগ, পানি সংগ্রহ , পোনা মজুদ, পোনা ছাড়ার পদ্ধতি।
- মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা
  সার প্রয়োগ, সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ, পুকুরের তলদেশ পরিচর্যা, মাছের স্বাস্থ্য ও বৃদ্ধি পরীক্ষণ, মাছ আংশিক আহরণ, সম্ভাব্য আয়-ব্যয়।
- কার্প ও গলদা চিংড়ির চাষ
  পুকুরের বৈশিষ্ট,পোনা ছাড়ার আগে গুরুত্বপূর্ণ কাজ, পাড় সংস্কার, পুকুরের তলা সংস্কার,আগাছা পরিস্কার, রাক্ষুসে ও অচাষযোগ্য মাছ দূরীকরণ, রোটেনন প্রয়োগ, মহুয়ার খৈল প্রয়োগ, চুন প্রয়োগ, চুনের উপকারিতা, সার প্রয়োগ, সারের পরিমাণ ও ব্যবহার পদ্ধতি, প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা, পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা,চিংড়ির আশ্রয়স্থল স্থাপন, পোনা নির্বাচন, সবল পোনা সনাক্তকরণ, পোনা পরিবহণ, পোনা মজুদ, মজুদ পরবর্তী পরিচর্যা কাজ, চিংড়ি ও কার্পের জন্য বিবেচ্য বিষয়, প্রতিদিনের করণীয়,মাছ চাষে কিছু সমস্যা ও প্রতিকার, সম্ভাব্য উৎপাদন ও আয়-ব্যয়।
- পাংগাস মাছের চাষ
  পুকুর প্রস্তুতি, পোনা মজুদ, সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ, স্বাস্থ্য ও বৃদ্ধি পরীক্ষা, সম্ভাব্য আয়-ব্যয়।
- দেশী মাগুর ও শিং এর চাষ
  পুকুর প্রস্তুতি, পোনা মজুদ, সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ, আহরণ ও বাজারজাতকরণ, সম্ভাব্য উৎপাদন, আয়-ব্যয়।

- মৌসুমি পুকুরে মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা
  গিফট জাতের তেলাপিয়া চাষ, রাজপুটির চাষ, পোনার চাষ।
- ক্ষেত্র বিশেষ পরিহারযোগ্য মাছের প্রজাতি।
- আফ্রিকান মাগুর, তেলাপিয়া, কমন কার্প, গ্রাসকার্প, শোল, বোয়াল, গজার।

৪ **চতুর্থ অধ্যায়** ৮১-৯৯

পুকুরের সমন্বিত মাছচাষ

- সমন্বিত মাছ চাষের উপযোগিতা ,সমন্বিত মাছ চাষের ক্ষেত্র সমূহ
- মাছ ও মুরগীর সমন্বিত চাষ
  পুকুর নির্বাচন ও প্রস্তুতকরণ, পোনার প্রজাতি নির্বাচন, পোনা মজুদ, মুজদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা, মাছ আহরণ ও বাজারজাতকরণ, মুরগি পালন, মুরগির ঘর তৈরী, মুরগির সংখ্যা, মুরগির খাদ্য, প্রয়োগ ও পরিচর্যা, উৎপাদন, সম্ভাব্য আয়-ব্যয়।
- হাঁস ও মাছের সমন্বিত চাষ
  হাঁসের জাত, হাঁসের সংখ্যা, পরিচর্যা, রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকার, উন্নত জাতের হাঁস ও বাচ্চার প্রাপ্তিস্থান, সম্ভাব্য আয়-ব্যয়।
- মাছ ও গবাদি পশুর সমন্বিত চাষ
  গরুর পরিচর্যা, পুকুর ব্যবস্থাপনা।

৫ **পঞ্চম অধ্যায়** ১০০-১২৯

বাণিজ্যিক মাছ চাষ

- বাংলাদেশে বাণিজ্যিক মাছ চাষের সম্ভাবনা, উন্নত প্রযুক্তি, জমি ও জলাভূমি, উৎপাদন সম্ভাবনা, কারিগরী জনবল, বাণিজ্যিক খামারের বৈশিষ্টসমূহ, বাণিজ্যিক খামার স্থাপন।
- বাণিজ্যিক মৎস্য খামার ব্যবস্থাপনা
  র্পের মিশ্রচাষ, পুকুর প্রস্তুতি, চুন প্রয়োগ, সার প্রয়োগ, পোনা মুজদ, মুজদ পরবর্তী পরিচর্যা, সতর্কতা অবলম্বন, সম্ভাব্য আয়-ব্যয়।
- থাই পাংগাস চাষ
  াষের সম্ভাবনা, পুকুর প্রস্তুতি, রাক্ষুসে ও অচাষযোগ্য মাছ দূরীকরণ, পাড় ও তলা মেরামত, চুন প্রয়োগ, সার প্রয়োগ, পোনা মজুদ, খাদ্য প্রয়োগ, পরিচর্যা, আহরণ ও বাজারজাতকরণ, সম্ভাব্য আয়-ব্যয়।
- গিফট জাতের তেলাপিয়ার চাষ
  চাষ পদ্ধতি, পোনা মজুদ, চাষ ব্যবস্থাপনা, সম্ভাব্য আয়-ব্যয়।
- বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা
  সমন্বিত মাছ ও মুরগি চাষ, চাষের বৈশিষ্ট, ঘর তৈরী, জাত নির্বাচন, মুরগির সংখ্যা, মুরগির সুষম খাবার, মাছ চাষ পদ্ধতি, মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা, সম্ভাব্য আয়-ব্যয়।

- বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গলদা চিংড়ির চাষ
  পুকুর প্রস্তুতি, পোনা মজুদ, পরিচর্যা, সম্ভাব্য আয়-ব্যয়।
- উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ।

৬ **ষষ্ঠ অধ্যায়** ১৩০-১৩৯

ধান ক্ষেতে মাছচাষ

- ধানের সাথে মাছচাষ, উপযোগী জমি, ভৌত কার্যক্রম, ধান চাষ ও ব্যবস্থাপনা, মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা, পোনা মজুদ, বাড়তি খাদ্য প্রয়োগ, ধান কাটা ও মাছ ধরা ,ফলন, ধান ক্ষেতে পোনার চাষ।
- ধানের পরে মাছের চাষ
  বাঁধ নির্মাণ, সংযোগ নালা খনন ।
- বৃহদাকার ধানের মাঠে সমবায় ভিত্তিতে মাছচাষ
  সাংগঠনিক ব্যবস্থা, ধান ক্ষেত মাছ চাষের উপযুক্ত করা, চুন প্রয়োগ, সার প্রয়োগ,পোনা মজুদ, সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ, আহরণ, উৎপাদন, সম্ভাব্য আয়-ব্যয়।

৭ **সপ্তম অধ্যায়** ১৪০-১৫২

দেশী ছোট মাছের চাষ

- ছোট মাছ কি, ছোট মাছের গুরুত্ব, মলা, চেলা, পুঁটির চাষ, পাবদা মাছের চাষ, গুলশা মাছের চাষ, দেশী সরপুঁটির চাষ, কৈ মাছের চাষ, কাঁকড়ার চাষ।

৮ **অষ্টম অধ্যায়** ১৫৩-১৬৩

অপ্রচলিত জলাভূমিতে মাছচাষ ব্যবস্থাপনা

- বিল-বাওড়ে মাছচাষ ব্যবস্থাপনা
  আগাছা দমন, পোনা মুজদ, অবকাঠামো উন্নয়ন ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, মাছ আহরণ ও উৎপাদন।
- প্লাবনভুমিতে পেনে মাছ চাষ ।
  পেনে মাছ চাষ কি, পেনে মাছ চাষের গুরুত্ব, চাষ পদ্ধতি, ব্যবস্থাপনা ,উৎপাদন ।
- মহাসড়ক ও রেলওয়ের পাশের জলাশয়ে মাছচাষ
  জলাশয় প্রাপ্তি, জরিপ ও চিহ্নিতকরণ, দল গঠন, জলাশয় উন্নয়ন, মাছ চাষ প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা।

৯ **নবম অধ্যায়** ১৬৪-১৮৬

মৎস্য হ্যাচারী ব্যবস্থাপনা ও পোনা উৎপাদন

- দেশে মাছের পোনা উৎপাদন ও চাহিদা।
- পোনার গুণাগুণ রক্ষায় কতিপয় সমস্যা।
  মাছ নির্বাচনের ঋনাত্মক প্রবনতা, অন্তঃপ্রজনন, অপরিকল্পিত সংকরায়ন, অপরিণত মাছের প্রজনন।

- পোনার গুণাগুণ রক্ষায় করণীয়
  নদী উৎসের ব্রুড ব্যবস্থাপনা, হ্যাচারীর মধ্যে ব্রুড বিনিময়, দ্রুত বর্ধনশীল পোনা বাছাই করে ব্রুড তৈরী, উন্নত ব্রুড জাত সংগ্রহ ,সংকরায়ন বন্ধকরণ, প্রজনন কাজে অতি ঘনিষ্ট ব্রুড বাছাই না করা, প্রজননের জন্য উপযুক্ত বয়স ও ওজনের ব্রুড মাছ ব্যবহার করা।
- মৎস্য হ্যাচারী নির্মাণ
  স্থান নির্বাচন, অবকাঠামো নির্মাণ, গভীর / অগভীর নলকুপ স্থাপন, বিভিন্ন ধরণের পুকুর খনন।
- হ্যাচারী পরিচালনা
  ব্রুড মাছ পরিচর্যা, প্রজননক্ষম মাছ নির্বাচন, ব্রুড মাছ পরিবহণ,হরমোন ইনজেকশন প্রয়োগ।
- বিভিন্ন প্রজাতির প্রজনন পদ্ধতি
  রুই জাতীয় দেশী মাছের প্রজনন, বিদেশী কার্প জাতীয় মাছের প্রজনন, পাংগাস মাছের প্রজনন, ডিম ফুটানো ও রেণুর পরিচর্যা।
- পোনার চাষ ব্যবস্থা
  পুকুর নির্বাচন, প্রস্তুতি, রাক্ষুসে মাছ অপসারণ, চুন ও সার প্রয়োগ, প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা, পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা, ক্ষতিকারক পোকা মাকড় দমন, রেণু পরিবহণ ও নার্সারী পুকুরে মজুদ করা, মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা, পোনা আহরণ ও বিক্রয়।
- পোনা পরিবহণ ব্যবস্থা
  সনাতন পদ্ধতি , আধুনিক পদ্ধতি, পোনা পরিবহণে লক্ষণীয় বিষয়।
- মাঠ পর্যায়ে পোনা সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।

১০ **দশম অধ্যায়** ১৮৭-১৯২

মাছের রোগ ও প্রতিকার

- বিভিন্ন প্রকার রোগ-বালাই এর লক্ষণ কারণ ও সম্ভাব্য প্রতিষেধক / প্রতিকার।

১১ **একাদশ অধ্যায়** ১৯৩-২০৪

প্রযুক্তি প্যাকেজ ও হস্তান্তর

- হস্তান্তর যোগ্য প্রযুক্তি প্যাকেজ এর বিবরণ ও প্রয়োগক্ষেত্র।

১১ **দ্বাদশ অধ্যায়** ২০৫-২১১

মৎস্য প্রক্রিয়াজাত ও বাজারজাতকরণ

- অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজার , বিভিন্ন প্রকার প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি, বরফ দ্বারা সংরক্ষণ, হিমায়িত করে সংরক্ষণ, কৌটাজাত করে সংরক্ষণ, শুটকী তৈরী করা, রোদে শুকিয়ে শুটকী করা, লবণাক্ত করে সংরক্ষণ, লবণ ও রোদে শুকিয়ে , ধুমায়িত করে শুটকী, সোলার ড্রায়ারের সাহায্যে, যান্ত্রিক ড্রায়ারের সাহায্যে, শুটকী সংরক্ষণ ব্যবস্থা, সিদল শুটকী, উন্নত ও স্বাস্থ্যসম্মত বাজার ব্যবস্থা, পরিবহণ।

১২ ত্রয়োদশ অধ্যায় ২১২-২১৪

ব্যাংক ঋণ প্রাপ্তির নিয়ম ও পদ্ধতি

- ঋণদান কর্মসূচী, আবেদনকারীর যোগ্যতা, আবেদনপত্র দাখিল, জামানত ও দলিলপত্র, দরখাস্ত গ্রহণের সময়সূচী, ঋণ মঞ্জুর, ঋণের সর্বোচ্চ সীমা, ঋণ পরিশোধ, সুদের হার, ঋণ ব্যবহারের তদারকি ও আদায়।

১৪ চতুর্দশ অধ্যায় ২১৫-২২২

মাছ চাষের উপকরণ ও প্রাপ্তিস্থান

- পোনা, সার, সম্পূরক খাদ্য, জাল ও ঔষধপত্র, পরামর্শ সেবা , মাছ চাষের উপকরণ সমূহের প্রাপ্তিস্থান।
- পরিমাপসমূহ।

নির্ঘন্ট ২২৩-২২৭

প্রথম অধ্যায়

ম্যানুয়েলের উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু

এই ম্যানুয়েলে মুলতঃ স্বাদু পানিতে মাছ চাষ সংক্রান্ত সকল বিষয় এবং তার সাথে উৎপাদিত মাছ যাতে সুষ্ঠুভাবে বাজারজাত ও সংরক্ষণ করা যায় সে বিষয়েও বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। দীঘি, পুকুর ছাড়াও কিছু অপ্রচলিত চাষযোগ্য জলাশয় যেমন বাওড়, বিল, ধানক্ষেত, রেলপথ ও মহাসড়কের পাশের বরোপিটে মাছ চাষ সংক্রান্ত বিষয়গুলোও আলোচিত হয়েছে। দেশে লক্ষ লক্ষ ছোট-বড় জলাশয় আছে তাতে মাছ চাষ করে যেমন আমিষের ঘাটতি পুরণ সম্ভব, তেমনি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র বিমোচন করা সম্ভব। তাই এই উদ্দেশ্যগুলোকে সামনে রেখেই সাধারণ মানুষের কাছে মাছ চাষের প্রযুক্তি পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যেই এই ম্যানুয়েল প্রণীত হয়েছে। বাংলাদেশের গ্রামীণ পরিবারে গৃহপালিত পশু-পাখি পালন ও বাড়ি সংলগ্ন একখন্ড জমিতে শাক-সবজির চাষ একটি সনাতনী আচার। ইদানিং মাছ চাষের সাথে এ সব প্রাণি ও শাক-সবজি চাষ লাভজনক প্রমাণিত হয়েছে। তাই এই ম্যানুয়েলে স্বল্প পরিসরে এ বিষয়টিও আলোচনা করা হয়েছে।

বর্তমানে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে চিংড়ি, উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। স্বাদু পানিতে গলদা চিংড়ির চাষের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। তাই এর গুরুত্ব বিবেচনায় রেখে এই ম্যানুয়েলে চিংড়ি চাষ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।

যে কোন প্রযুক্তি প্রতিনিয়ত উন্নততর হচ্ছে। যা মাছ চাষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এই ম্যানুয়েল প্রণয়নে সময়ের সীমাবদ্ধতা থাকায় যতটুকু সম্ভব সর্বশেষ প্রয়োগযোগ্য প্রযুক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যা মৎস্য চাষীর সামর্থের সাথে সংগতিপুর্ণ।

মাছ চাষের নিবিড়ত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, ফলে মাছের নানা রকম রোগ-বালাইয়ের সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পাচেছ। মৎস্য চাষী যাতে রোগ বালাইয়ের ক্ষতিকর দিক থেকে সম্পদ রক্ষা করতে পারেন সেজন্য এই ম্যানুয়েলে মাছের রোগ বালাই এবং তার প্রতিকার সম্পর্কে একটি অধ্যায় সন্নিবেশ করা হয়েছে।

বাংলাদেশে মাছের গুরুত্ব

স্মরণাতীত কাল থেকে বাংলাদেশের মানুষের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় মাছ অপরিহার্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। কিন্তু প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্ট নানাবিধ কারণে ও ক্রমবর্দ্ধমান জনগোষ্ঠীর চাহিদার জন্য মাছের প্রাচুর্য্যতায় ভাটা পড়েছে। তবে চাষ ব্যবস্থার যথাযথ সম্প্রসারণ হলে অপসৃয়মান অতীতের সুখকর স্মৃতি পুনরূদ্ধার করা সম্ভব।

দেশে ২৬০ প্রজাতির স্বাদু পানির মাছ রয়েছে। যা অন্য যে কোন দেশের তুলনায় সমৃদ্ধ। প্রায় এক কোটি লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে মৎস্যচাষ, আহরণ, বাজারজাতকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত। বর্তমানে মাছ আমাদের পুষ্টি চাহিদার ক্ষেত্রে প্রাণিজ আমিষের প্রায় ৬৩ শতাংশ পুরণ করছে। মাছ চাষ দারিদ্র বিমোচনের অন্যতম হাতিয়ার। রপ্তানী বাণিজ্যেও মৎস্যজাত পণ্য বিশেষ ভূমিকা রেখে আসছে। দেশের মোট রপ্তানী আয়ের প্রায় ৬ শতাংশ মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানীর মাধ্যমে অর্জিত হয়ে থাকে।

মাছ এ দেশের মানুষের খাদ্যাভ্যাস ও অর্থনৈতিক জীবনেই শুধু নয়। মাছের প্রভাব আমাদের ধর্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও ঐতিহ্যের অঙ্গনেও ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে আছে। ইসলাম ধর্ম ও হিন্দু ধর্মে মাছ সম্পর্কে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তাই এ দেশের মানুষের কাছে মাছের গুরুত্ব অন্যান্য দেশের তুলনায় ভিন্নতর।

বিগত শতাব্দীর নব্বই দশকের শুরুতে মাছ চাষের ও ব্যবস্থাপনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ শুরু হয়। ১৯৯৩ সালে সর্বপ্রথম দেশে মৎস্য পক্ষ উদযাপনের মাধ্যমে জনগণকে মৎস্যচাষ ও সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। যা এ যাবৎ অনুসৃত হয়ে আসছে।

এর ফলে মাছ চাষের গতি ও প্রকৃতি সম্প্রসারিত হয়েছে। তন্মধ্যে বদ্ধ জলাশয়ে মাছ চাষ দ্রুত প্রসার লাভ করে। ২০০০-২০০১ সালে দেশে মাছের মোট উৎপাদন ছিল প্রায় ১৭.৮১ লক্ষ মেঃ টন। এর মধ্যে বদ্ধ জলাশয়ে উৎপাদন ছিল ৭.১২ লক্ষ মেঃ টন। বিগত ১০ বছরে বদ্ধ জলাশয়ে মাছ চাষে দ্রুত প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। বর্তমানে বছরে জনপ্রতি মাছ গ্রহণের পরিমাণ প্রায় ১২ কেজি। আমরা মেছো বাংগাল নাম ধারী হলেও অন্যান্য দেশে মাথাপিছু মৎস্য-আমিষ গ্রহণের পরিমাণ অনেক বেশী।

প্রাণিজ আমিষের মধ্যে মৎস্য আমিষই উত্তম। এ আমিষ সহজপাচ্য এবং মাছের হাড় ও কাঁটা নরম ও সরু হওয়ায় সহজেই হজম হয়ে শরীর গঠনের ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে সহায়তা করে। এছাড়া মাছের অন্যান্য পুষ্টিগত উপাদান হচ্ছে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, লোহা ও ভিটামিন এ। এগুলো মানব দেহের বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রক্রিয়ায় ও গঠনমূলক কাজে লাগে। সামুদ্রিক মাছের তেল রক্তের কোলেস্টেরল কমায়, ফলে হৃদরোগের ঝুঁকি কমে।

পুষ্টিমানের দিক থেকে আমাদের দেশের বড় বড় রুই, কাতলা, পাংগাস, ইলিশ ইত্যাদি মাছের চেয়ে ছোট ছোট ট্যাংরা, পুঁটি, কৈ, শিং মলা, খয়রা, খলিসা প্রভৃতির পুষ্টিমান কোন অংশেই কম নয়। নীচের সারণীতে বিভিন্ন মাছের পুষ্টিমানের একটি বিবরণ দেয়া হলো।

(প্রতি ১০০ গ্রামে)

প্রজাতি	পানি (গ্রাম)	প্রোটিন (গ্রাম)	স্নেহ (গ্রাম)	লোহা (গ্রাম)	ক্যালসিয়াম (গ্রাম)	ফসফরাস (গ্রাম)	শর্করা (গ্রাম)	ক্যালরি
ইলিশ	৫৩.৭	২১.৮	১৯.৪	০.২১	০.১৮	০.২৮	২.৯	২৭৩
রুই	৭৬.৭	১৬.৬	১.৪	০.০৮৫	০.৬৮	০.১৫	৪.৪	১২৪
কাতলা	৭৩.৭	১৯.৫	২.৪	০.৭৬	০.৫১	০.২১	৩	১১১
মৃগেল	৭৫.০	১৯.৫	০.৮	০.৯	০.৩৫	০.২৮	৩.৩	-
কালবাউশ	৮১	১৪.৭	১.০	০.৩৩	০.৩২	০.৩৮	-	-
পাঙ্গাস	৭২.৩	১৪.২	১০.৮	০.০০০৫২	০.১৮	০.১৩	-	-
বোয়াল	৭৩.০	১৫.৪	২.৭	০.৬২	০.১৬	০.৪৯	-	-
আইড়	৭৮.১	১৫.৯	১.৩	০.৩৬	০.৩৮	০.১৮	৩.৫	-
চিতল	৭৫.০	১৮.৬	২.৩২	২.৯৮	০.১৮	০.২৫	-	১০৮

প্রজাতি	পানি (গ্রাম)	প্রোটিন (গ্রাম)	স্নেহ (গ্রাম)	লোহা (গ্রাম)	ক্যালসিয়াম (গ্রাম)	ফসফরাস (গ্রাম)	শর্করা (গ্রাম)	ক্যালরি
ফলুই	৭৩.০	১৯.৮	১.০০	০.১৬	০.৫৯	০.৪৫	১.০	-
সরপুঁটি	৭০.২	১৫.৫	৯.৫	০.৫৪	০.২২	০.১২	-	-
শিং	৬৮.০	২২.৮	০.৬	০.২৬	০.৬৭	০.৬৫	৬.৯	১২৪
মাগুর	৭৮.২	১৫.০	১.০	০.৭১	০.২১	০.১৯	৪.২	৮৫
শোল	৭৮.০	১৬.২	২.৩	০.৫৪	০.১৪	০.১৯৫	-	-
টাকি	৭৪.০	১৯.৪	০.৬	০.১৩	০.৬১	০.৫৩	-	-
কই	৭০.০	১৪.৮	৮.৮	১.৩৫	০.৪১	০.৩৯	-	-
বেলে	৭৯.৭	১৪.৫	০.৬	০.১০	০.৩৭	০.৩৭	-	১১৬
ট্যাংরা	৭২.৬	১৯.২	৬.৫	০.৩০	০.২৭	০.১৭	১.১	১৪৪
পাবদা	৭২.০	১৯.২	২.১	১.৩০	০.৩১	০.২১	৪.৬	১৪
বাচা	-	১৮.১	-	০.৭০	০.৫২	-	-	-
বাটা	৭৯.০	১৪.৩	২.৪	০.০০১৯	০.৭৯	০.২০	-	-
পুঁটি	৭৫.০	১৮.১	২.৪	০.৯৬	০.৯১	০.৯৫	-	-
খলসে	-	১৬.১	৩.১	০.৮০	০.৪৬	০.৩৬	-	-
খয়রা	-	১৮.০	১.০	০.৭	০.৫১	০.২৯	-	-
মৌরলা	-	১৮.০	৪.১	০.৪	০.৫৫	০.৩৫	-	-

উৎস ঃ মৎস্য বিভাগ, বাংলাদেশ সরকার/ 'মৎস্য'- কামাল সিদ্দিকী।

মাছ চাষে জনগণের ভূমিকা

দেশের মৎস্য উৎপাদনের শতকরা প্রায় ৯৯ ভাগ বেসরকারী বা ব্যক্তি পর্যায়ের অবদান। সুতরাং দেশের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জনগণের সম্পৃক্ততা অপরিহার্য। মৎস্যচাষ, ব্যবস্থাপনা, উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে জনগণের ভূমিকা সুস্পষ্টকরণে এবং উদ্বুদ্ধকরণে সরকারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে তাদের মাঝে গতি সঞ্চার করতে পারলেই মৎস্য সেক্টর দ্রুততার সাথে উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে। জনগণের সম্পদ আছে, শুধু সে সম্পদ ব্যবহারের কৌশল ও আনুষাঙ্গিক উপকরণ সহজলভ্য করতে পারলে তারা নিজস্ব উদ্যোগেই উৎপাদনের দিকে এগিয়ে যাবেন। নিরক্ষর, শিক্ষিত, চাকুরীজীবি, ব্যবসায়ী, উচ্চচবিত্ত, মধ্যবিত্ত, সংগঠিত ভূমিহীন, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ইত্যাদি বহুমাত্রিক সমাজে চিন্তাধারার ভিন্নতা বিদ্যমান। এ ভিন্নতার মধ্যে যাদের সম্পদ (জলাশয়) আছে তাদেরকে সুনির্দিষ্ট কৌশল ও সুযোগের সন্ধান দিতে পারলে তাদের অব্যবহৃত বা নিম্নমাত্রায় ব্যবহৃত সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব।

সমাজের জনগোষ্ঠির বিভিন্ন বৈচিত্রের কথা বিবেচনা করে জনগণকে মাছ চাষে উদ্বুদ্ধ ও সংগঠিত করার লক্ষ্যে ডঃ কামাল সিদ্দিকী তার মৎস্য বইটিতে নিম্নের তিনটি গ্রুপকে চিহ্নিত করেছেন।

(১) সাধারণ জনগণের শিক্ষিত এবং অগ্রসর অংশ, অর্থাৎ শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, স্থানীয় পর্যায়ে কর্মরত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, গ্রামের মাতবর, শিক্ষিত যুবক, যুব-মহিলা, স্থানীয় পর্যায়ে এনজিও কর্মী, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, নেতৃবৃন্দ ইত্যাদি।

(২) যেসব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান পুকুর, ডোবা, নালা, খাদ ইত্যাদির একক/যৌথ মালিক, ভোগদখলকারী, ব্যবহারকারী অথবা এসব হওয়ার প্রত্যাশী।

(৩) ভূমিহীন, শিক্ষিত বেকার যুবক, এদের মধ্যে যারা প্রয়োজনীয় পুকুর/ডোবার অভাবে পুকুরে মাছ চাষে সরাসরিভাবে জড়িত না হয়েও বিভিন্ন সহায়ক ভূমিকায় নিয়োজিত থেকে আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারেন, যেমন মাছের ডাক্তারি, মাছ পরিবহণ, মাছ ব্যবসায়, প্রক্রিয়াজাতকরণ, পিটুইটারি গ্লান্ড যোগানকারী, মাছ ধরা, হ্যাচারি স্থাপন, পুকুর কাটা, পুকুর পরিষ্কার ও তৈরি করা ইত্যাদি।

এক্ষণে বিভিন্ন উদ্বুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া এবং সম্প্রসারণ কার্যক্রমের মাধ্যমে এদেরকে মাছ চাষের সাথে সম্পৃক্ত করার ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা আবশ্যক।

বাংলাদেশে মাছ চাষযোগ্য জলাভূমি

আদিকাল থেকেই বাংলাদেশের দীঘি পুকুরে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে না হলেও সনাতনী পদ্ধতিতে মাছ চাষ হয়ে আসছে। কিন্তু বর্তমানে চাষ পদ্ধতি উন্নয়ন হওয়ায় এর পরিসর এবং ধরণও পরিবর্তিত হয়েছে।

দেশে স্থায়ী ও মৌসুমী দীঘি-পুকুর এর পরিমাণ প্রায় ২৪১,৫০০ হেক্টর। এসব জলাশয়ে সহজেই মাছ চাষ করা সম্ভব। এছাড়া রয়েছে বাওড় ও বিল যেখানে এখন চাষ ও ব্যবস্থাপনার সমন্বয় ঘটিয়ে মাছ উৎপাদন করা হচেছ। এছাড়াও খাল, মহাসড়কের ও রেল লাইনের পাশের জলাভূমি, চা-বাগানের জলাভূমি প্লাবন ভুমি ইত্যাদি। দেশে বিদ্যমান প্রায় ২৮ লক্ষ হেক্টর প্লাবনভূমির যে অংশে ৩-৬ মাস ১-১.৫ মিটার গভীরতায় পানি থাকে সেখানেও পেনে মাছ চাষ করা যায়। এসব সম্ভাবনাময় সম্পদ চিহ্নিত করে ব্যাপক উদ্যোগ নিলে মাছের উৎপাদন আগামী ১০-১২ বছরে বর্তমানের চেয়ে দ্বিগুণ করা সম্ভব। নিম্নে দেশের মাছ চাষযোগ্য বিভিন্ন প্রকার জলাভূমির পরিমাণ (সম্ভাব্য) উল্লেখ করা হলো।

উৎসের নাম	**জলায়তন (হেক্টর)**
দিঘী-পুকুর	২৪১,৫০০
বাওড়	৫,৪৮৮
বিল (আধা চাষযোগ্য বদ্ধ বিল সহ)	১,১৪,১৬১
সড়ক ও রেলপথের পার্শ্ববর্তী খাল	১৪,০০০ (প্রায়)
চা বাগানের জলাশয়	১১,০০০
চিংড়ি খামার (উপকূলীয়)	১,৪১,৩৫৩
মাছ চাষ যোগ্য ধানী জমি	৬,০০০০০(আনুমানিক)
চাষ যোগ্য প্লাবন ভূমি	৭,০০০০০(আনুমানিক)
সেচ-প্রকল্প এলাকায় সৃষ্ট চাষযোগ্য জলাভুমি	৭,০০০০০(প্রায়)

উৎস ঃ মৎস্য অধিদপ্তর এবং বিএআরসি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

চাষযোগ্য মাছের প্রজাতি

বাংলাদেশে স্বাদু বা মিঠা পানিতে মোট ২৬০ প্রজাতির মৎস্যকূল রয়েছে। এগুলোর সবই প্রতিপালনের মাধ্যমে বদ্ধ অবস্থায় চাষ করা যায় না। তাছাড়া চাষের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ভাবেও লাভ-ক্ষতির বিষয় বিবেচনায় রাখতে হয়। একটা জলাশয়ে নির্ধারিত কতিপয় প্রজাতির মাছ চাষ করা যায়। একই জলাশয়ে সব প্রজাতির মাছ চাষ করা যায় না। নিম্নের সারণীতে কোন্ ধরণের জলাশয়ে কোন্ প্রজাতির মাছ চাষ করা যায় তার একটা বিবরণ দেয়া হলো।

জলাশয়ে প্রকৃতি	বর্তমানে চাষযোগ্য প্রজাতি
স্থায়ী পুকুর (আয়তন ০.১৪ হেঃ বা তদুর্ধ), সারা বছর চাষযোগ্য পানি থাকে এমন বদ্ধ জলাশয়, স্থায়ী পেন।	রুই, কাতলা, মৃগেল, কালবাউশ, সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প, কমনকার্প, মিরর কার্প, রাজপুঁটি, বিগহেড কার্প, তেলাপিয়া, গিফট জাতের তেলাপিয়া, পাঙ্গাস, মাগুর, শিং, কৈ, গলদা চিংড়ি।
মৌসুমি পুকুর	তেলাপিয়া, গিফট জাতের তেলাপিয়া, রাজপুঁটি, হাইব্রিড মাগুর এবং সকল প্রজাতির মাছের পোনার চাষ।
বাওড়	রুই, কাতলা, মৃগেল, কালবাউশ, গ্রাস কার্প, সিলভার ও বিগহেড কার্প, মিরর ও কমনকার্প, রাজপুঁটি। বাড়তি ফলন পাবার জন্য শিং, মাগুর, ব্লাককার্প মজুদ করা যেতে পারে।
বদ্ধ বা আধা বদ্ধ বিল, প্লাবন ভুমি	বাওড়ের মত সকল প্রজাতির মাছ চাষ করা যেতে পারে।
ধানক্ষেতে	রাজপুঁটি, নাইলোটিকা, গিফট জাতের তেলাপিয়া, কমনকার্প এবং পোনার চাষ।
খাঁচায়	তেলাপিয়া (গিফট জাতের), নাইলোটিকা, পাংগাস, গ্রাসকার্প, মাগুর, কমনকার্প ও রাজপুঁটি।

কতিপয় চাষযোগ্য প্রজাতির জীবন-বৃত্তান্ত

যে কোন জলাশয়ে মাছ চাষ করতে হলে যে প্রজাতির মাছ চাষ করা হবে তার জীবনবৃত্তান্ত না জানলে পরিচর্যা করা যায় না। যেমন যে মাছের যে রকম খাদ্যাভ্যাস, তাকে সে ধরণের খাদ্য না দিয়ে অন্য খাদ্য দিলে ঐ মাছের কোন কাজে লাগবে না, পক্ষান্তরে গৃহস্থের অর্থাৎ মৎস্যচাষীর ব্যয় বাড়বে। তাই মৎস্যচাষীর সুবিধার্থে সংক্ষেপে কতিপয় প্রধান প্রধান চাষযোগ্য মাছের জীবন বৃত্তান্ত নিম্নে দেয়া হলো। এই অংশটুকু ডঃ কামাল সিদ্দিকী সম্পাদিত 'মৎস্য' বই থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে উদ্ধৃত করা হলো ।

রুই/রোহিত

১.	সাধারণ নাম	ঃ	রুই মাছ
২.	বৈজ্ঞানিক নাম	ঃ	লাবিও রোহিতা (Labeo rohita)
৩.	দেহের বিবরণ	ঃ	রুই মাছের দেহের আকৃতি কতকটা মাকুর মতো। মাথা ও লেজ ক্রমশঃ সরু। শরীরের দুইপাশ প্রতিসম এবং চ্যাপ্টা। সারা শরীর আঁশ দিয়ে ঢাকা। আশঁগুলো মসৃণ ও সারিবদ্ধভাবে সাজানো। এর মুখের উপরের ঠোঁটে এক জোড়া ছোট গোঁফ থাকে।
৪.	প্রাপ্তিস্থান	ঃ	দক্ষিণ এশিয়ার সর্বত্র রুই মাছ পাওয়া যায়।
৫.	বাসস্থান	ঃ	রুই মাছ নদী, খাল, বিল, হাওড়-বাওড় ও পুকুরে পানির মধ্যস্তরে বাস করে।
৬.	রোগবালাই	ঃ	রুই মাছে ক্ষতরোগ, পাখনা পচা, লেজ পচা, ফুলকা পচা ইত্যাদি রোগ দেখা দিতে পারে। এছাড়া রুই মাছ উকুন দ্বারাও আক্রান্ত হয়।
৭.	খাদ্য	ঃ	রুই মাছ পানির মধ্যভাগ ও তলার নানা ধরণের খাদ্য খেতে অভ্যস্ত। এদের প্রধান খাদ্য হলো উদ্ভিদজাত এবং পচনশীল জৈব পদার্থ। রুই মাছ প্রাণী ও কণা খায়। ফিশমিল, খৈলের গুড়া, কুড়া ইত্যাদি সম্পূরক খাদ্য খায়।
৮.	প্রজনন	ঃ	এই মাছ দু'বছর বয়সেই প্রজননক্ষম হয়। অপেক্ষাকৃত কম গভীর পানিতে ও স্রোতের টানে নদীর কোলে স্ত্রী রুই ডিম ছাড়ে। বাঁধ বা বড় জলাশয়ে কৃত্রিম উপায়ে স্রোতের সৃষ্টি করা হলে রুই মাছ সেখানে নির্বিঘ্নে ডিম ছাড়ে। মে হতে আগষ্ট মাসে একটি স্ত্রী মাছ কয়েক লক্ষ ডিম পাড়ে। হ্যাচারিতে এ মাছের প্রজনন করানো হয়।
৯.	বাজারজাতকরণ	ঃ	যেহেতু বাজারে বড় রুই মাছের চাহিদা সর্বাধিক, তাই রুই বড় হওয়ার পরই ধরা ও বাজারজাত করা উচিত। রুই মাছ ১ বছরে প্রায় ১ কেজি ওজনের হয়ে থাকে এবং তখনই বড় জাল দিয়ে এই মাছ ধরা যায়।

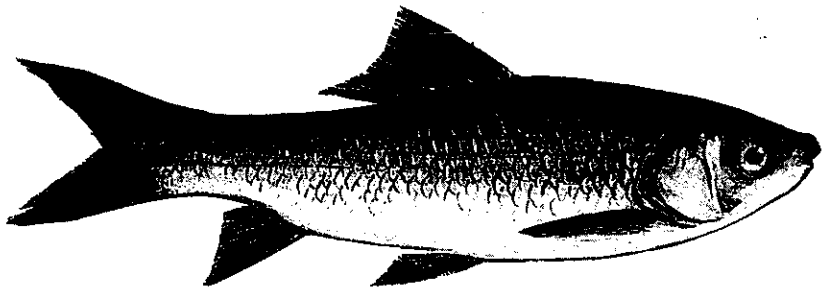

চিত্রঃ ১ রুই মাছ

কাতলা

১.	সাধারণ নাম	ঃ	কাতলা বা কাতল
২.	বৈজ্ঞানিক নাম	ঃ	ক্যাটলা ক্যাটলা (Catla catla)
৩.	দেহের বিবরণ	ঃ	কাতলা মাছের মাথা বড়, দেহের মাঝের অংশ চওড়া এবং মুখের হা বেশ বড়। এর সমস্ত শরীর সুন্দর বড় আঁশে ঢাকা। দেহের পিঠের অংশ ঈষৎ ধুসর, পেটের অংশ সাদাটে।
৪.	প্রাপ্তিস্থান	ঃ	সমগ্র দক্ষিণ এশিয়া।
৫.	বাসস্থান	ঃ	নদী, খাল, বিল, হাওড়-বাওড় ও পুকুরের উপরের স্তরে বাস করে।
৬.	রোগবালাই	ঃ	বিভিন্ন জীবাণুর আক্রমণে কাতলা মাছের ক্ষতরোগ হয়। এছাড়া কাতলা মাছের ফুলকা পচা, পাখনা পচা রোগ হয়। এতে উকুনের আক্রমণও দেখা যায়।
৭.	খাদ্য	ঃ	কাতলা মাছ পুকুরের উপরের স্তরে বাস করে এবং সেখান থেকেই প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ করে। ছোট অবস্থায় এরা পানিতে ভাসমান প্রধানতঃ জুপ্ল্যাঙ্কটন খায়। বড় কাতলা জুপ্লাঙ্কটন ও শেওলা খায়। এই মাছ দ্রুত বর্ধনশীল এবং প্রয়োজনীয় খাবার পেলে দু'বছরে ৪-৫ কেজি পর্যন্ত বড় হয়।
৮.	প্রজনন	ঃ	কাতলা মাছ দু'বছরের পর যৌবনপ্রাপ্ত হয়। এ মাছ বদ্ধ পানিতে ডিম পাড়ে না। এরা মে-জুন মাসে স্রোতযুক্ত নদীতে ডিম পাড়ে। কৃত্রিম উপায়ে ইনজেকশন দিয়েও কাতলা মাছের পোনা উৎপন্ন করা যায়। বাংলাদেশের অনেক হ্যাচারি/নার্সারিতে কাতলার পোনা পাওয়া যায়।
৯.	বাজারজাতকরণ	ঃ	কাতলা মাছ সর্বাধিক ১.৮ মিটার লম্বা ও ৪৫ কেজি ওজনের পর্যন্ত পাওয়া গেছে। যেহেতু বাজারে বড় কাতলার চাহিদা বেশি সেজন্য দু'বছর বয়সের কাতলা ধরা এবং বাজারজাত করা উচিত।

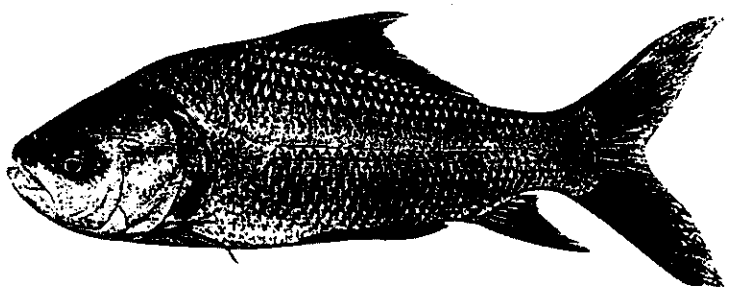

চিত্রঃ ২ কাতলা মাছ

মৃগেল

১. সাধারণ নাম ঃ মৃগেল/মিরকা

২. বৈজ্ঞানিক নাম ঃ সিরহিনাস মৃগেলা (Cirrhinus mrigala)

৩. দেহের বিবরণ ঃ মৃগেল মাছের মাথা খুবই ছোট এবং মুখের গহ্বর নীচের দিকে। এর উপরের ঠোঁট পুরু, নীচেরটি পাতলা। মৃগেল মাছের দেহ রুই কাতলা মাছের তুলনায় সরু ও লম্বাটে। এর গায়ের রং পিঠের দিকে তামাটে, দু'পাশ ও পেট রূপালি। এ মাছের চোখ সোনালী। পরিণত মাছ লম্বায় ৩ ফুট বা নব্বই সে.মি. হয়।

৪. প্রাপ্তিস্থান ঃ সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার সর্বত্র এ মাছ পাওয়া যায়।

৫. বাসস্থান ঃ নদী, খাল, বিল, হাওড়-বাওড় ও পুকুরের নিচের স্তরে বাস করে।

৬. রোগবালাই ঃ ক্ষতরোগ মৃগেল মাছের একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাধি। এছাড়াও পাখনা, লেজ পচা রোগে মৃগেল মাছ আক্রান্ত হয়। ফুলকা পচা রোগও মাঝে মাঝে দেখা যায়। এতে উকুনের আক্রমণও দেখা যায়।

৭. খাদ্য ঃ মৃগেল মাছ জলাশয়ের নিচের স্তরে বাস করে এবং সেখান থেকেই প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ করে। পচা জলজ উদ্ভিদ, পোকমাকড়, মৃত প্রাণীর দেহাবশেষ ও কাদামাটি মৃগেল মাছের প্রিয় খাদ্য।

৮. প্রজনন ঃ এ মাছের প্রজনন ঋতু সাধারণতঃ বর্ষাকাল। মৃগেল মাছ এক বছরে প্রায় এক কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। এ মাছ এক বছরে যৌবনপ্রাপ্ত হয়। যেহেতু মৃগেল মাছ বদ্ধ পানিতে ডিম পাড়ে না সেজন্য এ মাছ হতে কৃত্রিম উপায়ে প্রজননের ব্যবস্থা করা হয়। বাংলাদেশের অনেক জায়গায় হ্যাচারি থেকে মৃগেল মাছের পোনা সংগ্রহ করা যেতে পারে।

৯. বাজারজাতকরণ ঃ মৃগেল মাছ লম্বায় বেশ বড় হয়। তাই এক বছরের কম বয়সের মৃগেল ধরা বা বাজারজাত করা উচিত নয়। বড় আকারের মৃগেল মাছের চাহিদা বাজারে বেশি।

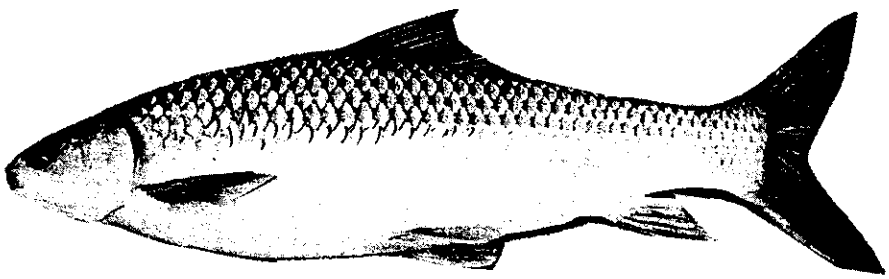

চিত্রঃ ৩ মৃগেল মাছ

কালবাউশ

১.	সাধারণ নাম	ঃ	কালবাউশ/কালিবাউশ/বাউশ
২.	বৈজ্ঞানিক নাম	ঃ	লাবিও কালবাসু (Labeo calbasu)
৩.	দেহের বিবরণ	ঃ	কালবাউশের সমস্ত শরীর কালো বা ধূসর আঁশে ঢাকা। দেহের তুলনায় মাথা ছোট। এর চোখ লাল রঙের। মুখের দু'পাশে এক জোড়া করে গোঁফ থাকে এবং সর্বোচ্চ ৭৫ সে.মি. পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। রুই ও কাতলা মাছের তুলনায় এ মাছ দ্রুত বর্ধনশীল নয়।
৪.	প্রাপ্তিস্থান	ঃ	সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার সর্বত্র এ মাছ পাওয়া যায়।
৫.	বাসস্থান	ঃ	নদী, খাল, বিল, হাওড়-বাওড় ও পুকুর ইত্যাদি জলাশয়ের নিচের স্তরে বাস করে।
৬.	রোগবালাই	ঃ	কালবাউশ মাছ লেজ পচা, পাখনা পচা রোগ, ফুলকা পচা রোগে, উকুন ও পরজীবীর দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে।
৭.	খাদ্য	ঃ	মৃগেল মাছ জলাশয়ের নিচের স্তরে বাস করে এবং সেখান থেকেই প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ করে। পোনা অবস্থায় এরা এককোষী শ্যাওলা, পচা ও আধপচা জলজ উদ্ভিদ খায়। পরিণত বয়সে পচা ও আধঁপচা জলজ উদ্ভিদ ও কীট পতঙ্গ খায়।
৮.	প্রজনন	ঃ	বর্ষাকালে এরা স্রোতযুক্ত পানিতে ডিম পাড়ে। কালবাউশ বদ্ধ পানিতে ডিম পারে না। দ্বিতীয় বছরে সাধারণতঃ যৌবনপ্রাপ্ত হয়। রুই, কাতলার মতই এর রেনু পোনা নদী হতে সংগ্রহ করতে হয়। তাছাড়া ইনজেকশন দিয়ে এর কৃত্রিম প্রজনন করানো যায়। বাংলাদেশের সকল অঞ্চলেই হ্যাচারি হতে পোনা সংগ্রহ করা যায়।
৯.	বাজারজাতকরণ	ঃ	এ মাছ দ্রুত বর্ধনশীল নয় বলে প্রথম বছরে না ধরাই শ্রেয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরে এ মাছ ধরা ও বাজারজাত করা যেতে পারে।

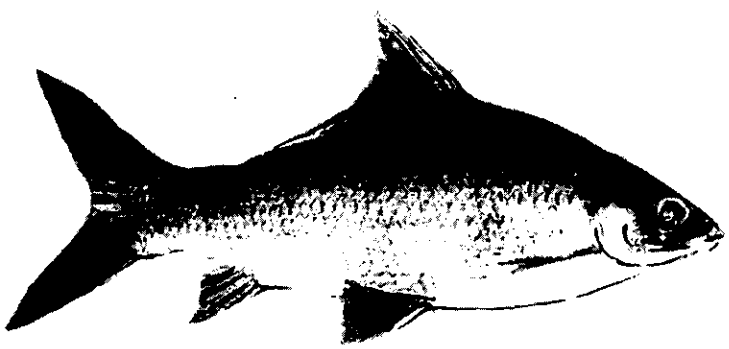

চিত্রঃ ৪ কালবাউশ মাছ

পাংগাস (থাই)

১.	সাধারণ নাম	ঃ	পাংগাস (থাই)
২.	বৈজ্ঞানিক নাম	ঃ	পাঙ্গাঁসিয়াস সুচি (Pangasius sutchi)
৩.	দেহের বিবরণ	ঃ	পাংগাস মাছের গায়ে কোন আঁশ নাই। গায়ের রং রূপালি। এই পাংগাস পুকুরে চাষ করা হয়ে থাকে।
৪.	প্রাপ্তিস্থান	ঃ	এই পাংগাস থাইল্যান্ড থেকে আনা হয়েছে। বর্তমানে দেশে ব্যাপকভাবে পোনা উৎপাদন করা হচেছ।
৫.	বাসস্থান	ঃ	থাইল্যান্ডের নদীতে ও পুকুরে এ মাছ বাস করে।
৬.	রোগবালাই	ঃ	পাংগাস মাছের রোগবালাই কম।
৭.	খাদ্য	ঃ	এ মাছ সর্বভুক। এর 'ওফাল' 'গ্যাসটাপোড' পোকামাকড়, প্ল্যাংটন জাতীয় খাবার খায়। তবে সম্পূরক খাদ্য যথা ফিশমিল, সরিষার খৈল, কুড়া, গমের ভুষি ময়দা ও ঝোলা গুড় একত্রে মিশিয়ে খাওয়ানো যায়। এ মাছের খাদ্যে প্রাণিজ আমিষের পরিমাণ বেশী প্রয়োজন
৮.	প্রজনন	ঃ	এদেশে হ্যাচারিতে কৃত্রিম উপায়ে ও এর প্রজনন করানো হচেছ।
৯.	বাজারজাতকরণ	ঃ	বড় জাল দিয়ে এ মাছ ধরা এবং বাজারজাত করা হয়। এ মাছ বিদেশে রফতানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা যেতে পারে। এক কেজি ওজনের হলেই এ মাছ ধরে বাজারজাত করা যায়। বর্তমানে ব্যাপকভাবে এর চাষ হচেছ।

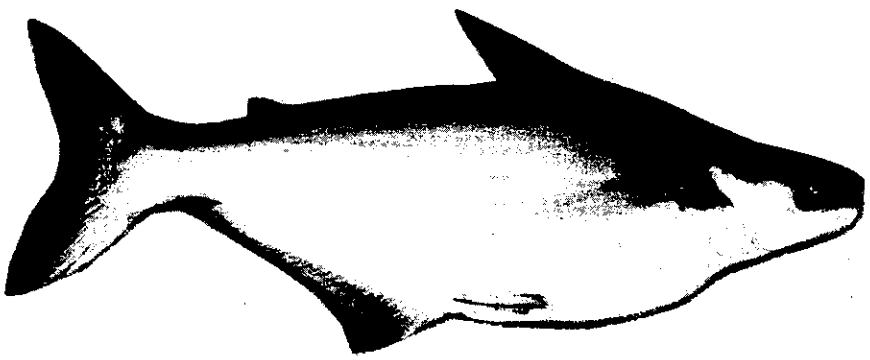

চিত্রঃ ৫ পাংগাস (থাই) মাছ

নাইলোটিকা

১. সাধারণ নাম ঃ নাইলোটিকা

২. বৈজ্ঞানিক নাম ঃ ওরিওক্রমিস নাইলোটিকাস (Oreochromis niloticus)

৩. দেহের বিবরণ ঃ নাইলোটিকার দেহ ছাই রঙের। আঁশযুক্ত এ মাছের পিঠে পাখনার কাঁটা সংখ্যা ১৭টি। পুরুষ মাছের জননেন্দ্রিয় ক্ষুদ্র মোচাকৃতি এবং অগ্রভাগ দ্বিখন্ডিত।

৪. প্রাপ্তিস্থান ঃ আদি বাস আফ্রিকা। ১৯৭৪ সালে থাইল্যান্ড হতে আমাদের দেশে প্রথম আমদানী করা হয়।

৫. বাসস্থান ঃ ছোট পুকুর, ডোবা-নালা, দীঘি, ঝিল, চৌবাচচা ইত্যাদি এবং অগভীর পানিতে এরা থাকতে পারে।

৬. রোগবালাই ঃ নাইলোটিকার প্রধান শত্রু হলো প্রোটোজোয়ান প্যারাসাইট। নার্সারি পুকুরে পরজীবি সিলিয়েট গ্রুপের অন্তর্গত টাইকোডিনা ও কিলোডনেলা দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। এ মাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা খুব বেশি।

৭. খাদ্য ঃ এ মাছ সব ধরণের খাদ্য খেয়ে থাকে। তবে জলজ শেওলা ও পোকামাকড় এদের প্রধান খাদ্য। সম্পুরক খাদ্য হিসেবে চাউলের মিহি গুঁড়া ও সরিষার খৈল গুঁড়া করে দেয়া হয়।

৮. প্রজনন ঃ নাইলোটিকা ৩-৪ মাসের মধ্যেই প্রজননক্ষম হয়। প্রসবের আগে পুরুষ মাছ পুকুর বা জলাশয়ের গভীর অংশে বাসা তৈরি করে। এ সময় পুরুষ নাইলোটিকা এ বাসায় ডিম ছাড়ার জন্য স্ত্রী মাছকে আমন্ত্রণ জানায়। স্ত্রী মাছের মুখের ভিতর ডিম ফুটে বাচচা বের হয়। এ মাছ দ্রুত বংশ বৃদ্ধি করে। বছরে ৩-৪ বার ডিম পাড়ে।

৯. বাজারজাতকরণ ঃ পোনা ছাড়ার ৩-৪ মাসের মধ্যে এ মাছ বাজারজাত করা যায়। এ মাছ ৩-৪ মাসে ১২-১৫ সেঃমিঃ লম্বা হয়। বর্তমানে এ মাছের চাহিদা বৃদ্ধি পাচেছ।

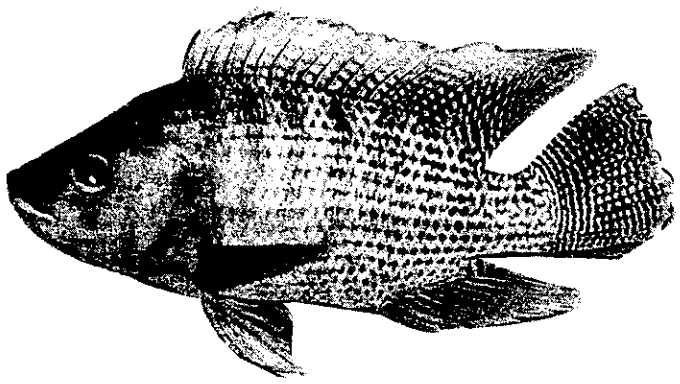

চিত্রঃ ৬ নাইলোটিকা মাছ

শিং

১. সাধারণ নাম ঃ শিং

২. বৈজ্ঞানিক নাম ঃ হেটেরোপনিসটেটিস ফসিলিস (Heteropneustes fossilis)

৩. দেহের বিবরণ ঃ শিং মাছের দেহ লম্বা, সামনের কি নলাকার, পেছনের দিক দু'পাশে চাপা, আঁশবিহীন, মাথার উপর-নিচে চ্যাপ্টা। ছোট ও পাতলা চামড়া দিয়ে গা ঢাকা। মাথার সামনের দিকে মুখ ঘিরে ৮টি লম্বা শুঁড় এবং মাথার দু'পাশে বিষাক্ত দুটি কাঁটা আছে। শিং মাছের গায়ের রং প্রায় কালো তবে ছোট অবস্থায় লাল থাকে।

৪. প্রাপ্তিস্থান ঃ বাংলাদেশ, , নেপাল, শ্রীলংকা, মায়ানমার, ভারত ও পাকিস্তানে পাওয়া যায়।

৫. বাসস্থান ঃ খাল, বিল, ডোবা, নালা, পুকুর, ধানক্ষেত ইত্যাদি শিং মাছের বাসস্থান।

৬. রোগবালাই ঃ বিভিন্ন পরজীবির আক্রমণে বর্তমানে শিং মাছের শরীরে ক্ষত রোগ দেখা দেয়।

৭. খাদ্য ঃ শিং মাছ আমিষ জাতীয় খাদ্য খায়। ছোট অবস্থায় এরা ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন ও জুপ্ল্যাঙ্কটন খায়। তবে বড় হলে পোকামাকড় খেয়ে থাকে। এ মাছ পুকুরের তলার সমস্ত কীট, পোকা ও জৈব পদার্থ খায়। এ মাছ পচা কাদামাটিও খেয়ে থাকে। সম্পূরক খাদ্য খায়।

৮. প্রজনন ঃ প্রথম বছরেই এ মাছ লম্বায় প্রায় ২০-৩০ সে.মি. ও যৌবনপ্রাপ্ত হয়। সাধারণত এপ্রিল হতে জুলাই মাসই এদের প্রজননের উপযুক্ত সময়।

৯. বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের কাছে চাহিদা ঃ খেতে সুস্বাদু এবং স্বাস্থ্যের জন্য ভাল বলে এ মাছ সকলের কাছে খুব প্রিয়।

১০ বাজারজাতকরণ ঃ শিং মাছ ২৫-৩০ সে.মি. লম্বা হয়। তাই এ আকারের হলে জাল দিয়ে ধরে জীবন্ত অবস্থায় বিক্রি করা উচিত। কারণ মরা শিং এর বাজার দর একদম কম।

চিত্রঃ ৭ শিং মাছ

মাগুর

১.	সাধারণ নাম	ঃ	মাগুর
২.	বৈজ্ঞানিক নাম	ঃ	ক্ল্যারিয়াস ব্যাট্রাকাস (Clarias batrachus)
৩.	দেহের বিবরণ	ঃ	মাগুর অস্থিবিশিষ্ট, আঁশবিহীন, শুঁড়বিশিষ্ট জিওল মাছ। মাগুরের মাথা চ্যাপ্টা, মুখ প্রশস্ত। পিঠের পাখনা লম্বা, চার জোড়া শুঁড় আছে। এর গায়ের রং লালচে বাদামি বা ধুসর কালো।
৪.	প্রাপ্তিস্থান	ঃ	বাংলাদেশ, পাকিস্তান, মায়ানমার, ভারত, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড সর্বত্রই এ মাছ পাওয়া যায়।
৫.	বাসস্থান	ঃ	ডোবা, পুকুর, জলাভূমি, ধানক্ষেত সর্বত্রই এদের বাসস্থান। এরা কাদাযুক্ত পানিতে বাস করতে পছন্দ করে।
৬.	রোগবালাই	ঃ	মাগুর মাছের গায়ে ক্ষতরোগ দেখা যায়।
৭.	খাদ্য	ঃ	মাগুর মাছ পোকা, শুককীট বা মুককীট জাতীয় প্রাকৃতিক খাবার খেয়ে থাকে। কুঁড়া/গমের ভূষি ও অন্যান্য সম্পূরক খাদ্য খায়।
৮.	প্রজনন	ঃ	এ মাছ ২০সে.মি. এর মত লম্বা হলেই প্রজনন ক্ষমতা অর্জন করে। মে-জুন থেকে আগষ্ট-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এ মাছ বংশবিস্তার করে।
৯.	বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের কাছে চাহিদা	ঃ	অত্যন্ত সুস্বাদু বলে এ মাছ সকলের কাছে প্রিয়। বর্তমানে এর বাজারদর বেশ উঁচু হবার ফলে ধনী লোকেরাই এ মাছ খেতে পারে। আমাদের দেশে রোগীর পথ্য হিসেবেও মাগুর মাছ খাওয়া হয়।
১০.	বাজারজাতকরণ	ঃ	এ মাছ ২৫-৩০ সে.মি. লম্বা হলে জাল দিয়ে অথবা পুকুরে/ডোবায় পানি সেচের মাধ্যমে ধরে বাজারে বিক্রি করা হয়। বাজারে জীবিত মাগুরের চাহিদা প্রচুর, অন্যদিকে মরা মাগুরের অনেক কম।

চিত্রঃ ৮ মাগুর মাছ

কই

১.	সাধারণ নাম	ঃ	কই
২.	বৈজ্ঞানিক নাম	ঃ	এনাবাস টেস্টাডাইনাস (Anabas testudineus)
৩.	দেহের বিবরণ	ঃ	এ মাছের মাথা বড় ও প্রায় ত্রিকোণাকৃতি। বর্ণ কালচে সবুজ বা বাদামী সবুজ। দেহ আঁশ দিয়ে ঢাকা, দু'টো চোয়ালেই দাঁত আছে, পিঠের পাখনাযুক্ত কাঁটাগুলো ধারালো। কই মাছ কানকো দিয়ে মাটিতেও চলাচল করতে পারে।
৪.	প্রাপ্তিস্থান	ঃ	বাংলাদেশ, ভারত, থাইল্যান্ড, নেপাল, শ্রীলংকা, মায়ানমার প্রভৃতি দেশে পাওয়া যায়।
৫.	বাসস্থান	ঃ	পুকুর, ডোবা-নালা, নর্দমা, হাওড়-বাওড় ইত্যাদি জলাশয়ে পানির মধ্যে ও নিচে স্তরে বাস করে।
৬.	রোগবালাই	ঃ	কই মাছের দেহে ও লেজে বিভিন্ন ছত্রাক ও ক্ষত রোগের সৃষ্টি হয়।
৭.	খাদ্য	ঃ	ছোট অবস্থায় অতি ক্ষুদ্র জলজ প্রাণী ও কীটপতঙ্গ খায় এবং বড় হলে পতঙ্গ ও তাদের শুককীট, শৈবাল এবং পুকুরের তলার সঞ্চিত জৈব পদার্থ খায়। এরা সম্পূরক খাদ্য খায়।
৮.	প্রজনন	ঃ	কই মাছ ৪-৫ সে.মি. এর মত বড় হলেই প্রজননক্ষম হয়। বর্ষাকাল এ মাছের প্রজনন সময়। এ মাছ ধানক্ষেত, পুকুর, ডোবা, নালা, খাল, বিলে প্রজনন করে। ইনজেকশনের সাহায্যে ও কৃত্রিম উপায়ে এ মাছের প্রজনন করানো যায়।
৯.	বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের কাছে চাহিদা	ঃ	কই মাছ বিশেষতঃ বড় কই মাছের চাহিদা বিত্তবান শ্রেণীর কাছে অত্যন্ত বেশি। রোগীর পথ্য হিসেবেও এ মাছের চাহিদা রয়েছে এবং বেশ চড়া দামে এ মাছ বিক্রি করা যায়।
১০.	বাজারজাতকরণ	ঃ	১০ সেঃমিঃ বড় হলেই কই মাছ জালের সাহায্যে অথবা সেচের মাধ্যমে ধরা যায়। এ মাছ দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে এবং বিদেশে বিক্রি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করা যায়।

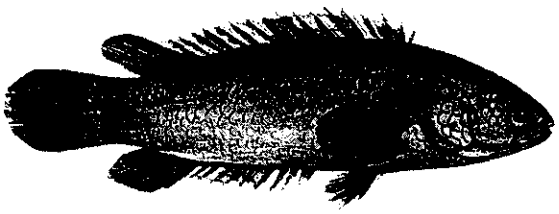

চিত্রঃ ৯ কই মাছ

পাবদা

১.	সাধারণ নাম	ঃ	পাবদা
২.	বৈজ্ঞানিক নাম	ঃ	ওম্পোক পাবদা (Ompok pabda)
৩.	দেহের বিবরণ	ঃ	এ মাছ প্রায় ২০-৩০ সেঃমিঃ লম্বা হয়। আকারে চ্যাপ্টা এবং সামনের দিকের চেয়ে পেছনের দিক ক্রমান্বয়ে সরু। দেখতে অনেকটা বোয়াল মাছের মত। এ মাছ আঁশবিহীন ও রূপালি রঙের। পুরুষ মাছের শিরদাঁড়ার খাঁজকাটাগুলো খুবই স্পষ্ট এবং স্ত্রী মাছের খাঁজকাটাগুলো অস্পষ্ট। মুখের সম্মুখভাগে ২ জোড়া শুঁড় আছে।
৪.	প্রাপ্তিস্থান	ঃ	বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ও নেপালে এ মাছ পাওয়া যায়।
৫.	বাসস্থান	ঃ	পুকুর, ডোবা, ধানক্ষেত, হাওড়-বাওড়, বিল ইত্যাদিতে পাবদা মাছ পাওয়া যায়। পানির উপরের স্তরে এ মাছ বাস করে। এ মাছ পুকুরেও চাষ করা যায়।
৬.	রোগবালাই	ঃ	ক্ষত রোগ হয়ে থাকে।
৭.	খাদ্য	ঃ	এ মাছ বিভিন্ন পোকামাকড় ও শেওলা খায়। তবে খৈল ও ফিশমিল সম্পূরক খাদ্য এরা পছন্দ করে।
৮.	প্রজনন	ঃ	মে, জুন ও জুলাই মাস পাবদা মাছের প্রজননকাল।
৯.	বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের কাছে চাহিদা	ঃ	এ মাছ অত্যন্ত সুস্বাদু। তাই আবহমানকাল থেকে এ মাছের চাহিদা সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই আছে।
১০.	বাজারজাতকরণ	ঃ	পাবদা মাছ লম্বায় প্রায় ২০ সেঃমিঃ হলে ধরা উচিত। বিদেশেও এর চাহিদা প্রচুর।

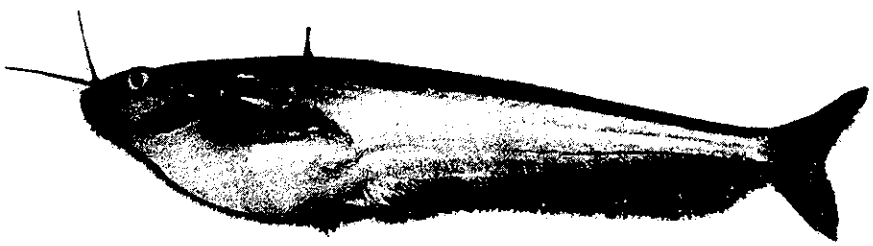

চিত্রঃ ১০ পাবদা মাছ

গলদা চিংড়ি

১.	সাধারণ নাম	ঃ	গলদা চিংড়ি
২.	বৈজ্ঞানিক নাম	ঃ	ম্যাক্রোব্রাকিয়াম রোসেনবার্গি (Macrobrachium rossenbergii)
৩.	দেহের বিবরণ	ঃ	গলদা চিংড়ি খোলসবিশিষ্ট অমেরুদন্ডী প্রাণী। গলদা চিংড়ি দেখতে গাঢ় সবুজ থেকে বাদামী বা কালচে রঙের হয়। পুরুষ চিংড়ি স্ত্রী চিংড়ি থেকে আকারে বড় হয় এবং পুরুষ চিংড়ির দ্বিতীয় পা অপেক্ষাকৃত বড়, কালো এবং চিমটাযুক্ত। গলদা চিংড়ির মাথা শরীর থেকে অনেক মোটা। মাথায় পাঁচ জোড়া ও বুকে আট জোড়া উপাঙ্গ আছে।
৪.	প্রাপ্তিস্থান	ঃ	দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সর্বত্র এই মাছ পাওয়া যায়।
৫.	বাসস্থান	ঃ	গলদা চিংড়ি উপকূলীয় অঞ্চল, পুকুর, নদী, খাল, বিল প্রভৃতি জায়গায় পাওয়া যায়।
৬.	রোগবালাই	ঃ	চিংড়ির স্বাস্থ্য ও রোগবালাই পর্যবেক্ষণের জন্য নিয়মিত চিংড়ির নমুনা পরীক্ষা করতে হয়। বিভিন্ন ধরণের জীবাণু ছত্রাক ও ভাইরাস আক্রমণ হতে পারে। যার ফলে চিংড়ির ফুলকায় কাল দাগ, দেহে শ্বেত রোগ, খোলস নরম হওয়া রোগ হতে পারে।
৭.	খাদ্য	ঃ	চিংড়ি মাছ প্রায় সর্বভুক। চিংড়ি সাধারণত জলাশয়ের নিচে চলাফেরা করে এবং সেখান থেকেই সব ধরণের খাদ্য সংগ্রহ করে। এ ছাড়া সম্পুরক খাদ্য হিসেবে কুঁড়া, ভুষি, খৈল, ফিশমিল দেয়া যেতে পারে।
৮.	প্রজনন	ঃ	গলদা চিংড়ি মিঠা পানির মাছ হলেও নদীর মোহনায় নোনা পানি ছাড়া ডিম পাড়ে না। এ মাছ ৭-৮ মাস বয়সেই প্রজননক্ষম হয়।
৯.	বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের কাছে চাহিদা	ঃ	অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে গলদা চিংড়ির ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। বিদেশে এ চিংড়ি রপ্তানি করে বাংলাদেশ প্রতি বছর প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।
১০.	বাজারজাতকরণ	ঃ	পুকুরে পরিবেশগত অবস্থা ঠিক থাকলে গলদা চিংড়ি ৬-৭ মাস বয়সেই বাজারজাত করা যায়। এ বয়সের ১৫-২০ টি গলদা চিংড়ি ১ কেজি হয়ে থাকে। বড় ফাঁসের বেড়জাল ব্যবহার করে বড় মাপের চিংড়ি ধরতে হয়।

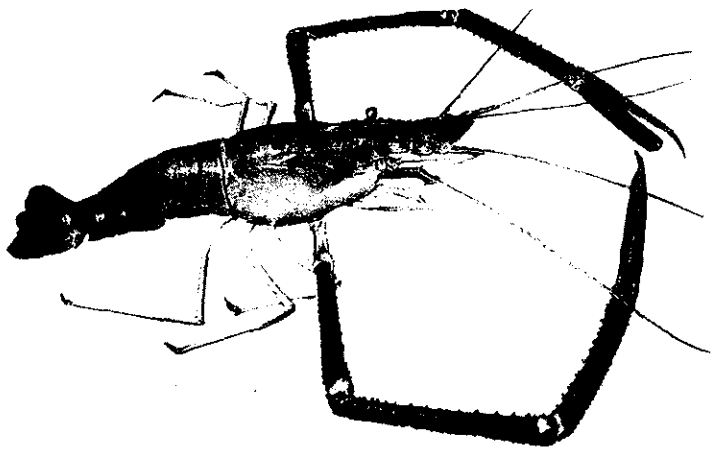

চিত্রঃ ১১ গলদা চিংড়ি মাছ

গ্রাসকার্প

১	সাধারণ নাম	ঃ	গ্রাসকার্প বা ঘেসো রুই
২.	বৈজ্ঞানিক নাম	ঃ	টেনোফ্যারিনগোডন ইডেলাস (Ctenopharyngodon idellus)
৩.	দেহে বিবরণ	ঃ	শরীর লম্বা, মধ্যভাগ কিছুটা চ্যাপ্টা, মুখমন্ডল গোলাকার। গলায় ভিতরে চিরুণির দাঁতের মত দু'সারি দাঁত আছে। শরীরের রং পেটের দিকে রূপালি সাদা ও পিঠের দিকে সবুজ। সারা শরীর মাঝারি আকারের আঁশ দিয়ে ঢাকা।
৪.	প্রাপ্তিস্থান	ঃ	চীন, হংকং এবং রাশিয়ার আমুর নদীতে পাওয়া যায় । ১৯৭০ সালে জাপানে থেকে বাংলাদেশে আনা হয়।
৫.	বাসস্থান	ঃ	এ মাছ পুকুর, ও অন্যান্য জলাশয়ের মধ্যস্তরে বাস করে।
৬.	রোগবালাই	ঃ	এ মাছের রোগবালাই খুব একটা দেখা যায় না। তবে মাঝে মাঝে পরজীবি দ্বারা আক্রান্ত হয়।
৭.	খাদ্য	ঃ	গ্রাসকার্প ঘাস খেকো এবং দ্রুত বর্ধনশীল। পোনা একটু বড় হলে হাইড্রিলা, মেরাটোফাইলাস, উলফিয়া, লেমন ইত্যাদি জলজ আগাছা খেয়ে বাঁচে। অনেক সময় লতাপাতা ও খায়।
৮.	প্রজনন	ঃ	এ মাছ দু' বছর বয়সে প্রজনন ক্ষমতা লাভ করে। পুকুরে বা বদ্ধ জলাশয়ে গ্রাসকার্পের পরিপক্কতা আসে। তবে পুকুরে ডিম ছাড়ে না । পিটুইটারি হরমোন ও এইচ,সি,জি, ব্যবহার করে কৃত্রিম প্রজনন করানো হয়ে থাকে। একটি পরিপক্ক গ্রাসকার্প হতে প্রায় দু'লক্ষ পর্যন্ত ডিম পাওয়া যায়।
৯.	বাজারজাতকরণ	ঃ	এ মাছ দ্রুত বর্ধনশীল। পুকুরে বছরে ২-৩ কেজি থেকে পর্যন্ত ওজনের হয়ে থাকে । বাজারে গ্রাসকার্পের চাহিদা রয়েছে।

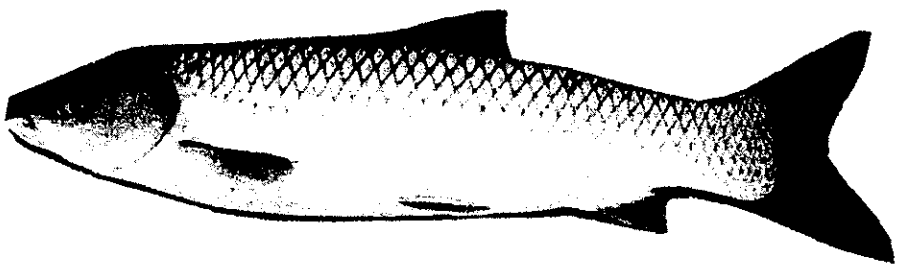

চিত্রঃ ১২ গ্রাসকার্প মাছ

সিলভারকার্প বা রূপালি রুই

১	সাধারণ নাম	ঃ	সিলভারকার্প বা রূপালি রুই
২.	বৈজ্ঞানিক নাম	ঃ	হাইপোথ্যালমিকথিস মলিটিক্স (Hypophthalmichthys molitrix)
৩.	দেহের বিবণ	ঃ	সিলভারকার্পের দেহের মধ্য অংশ চওড়া, মাথা ও লেজের দিক সরু। এ মাছ দেখতে অনেকটা ইলিশ মাছের মত। এর দেহ ক্ষুদে রূপালি রঙের আঁশ দিয়ে ঢাকা।
৪.	প্রাপ্তিস্থান	ঃ	চীন ও রাশিয়ার আমুর নদী। বর্তমানে পৃথিবীর অনেক দেশেই চাষ হচেছ। এদেশে ষাটের দশকের শেষে (১৯৬৯ সাল) এ মাছ আনা হয়।
৫.	বাসস্থান	ঃ	এরা খাল-বিল, পুকুর, হাওড় ও বাওড়ের পানির উপরের স্তরে বসবাস করে।
৬.	রোগবালাই	ঃ	দেহে নানা ধরণের পচন রোগ দেখা দেয়।
৭.	খাদ্য	ঃ	সিলভারকার্প ছোট অবস্থায় প্রাণি কণা খায়। পরিণত বয়সে উদ্ভিদকণা প্রধান খাদ্য, পচা জলজ উদ্ভিদও খায়।
৮.	প্রজনন	ঃ	দু'বছরে সিলভারকার্প প্রজননক্ষম হয়। তবে এরা বদ্ধ পানিতে ডিম পাড়ে না। বর্তমানে বিভিন্ন জায়গায় সিলভারকার্প মাছের কৃত্রিম প্রজনন হচেছ। সেসব জায়গা হতে পোনা সংগ্রহ করা যেতে পারে।
৯.	বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের কাছে চাহিদা	ঃ	রূপালি রুই বা সিলভারকার্প বিদেশী মাছ হলেও দাম কম থাকায় সর্বসাধারণের কাছে এর চাহিদা রয়েছে।
১০.	বাজারজাতকরণ	ঃ	বিদেশী মাছের মধ্যে সিলভারকার্প অত্যন্ত দ্রুত বর্ধনশীল। প্রথম বছর প্রায় দেড় কেজি এবং দ্বিতীয় বছরে ৪-৫ কেজি পর্যন্ত হয়।

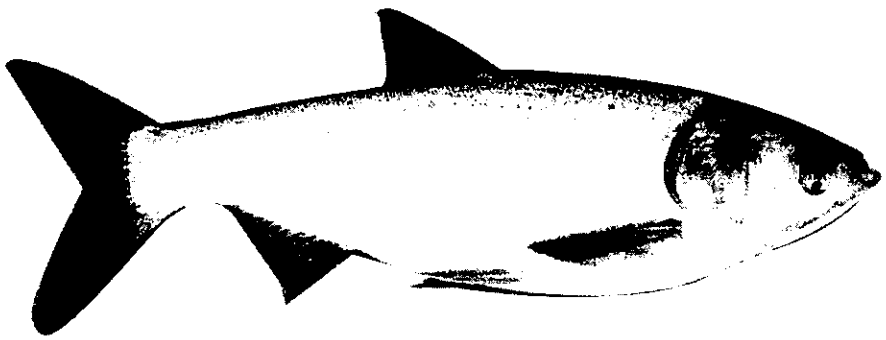

চিত্রঃ ১৩ সিলভারকার্প বা রূপালী রুই মাছ

বিগহেড কার্প

১	সাধারণ নাম	ঃ	বিগহেড কার্প বা বড় মাথাওয়ালা কার্প মাছ।
২.	বৈজ্ঞানিক নাম	ঃ	আরিসটেকথিস নোবিলিস (Aristichthys nobilis)
৩.	দেহের বিবরণ	ঃ	এ মাছ দেখতে সিলভার কার্পের মতই। কিন্তু দেহের তুলনায় মাথা অনেক বড়। এ মাছ অত্যন্ত দ্রুত বর্ধনশীল এবং তিন বছরে ৬ কেজি পর্যন্ত ওজন হয়। এর সারা দেহে আঁশে ঢাকা।
৪.	প্রাপ্তিস্থান	ঃ	এটি চীন দেশের মাছ। এ মাছ সত্তরের দশকের শেষে এ দেশে আনা হয় নেপাল থেকে।
৫.	বাসস্থান	ঃ	এ মাছ পুকুর, খাল-বিল ইত্যাদি জলাশয়ে পানির উপরের স্তরে বাস করে।
৬.	রোগবালাই	ঃ	এ মাছের রোগবালাই কম। তবে মাঝে মাঝে ক্ষতরোগ দেখা যায়।
৭.	খাদ্য	ঃ	ছোট ও প্রাপ্তবয়স্ক উভয় প্রকার বিগহেড কার্পই প্রধানতঃ জুপ্লাঙ্কটন খেয়ে থাকে এ ছাড়াও ছোট ছোট কীটপতঙ্গ খায়। প্রয়োজনে কুঁড়া এবং সরিষার খৈলও এ মাছ খায়।
৮.	প্রজনন	ঃ	তিন বছরের মধ্যেই এ মাছ প্রজননক্ষম হয়। এ মাছ বদ্ধ পানিতে ডিম পাড়ে না। কৃত্রিম উপায়ে ডিম থেকে পোনা উৎপাদন করা যায়।
৯.	বাজাজাতকরণ	ঃ	এক বছর পরেই বাজারজাত করা যেতে পারে । কারণ এ সময়ে এ মাছের ওজন দেড় কেজি হতে দুই কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে।

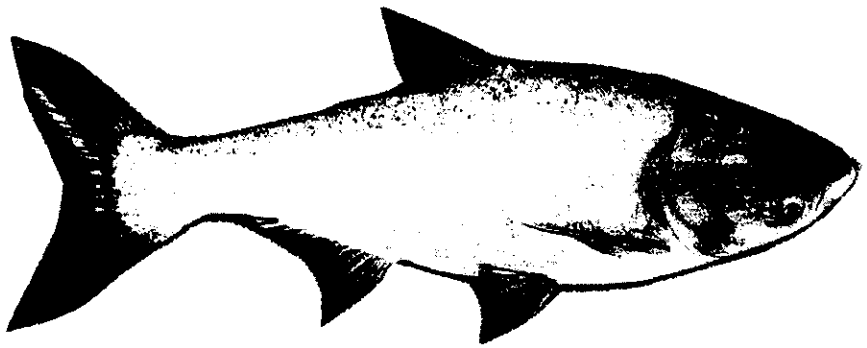

চিত্রঃ ১৪ বিগহেডকার্প মাছ

মিররকার্প

১	সাধারণ নাম	ঃ	মিররকাপ
২.	বৈজ্ঞানিক নাম	ঃ	সাইপ্রিনাস কার্পিও (স্কেকুলারিস) (Cyprinus carpio, Specularis)
৩.	দেহের বিবরণ	ঃ	মিররকার্পের দেহে বড় আকারের মাত্র কয়েকটি উজ্জ্বল ও চকচকে আঁশ থাকে। এই আঁশগুলো আয়নার মত। তাই এ মাছের নাম মিররকার্প। মিররকার্পের মাথা শরীরের তুলনায় খুবই ছোট। এর পেট মোটা এবং এতে প্রচুর চর্বি থাকে। কমনকার্পের মত এ মাছের পিঠ ও অনেকটা ধনুকের মত।
৪.	প্রাপ্তিস্থান	ঃ	মিররকার্প ১৯৭৯ সালে থাইল্যান্ড থেকে আমাদের দেশে আনা হয়।
৫.	বাসস্থান	ঃ	মিররকার্প জলাশয়ে পানির নিম্নস্তরে বাস করে।
৬.	রোগবালাই	ঃ	মিররকার্পের বিভিন্ন ক্ষতরোগের সংক্রমণ দেখা যায়।
৭.	খাদ্য	ঃ	ছোট অবস্থায় ক্ষুদ্র প্রাণিকণা খায়। বড় অবস্থায় শৈবাল,জুপ্লাংটন, জলজউদ্ভিদ ও কাদামাটি খায়। পুকুরের তলার পোকামাকড় এবং কীটপতঙ্গ এদের প্রিয় খাদ্য। পুকুরের তলা খুঁড়ে খাদ্য খায় এজন্য অনেক সময় পাড় ভেঙ্গে পড়ে।
৮.	প্রজনন	ঃ	মিররকার্প এক বছর বয়সেই যৌবনপ্রাপ্ত হয়। মিররকার্প বদ্ধ পানিতে প্রজননক্ষম হয়ে ডিম পাড়ে। এ মাছ জানুয়ারি থেকে মার্চ মাসে একবার এবং জুলাই থেকে আগষ্ট মাসে আরেকবার অর্থাৎ বছরে দু'বার ডিম পাড়ে।
৯.	বাজারজাতকরণ	ঃ	মিররকার্প এক বছরের মধ্যেই বাজারজাত করা যায়। কারণ এক থেকে দেড় কেজি ওজনের মাছের চাহিদা বাজারে বেশী।

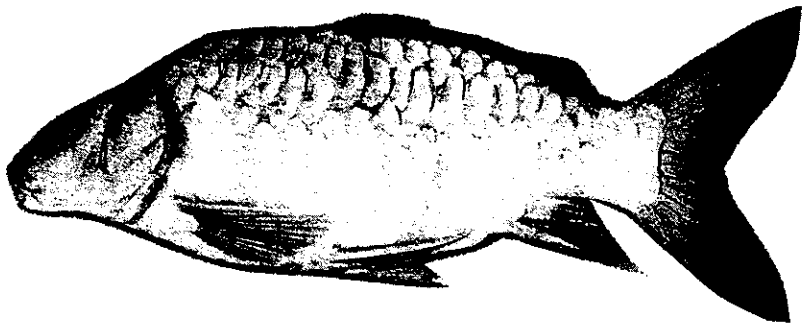

চিত্রঃ ১৫ মিররকার্প মাছ

কমনকার্প

১.	সাধারণ নাম	ঃ	কার্ফু মাছ
২.	বৈজ্ঞানিক নাম	ঃ	সাইপ্রিনাস কার্পিও (কমিউনিস) (Cyprinus carpio, Communis)
৩.	দেহের বিবরণ	ঃ	কমনকার্প এর মাথা শরীরের তুলনায় খুব ছোট, পেট মোট এবং পিঠ ধনুকের মত বাঁকানো। এর গায়ের রং হাল্কা হলুদাভ। সারা দেহ আঁশ দিয়ে ঢাকা।
৪.	প্রাপ্তি স্থান	ঃ	চীন/থাইল্যান্ড থেকে আমাদের দেশে আনা হয়।
৫.	বাসস্থান	ঃ	এ মাছ পুকুর বা জলাশয়ে পানির নিচে স্তরে বাস করে।
৬.	রোগবালাই	ঃ	কমনকার্পে বিভিন্ন ক্ষতরোগের আক্রমণ দেখা দেয়।
৭.	খাদ্য	ঃ	পুকুরের তলায় এ মাছ খাদ্য অন্বেষণ করে । এরা ছোট অবস্থায় প্রাণিকণা খায় এবং বড় হলে শৈবাল, প্লাংটন, জলজউদ্ভিদ ও কাদামাটি খায়। পুকুরের কাদার মধ্যে যে সব কীট ও পোকার জন্ম হয় কমনকার্প সেগুলো খেতেও ভালবাসে। এজন্য পুকুরের পাড় ভাংগার কারণ হতে পারে।
৮.	প্রজনন	ঃ	বিদেশী মাছের মধ্যে কমনকার্প এক বছরেই ডিম পাড়ে। কমনকার্পই বদ্ধ জলাশয়ে ডিম পাড়ে। বর্ষাকালে ও শীতের পরে বছরে দু'বার ডিম পাড়ে। তাই এ মাছ চাষে পোনা সংগ্রহের কোন সমস্যা নেই। যত্ন নিলে পুকুরের পানিতে ডিম থেকেই এদের বাচ্চা হয়।
৯.	বাজারজাতকরণ	ঃ	এ মাছ দ্রুত বাড়ে। যেহেতু বাজারে এক থেকে দেড় কেজি ওজনের চাহিদাই বেশি সেজন্য চাষের এক বছরের পর থেকে মাছ ধরা ও বাজারজাত করা উচিত।

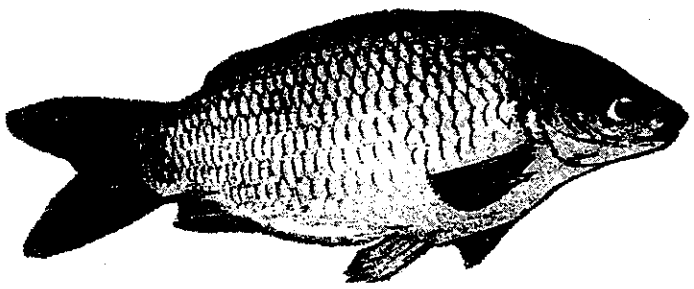

চিত্রঃ ১৬ কমনকার্প মাছ

রাজপুঁটি বা থাই সরপুঁটি

১.	সাধারণ নাম	ঃ	রাজপুঁটি
২.	বৈজ্ঞানিক নাম	ঃ	পুন্টিয়াস গোনিওনোটাস (Puntius gonionotus)
৩.	দেহের বিবরণ	ঃ	সরপুঁটি গায়ের রং উজ্জ্বল রূপালি বর্ণের। এ মাছ দেশী সরপুঁটির চেয়ে উজ্জ্বল রঙের। এর লেজ খাঁজ কাটা। এই মাছের বুক ও পাখনার রং হালকা হলুদ। এর ছোট দু'জোড়া গোঁফ আছে। মাছগুলো চেপ্টা।
৪.	প্রাপ্তি স্থান	ঃ	থাইল্যান্ড হতে ১৯৭৭ সালে এ মাছ প্রথম আনা হয়।
৫.	বাসস্থান	ঃ	থাই সরপুঁটি পুকুর, খাল-বিল, হাওড় বাওড় ইত্যাদি জলাশয়ে পানির উপরের স্তরে বাস করে।
৬.	রোগবালাই	ঃ	তিন শ্রেণীর পরজীবীর আক্রমণে এদের শরীরে ক্ষতরোগ হতে পারে। পানি দূষিত হলে প্রথমত ভাইরাস ও দ্বিতীয় পর্যায়ে ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া দ্বারা ক্রমান্বয়ে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয় ও মাছ মারা যায়।
৭.	খাদ্য	ঃ	মাছের খাদ্যরূপে পরিচিত যে কোনো ধরণের খাবারই রাজপুঁটি খেতে পারে। পোনা অবস্থায় এককোষী শ্যাওলা ও জুপ্লাংটন খায়। পরিণত বয়সে এরা জলজ ম্যাক্রোফাইট খায়। এছাড়া কুঁড়া ও সরিষার খৈলের গুড়া খায়। এদের প্রিয় খাদ্য হলো ক্ষুদে পানা।
৮.	প্রজনন	ঃ	সরপুঁটি এক বছর বয়সেই যৌন পরিপক্কতা লাভ করে। এরা সাধারণতঃ বদ্ধ পানিতে ডিম পাড়ে না। তবে কৃত্রিম উপায়ে হ্যাচারিতে এর প্রজনন করানো ও পোনা উৎপাদন করা যায়। তবে পুকুরে কোন কারণে স্রোতের সৃষ্টি হলে ডিম পাড়ে।
৯.	বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের কাছে চাহিদা	ঃ	বাজারে সরপুঁটির চাহিদা অনেক। মাছের বাজার দরও ভাল।
১০.	বাজারজাতকরণ	ঃ	এ মাছ দ্রুত বৃদ্ধি লাভ করে । পাঁচ ছয় মাসে সরপুঁটি ১৫০-২৫০ গ্রাম ওজনের হয়ে যায়। তখনই বেড় জাল বা ঝাঁকি জাল দিয়ে মাছ ধরে বাজারজাত করা যায়।

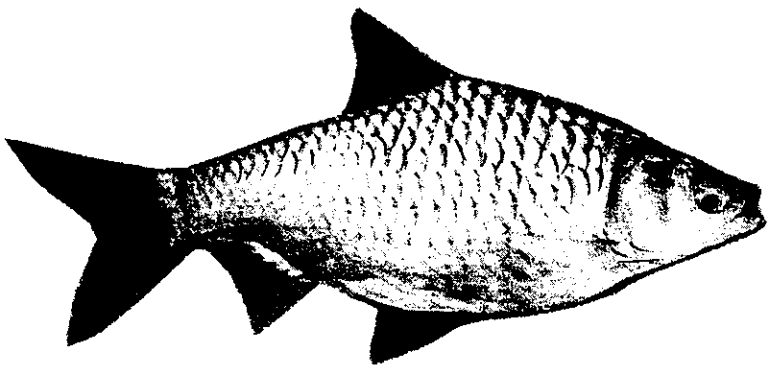

চিত্রঃ ১৭ রাজপুঁটি বা থাই সরপূটি মাছ

তৃতীয় অধ্যায়

গ্রামীণ পুকুরে মাছ চাষ প্রযুক্তি প্রয়োগ ও ব্যবস্থাপনা

দেশে বর্তমানে প্রায় ১৫ লক্ষাধিক দিঘী-পুকুর রয়েছে তা ছাড়াও রয়েছে কয়েক লক্ষ মৌসুমী পুকুর। এ সবের আয়তন বর্তমানে প্রায় ২ লক্ষ ৪১ হাজার হেক্টর। এ উৎস হতে ২০০০-২০০১ সালে উৎপাদন ছিল প্রায় ৬ লক্ষ ১৫ হাজার মেঃ টন। অর্থাৎ উৎপাদনশীলতা গড়ে বছরে হেক্টর প্রতি ২৫৫০ কেজি। পক্ষান্তরে পার্শ্ববর্তী দেশ সমুহে এ উৎপাদন হার অনেক বেশী। বর্তমানে দেশে অধিক ফলনশীল মাছচাষ প্রযুক্তি রয়েছে। এসব প্রযুক্তির যথাযথ সম্প্রসারণ ও প্রয়োগ করে সকল জলাশয় মৎস্য চাষের আওতায় আনা হলে সার্বিক উৎপাদন কয়েক গুণ বাড়ানো সম্ভব। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে দেশের দিঘী-পুকুর থেকে বছরে প্রায় ৯-১০ লক্ষ মেঃ টন মাছ উৎপাদন করা সম্ভব। দেশে যে পরিমাণ গৃহস্থালি পুকুর, দিঘী ও ডোবা আছে তার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করা হলে গৃহস্থের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পুরণসহ বাড়তি আয়ের সংস্থান করা যায়।

স্থায়ী পুকুরে মাছ চাষ

সারা বছর পুকুরে মাছচাষ করার মত ১-২.৫ মিটার গভীরতায় পানি থাকে এমন পুকুরে মাছের পোনা মজুদ করে লালন পালনের মাধ্যমে খাওয়ার ও বাজারজাতকরণের উপযোগী মাছ চাষ করাকে স্থায়ী পুকুরে মাছ চাষ বুঝায়।

কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ

রুই, কাতলা, মৃগেল, কালবাউশ, বিগহেড, সিলভার কার্প, কমন কার্প ইত্যাদি মাছকে কার্প জাতীয় মাছ বলা হয়। এসব মাছ পুকুরের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে বসবাস করে এবং বিভিন্ন স্তরের খাবার খায়। তাই বিভিন্ন স্তরে উৎপন্ন খাবার সম্পূর্ণ ব্যবহার করার জন্য নানা প্রজাতির মাছ একত্রে চাষ করা হয়। কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ তুলনামূলকভাবে সহজ ও দেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত।

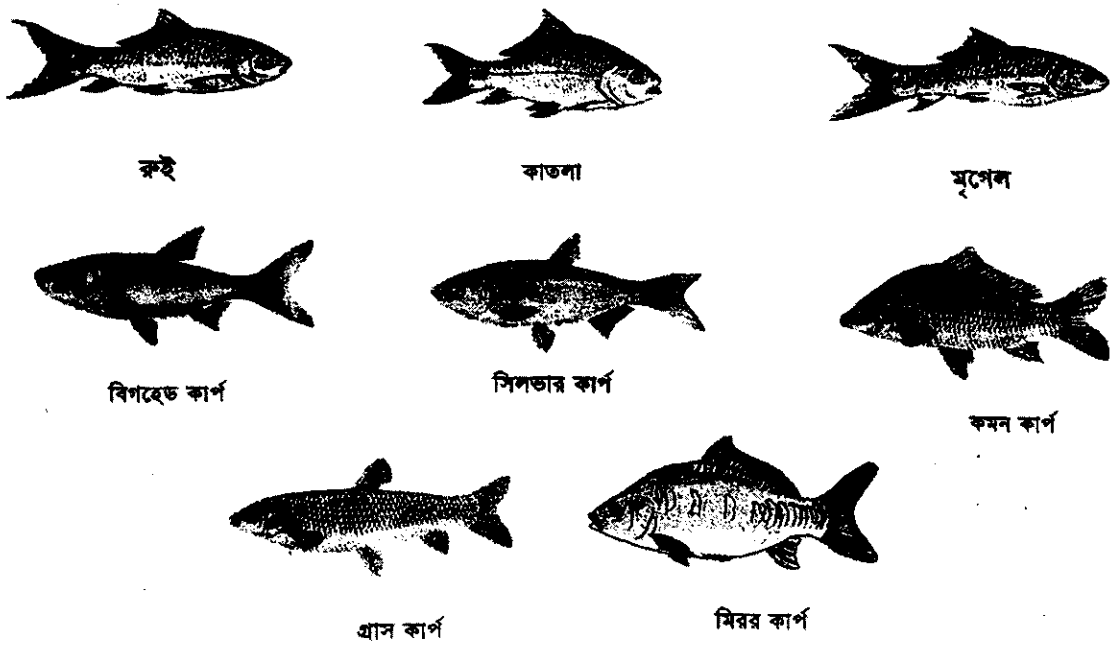

চিত্র ঃ ১৮ কার্প জাতীয় মাছ

পুকুরের স্থান নির্বাচন

যদি কোন গৃহস্থ নতুন কোন পুকুর খনন করতে চান, সেক্ষেত্রে কতকগুলো বিষয় বিবেচনা করতে হবে। পুকুরটি খোলামেলা জায়গায় হবে। পুকুর বাড়ীর আশেপাশে হলে ভাল হয়। সাধারণতঃ এটেল, দোআঁশ ও এটেল-দোঁআশ মাটি পুকুরের জন্য ভাল। এ পুকুরের পানি ধারণ ক্ষমতা ভাল এবং উর্বরতা বেশী। পুকুর বন্যামুক্ত এলাকায় খনন করা উচিত। পুকুরের আয়তন ১ বিঘার চেয়ে বড় হলে ভাল হয়। পুকুরের গভীরতা ২-৩ মিটার রাখা ভাল। পুকুর পাড়ে গাছ বা ঝোপ-ঝাড় থাকা উচিত নয়। কারণ বড় গাছের পাতা পড়ে পানি নষ্ট হতে পারে। বড় গাছ পুকুরে সূর্যের আলো পড়তে বাধার সৃষ্টি করে। ঝোপ-ঝাড়ে মৎস্যভূক ও ক্ষতিকর প্রাণী বাস করে মাছের ক্ষতি করে থাকে।

পুকুর প্রস্তুতি

গৃহস্থের বিদ্যমান পুকুরে নিয়ম মাফিক মাছচাষ করার আগে তা উপযুক্ত করে তৈরি করে নেয়া দরকার। যেমন- ধান চাষের আগে জমি তৈরি করা হয়।

জলজ আগাছা পরিষ্কার : কচুরীপানা, কলমীলতা, হেলেঞ্চা, শালুক ইত্যাদি জলজ আগাছা শিকড়সহ তুলে ফেলতে হবে।

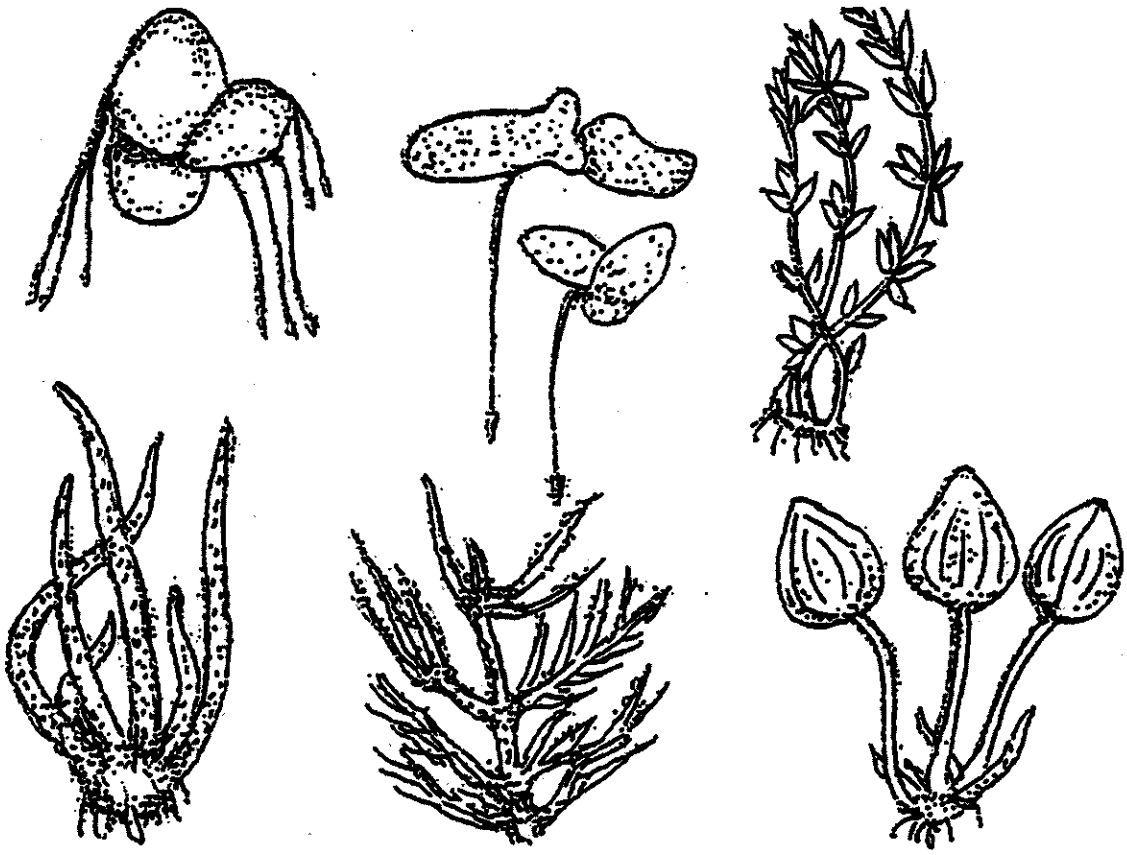

চিত্র ঃ ১৯ কতিপয় জলজ আগাছা

রাক্ষুসে ও অচাষযোগ্য মাছ অপসারণ : শোল, গজার, বোয়াল, টাকি এবং মলা, ঢেলা, চান্দা, পুঁটি ইত্যাদি যা ঐ পুকুরে কার্পের সাথে চাষযোগ্য নয় তা সরিয়ে ফেলতে হবে।

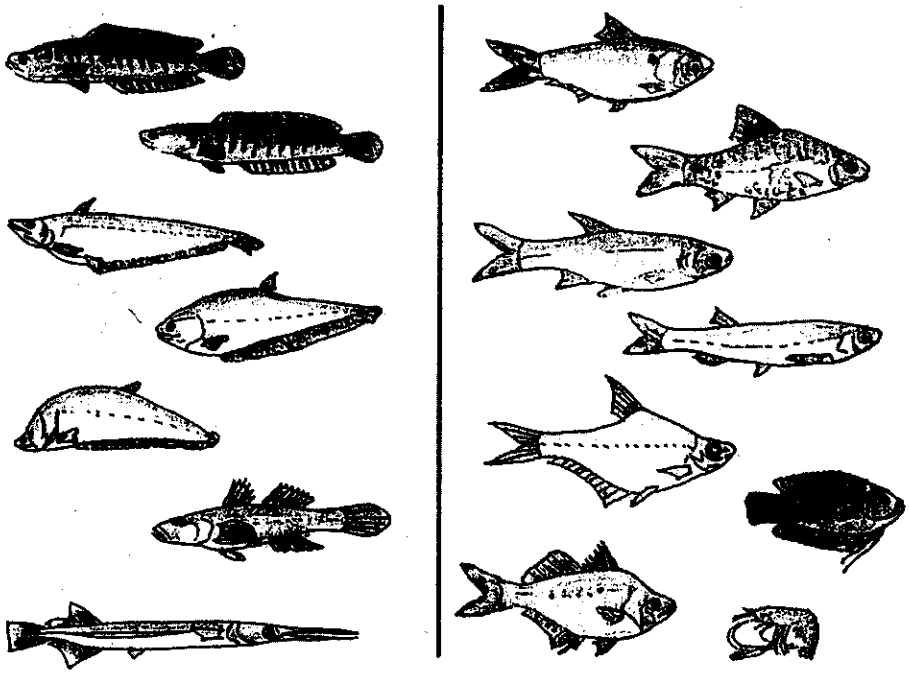

চিত্র ঃ ২০ কতিপয় রাক্ষুসে ও অচাষযোগ্য মাছ

রাক্ষুসে ও অচাষযোগ্য মাছ অপসারণের জন্য প্রতি ৩০ সেঃ মিঃ পানির গভীরতায় শতাংশ প্রতি ২৫-৩০ গ্রাম রোটেনন পাউডার পানিতে গুলে ছিটিয়ে দিতে হবে। পুকুর শুকিয়েও এসব মাছ অপসারণ করা যায়।

চুন প্রয়োগ

রাক্ষুসে মাছ দমনের জন্য ঔষধ প্রয়োগ বা পুকুর শুকানোর পর চুন ব্যবহার করতে হয়। চুন ক্ষতিকর পোকা মাকড় ও রোগ জীবাণু ধ্বংস করে এবং মাটি ও পানির পরিবেশ ভাল রাখে। সাধারণতঃ পুকুরে শতাংশ প্রতি ১ কেজি হারে চুন পানিতে গুলে পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হয়। লাল মাটিতে চুন প্রয়োগের পরিমাণ শতাংশ প্রতি ২ কেজি হতে পারে।

চিত্র ঃ ২১ পুকরে চুন প্রয়োগ

সার প্রয়োগ

চুন দেয়ার এক সপ্তাহ পর জৈব ও অজৈব সার দিতে হবে। গোবর, হাঁস মুরগির বিষ্ঠা, কম্পোস্ট জৈব সার। ইউরিয়া, টিএসপি এবং এমপি সার অজৈব সার। প্রতি শতাংশে ৫-৭কেজি গোবর বা ৩-৪ কেজি হাঁস মুরগির বিষ্ঠা, ইউরিয়া ১০০-১৫০ গ্রাম, টিএসপি ৫০-৭৫ গ্রাম এবং ২০ গ্রাম এমপি সার পানিতে গুলে ছিটিয়ে দিতে হয়।

চিত্র ঃ ২২ পুকুরে সার প্রয়োগ

পানি সংগ্রহ

পুকুর যদি শুকিয়ে ফেলা হয় তবে সার প্রয়োগের পর পরই বাইরের কোন উৎস থেকে পানি ছেঁকে পুকুরে সংগ্রহ করতে হবে। যাতে ঐ উৎস থেকে অচাষযোগ্য কোন মাছ, ডিম, পোনা ইত্যাদি ঢুকতে না পারে। টিউবওয়েল থেকে সরাসরি পুকুরে পানি দেয়া যায়।

পোনা মজুদ

সার প্রয়োগের ৭-১০ দিন পর পুকুরে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য (উদ্ভিদ ও প্রাণিকণা) উৎপন্ন হলে পোনা মজুদ করতে হয়। এ সময় পানির রং সবুজ ও ধুসর রংয়ের মনে হয়। মজুদযোগ্য পোনার আকার কমপক্ষে ১০-১২ সে.মি হলে ভাল হয়। পুকুরের ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী পোনা মজুদের হার কম বেশী হতে পারে।

পুকুরের স্তর	মাছের প্রজাতি	শতাংশ প্রতি পোনা মজুদ ঘনত্ব	
		শুধু সার ব্যবহার করা হলে	সার ও খাদ্য ব্যবহার করলে
উপরের স্তর	কাতলা	৪-৫টি	৫-৬টি
	সিলভার/বিগহেড কার্প	৪-৬টি	৯-১০টি
মধ্যস্তর	রুই	৫-৬ টি	৯-১০ টি
নীচের স্তর	মৃগেল/কালবাউশ	২-৩ টি	৩-৪ টি
	মিরর/কমন কার্প	৩-৪ টি	৪-৫ টি
সকল স্তর	গ্রাস কার্প	১-২ টি	২-৩ টি
	সরপুটি	২-৩ টি	৪-৬ টি
মোট মজুদ ঘনত্ব		২১-২৯ টি	৩৬-৪৪ টি

পোনা ছাড়ার পদ্ধতি

পোনা যদি হাঁড়ি বা পলিথিন ব্যাগে আনা হয় তবে পলিথিন ব্যাগটির মুখ খোলার আগে পুকুরের পানিতে ২০-২৫ মিনিট ভাসিয়ে রাখতে হয়। তারপর ব্যাগের মুখ খুলে অল্প অল্প করে ব্যাগের পানি ও পুকুরের পানি পরিবর্তন করে নিতে হয়। ১৫-২০ মিনিটের মধ্যে ব্যাগের পানির তাপমাত্রা পুকুরের পানির তাপমাত্রার সমান হবে। তখন পাত্র বা ব্যাগের মুখ আধা পানিতে ডুবিয়ে কাত করে পানির ঢেউ দিলে সমস্ত পোনা পুকুরে চলে যাবে।

চিত্র ঃ ২৩ পুকুরে পোনা ছাড়ার পদ্ধতি

মজুদপরবর্তী ব্যবস্থাপনা

সার প্রয়োগ

পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য কমার আগেই উপরি সার প্রয়োগ করতে হয়। সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী দৈনিক শতাংশ প্রতি কম বেশী ২৫০ গ্রাম গোবর, ৫ গ্রাম ইউরিয়া এবং ৩ গ্রাম টি.এস.পি একত্রে একটি পাত্রে তিনগুণ পানির সাথে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হয়। এরপর গুলানো সার সকাল ৯-১০ টার সময় পুকুরে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। এভাবে সার দিলে প্রাকৃতিক খাদ্য সব সময় প্রায় একই পরিমাণ থাকে। মেঘলা দিনে সার দেয়া উচিৎ নয়।

সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ

কার্প জাতীয় মাছের জন্য সম্পূরক খাবার হিসেবে তৈলবীজের খৈল ও চালের কুঁড়া বা গমের ভুষি সমান অনুপাতে মিশিয়ে খাবার তৈরী করা যায়। ১০-১২ ঘন্টা ভিজানো খৈলের সাথে শুকনো চালের কুঁড়া বা গমের ভুষি মিশিয়ে গোলাকার শক্ত দলা তৈরী করতে

হয়। তবে এই খাদ্যের সাথে ফিশমিল ১-২% বা কসাইখানার রক্ত মিশিয়ে দিলে খাদ্যের গুণ বৃদ্ধি পায়। ১০ কেজি খাবারের সাথে ২০-২৫ গ্রাম ভিটামিন প্রিমিক্স মিশিয়ে দিয়ে খাদ্যের মান বাড়ানো যায়।

চিত্র ঃ ২৪ পুকুরে সম্পুরক খাদ্য প্রয়োগ

সম্পূরক খাবার ব্যবহার মাত্রা

পোনা মজুদের পর ২ মাস পর্যন্ত মজুদকৃত মাছের মোট ওজনের শতকরা ৫ ভাগ হারে খাবার প্রয়োগ করা প্রয়োজন। পরবর্তীতে মাছের মোট ওজনের শতকরা ৩ ভাগ হারে খাবার দিলেই চলবে। শীতকালে খাবারের পরিমাণ শতকরা ১-২ ভাগ হারে সরবরাহ করতে হয়। খাবারের মাত্রা মাছের বৃদ্ধি ও প্রাকৃতিক খাবার মজুদের উপর নির্ভরশীল। প্রয়োগ করা খাদ্য মাছ সম্পুর্ণ ভাবে খাচেছ কিনা তা পর্যবেক্ষণ করে সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে। প্রতি মাসে পুকুরে সম্পুরক খাবার খায় এমন প্রজাতির কি পরিমাণ মাছ আছে তা নির্ণয় করে পরবর্তী মাসের প্রতি দিনের খাবার নির্ধারণ করতে হয়। ঝাঁকি জাল দিয়ে মাছ ধরে ধৃত মাছের গড় ওজন নিয়ে পুকুরের মোট মাছের ওজন নির্ণয় করা হয়।

পুকুরের তলদেশ পরিচর্যা

পুকুরের তলদেশে ক্ষতিকর গ্যাস জমে থাকতে পারে। দড়ির সাথে লোহা বা মাটির কাঠি কিংবা ইট বেঁধে হররা তৈরী করে তা পুকুরের তলদেশ ঘেঁষে আস্তে আস্তে টেনে তলার গ্যাস বের করে দিতে হয়। কাজটি সপ্তাহে দু/এক বার করা দরকার।

মাছের স্বাস্থ্য ও বৃদ্ধি পরীক্ষা

জাল টেনে মাছ ধরে স্বাস্থ্য ও বৃদ্ধি পরীক্ষা করতে হয়। জালের মধ্য থেকে বিভিন্ন প্রজাতির ৫-১০ টি মাছ নিয়ে তার ওজন নিতে হয়। এ থেকে গড় ওজন বের করে বিগত মাসের ওজনের সাথে তুলনা করে মাছের বৃদ্ধির হিসাব করা হয়। এ কাজটি পুকুরে মাছের খাবার প্রয়োগের হিসাব নির্ণয়ের সময় করা হয়ে থাকে।

মাছ আংশিক আহরণ

পুকুরে ৫-৬ মাস পালনের পর বাজারজাতকরণের উপযুক্ত বড় মাছ জাল দিয়ে ধরে ফেলতে হবে। যে কয়টি মাছ ধরা হল তার বদলে একই জাতের সমসংখ্যক ১২-১৫ সেঃমিঃ আকারের পোনা মজুদ করতে হয়। যেহেতু এ ক্ষেত্রে পুকুরে মজুদ বড় মাছের সাথে নতুন করে পোনা ছাড়া হয় সেজন্য পোনার আকার পুর্বাপেক্ষা বড় হওয়া বাঞ্চনীয়।

চুড়ান্ত আহরণ

উৎপাদন মৌসুম শেষে মাছ বড় হলে বৎসরে একবার চুড়ান্তভাবে সব মাছ ধরে ফেলা উচিত। তবে পুকুর এক বার প্রস্তুত করে নিয়ে মাছচাষ শুরু করলে ২ বছর ক্রমাগত চাষ করা যায়। এজন্য পুকুরে বছর শেষে কি জাতের কত সংখ্যক মাছ থাকলো তার সঠিক হিসাব রাখতে হবে।

চিত্র ঃ ২৫ পুকুরের মাছ আহরন

সম্ভাব্য উৎপাদন, আয় ও ব্যয়

এক হেক্টর আয়তনের গ্রামীণ পুকুরে কার্পের মিশ্র চাষের জন্য বাৎসরিক আয় ব্যয়ের হিসাব

ক্রমিক নং	ব্যয়ের বিবরণ	পরিমাণ	মূল্য
১	পুকুর শুকানো/মাছ মারার ঔষধ প্রয়োগ	গুচ্ছ	৪,০০০/-
২	চুন	৫০০ কেজি	৪,০০০/-
৩	জৈব সার	১৫,০০০ কেজি	১৫,০০০/-
৪	ইউরিয়া	৫০০ কেজি	৩,০০০/-
৫	টিএসপি	২৫০ কেজি	৩,০০০/-
৬	এমপি	১০০ কেজি	৬০০/-
৭	চাউলের কুঁড়া/গমের ভূষি	২,৫০০ কেজি	১২,৫০০/-
৮	তৈল বীজের খৈল	২,৫০০ কেজি	১৭,৫০০/-
৯	মাছের পোনা (১০-১২ সেঃ মিঃ)	১০,০০০টি	১০,০০০/-
১০	মাছ আহরণ ও বাজার জাত করণ	গুচ্ছ	২,০০০/-
১১	শ্রমিক ব্যয়	৭৫ দিবস	৩,৭০০/-
১২	মাছ চাষের যন্ত্রপাতি	গুচ্ছ	১২০০/-
১৩	ঔষধ	গুচ্ছ	২,০০০/-
১৪	বিবিধ	গুচ্ছ	১,৫০০/-
		মোট =	৮০,০০০/-

* পুকুর ভাড়া এবং ব্যাংক ঋণ নিয়ে মাছ চাষ করলে আরও ২৮,০০০/- টাকা বেশী ব্যয় হবে।

উৎপাদন ও আয়

উৎপাদন ঃ ৫,০০০ কেজি মাছ।
আয় ঃ প্রতি কেজি ৪০/- টাকা হিসেবে ৫,০০০ কেজির মূল্য = ২,০০,০০০/- টাকা।
মুনাফা ঃ ২,০০,০০০/- - ৮০,০০০/- = ১,২০,০০০/- টাকা।

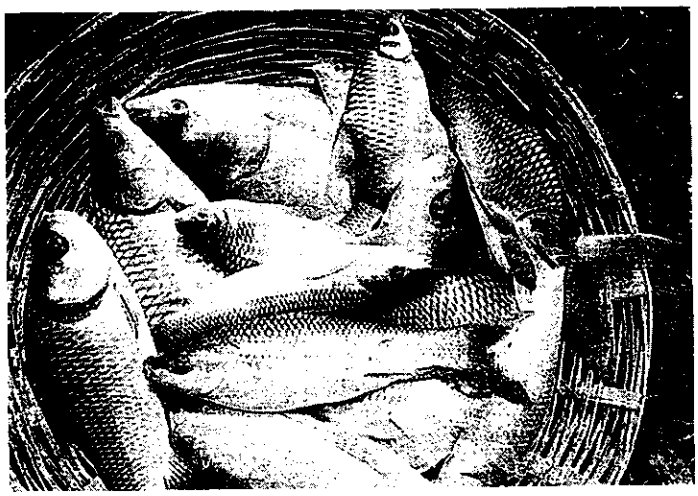

চিত্র ঃ ২৬ কার্প জাতীয় মাছ

কার্প ও গলদা চিংড়ির মিশ্রচাষ

কার্প জাতীয় মাছের সাথে গলদা চিংড়ি সহজেই পুকুরে মিশ্রচাষ করা যায়, ফলে কার্প মাছ চাষের সাথে গলদা বাড়তি উৎপাদন হিসেবে পাওয়া যায় এবং লাভও বেশী হয়। সারা দেশের পুকুরেই গলদা চিংড়ির চাষ করা যায়। প্রাকৃতিক উৎস্য ছাড়াও হ্যাচারিতে গলদার পোনা উৎপন্ন হচেছ। হ্যাচারি থেকে এ পোনা সংগ্রহ করে পুকুরে কার্পের সাথে চাষ করা যায়।

পুকুরের বৈশিষ্ট

- পুকুরটি হবে খোলামেলা জায়গায় যেখানে বেশীর ভাগ সময় সূর্য্যের আলো পড়ে।
- বাড়ীর কাছাকাছি হলে দেখাশুনা করতে ভাল হয়।
- সারা বৎসর পানি থাকে অর্থাৎ শুকনো মৌসুমে পানির গভীরতা কমপক্ষে ১ মিটার এবং বর্ষা মৌসুমে ২-২.৫ মিটার।
- চিংড়ি চাষ করতে হলে গভীরতা কম হওয়া উচিত।
- পুকুরের তলদেশে অতিরিক্ত কাদা থাকবে না।
- প্রয়োজনে বাহির থেকে পানি ঢুকানোর সুবিধা থাকতে হবে।
- বন্যামুক্ত পাড়।

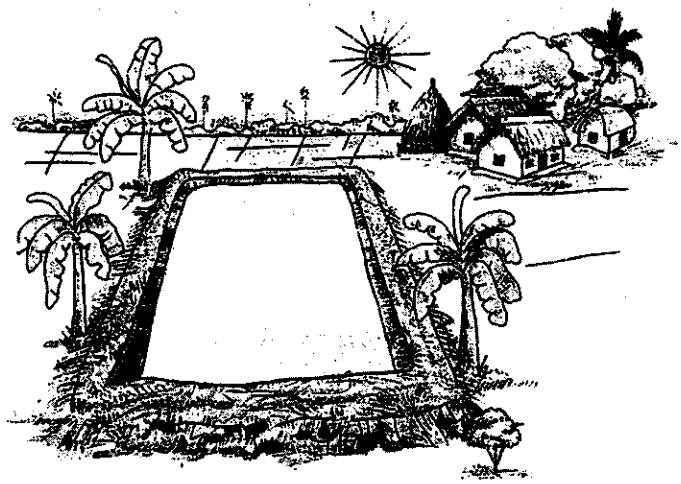

চিত্র ঃ ২৭ মিশ্র চাষের পুকুর

পোনা ছাড়ার আগে নয়টি গুরুত্বপূর্ণ কাজ

১। পাড় ও পুকুরের তলা সংস্কার করা
২। আগাছা ও পাড় পরিস্কার করা
৩। রাক্ষুসে ও অচাষকৃত মাছ দূর করা
৪। চুন প্রয়োগ করা
৫। পোনা খুঁজে দেখা
৬। সার প্রয়োগ করা
৭। পানির বিশুদ্ধতা পরীক্ষা
৮। প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা
৯। চিংড়ির আশ্রয়স্থল স্থাপন

পুকুর পাড় সংস্কার করা

পুকুরের পাড় ভাংগা থাকলে, নালা কাটা থাকলে, ইঁদুরের গর্ত থাকলে বা নীচু থাকলে মেরামত করতে হবে। এতে পুকুরের পানি বেরিয়ে যেতে পারবে না কিংবা বাহির থেকে পানি ভিতরে ঢুকতে পারবে না, এমন কি বন্যার সময় পানি ঢুকবে না। ফলে অচাষযোগ্য মাছ পুকুরে ঢুকতে পারবে না এবং মাছের রোগ-বালাই এর সম্ভাবনা কম থাকবে এবং পাড়ে শাক-সবজী চাষ করা যাবে।

পুকুরের তলা সংস্কার

পুকুরের তলায় অতিরিক্ত কাঁদা থাকলে পুকুর শুকিয়ে অতিরিক্ত কাঁদা সরিয়ে ফেলতে হবে। অতিরিক্ত কাদা গ্যাসের সৃষ্টি করে, যার ফলে মাছ মারা যায়। এতে ফলন কম হয় তাছাড়া পুকুরের তলা সমান না থাকলে মাছ ধরতে অসুবিধা হয়।

আগাছা ও পাড় পরিষ্কার

পুকুর সব সময় পরিষ্কার রাখা দরকার। পুকুরের পাড়ে অবস্থিত ঝোপঝাড় থাকলে তা কেটে ফেলতে হবে এবং পাড়ে অবস্থিত বড় গাছের ডালপালা ছেটে দিতে হবে। তাছাড়া পুকুর থেকে সব ধরণের আগাছা সরিয়ে ফেলতে হবে। পুকুর পরিষ্কার থাকলে

- বেশী সুর্যের আলো পড়ে
- বেশী প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরী হয়
- পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ বেশী থাকে
- মাছের চলাচল সহজ হয়
- মাছ খেকো জীবজন্তুর উপদ্রব কম হয়
- মাছ ও চিংড়ির উৎপাদন বেশী হয়।

চিত্র ঃ ২৮ আগাছা ও পাড় পরিস্কার

রাক্ষুসে ও অচাষযোগ্য মাছ দূরীকরণ

রাক্ষুসে মাছ

শোল, বোয়াল, চিতল, ফলি, কাকিলা, টাকি, গজার আইড় ইত্যাদি মাছকে রাক্ষুসে মাছ বলে। এরা চাষযোগ্য মাছ সরাসরি খেয়ে ফেলে, ফলে মাছের উৎপাদন কমে যায়।

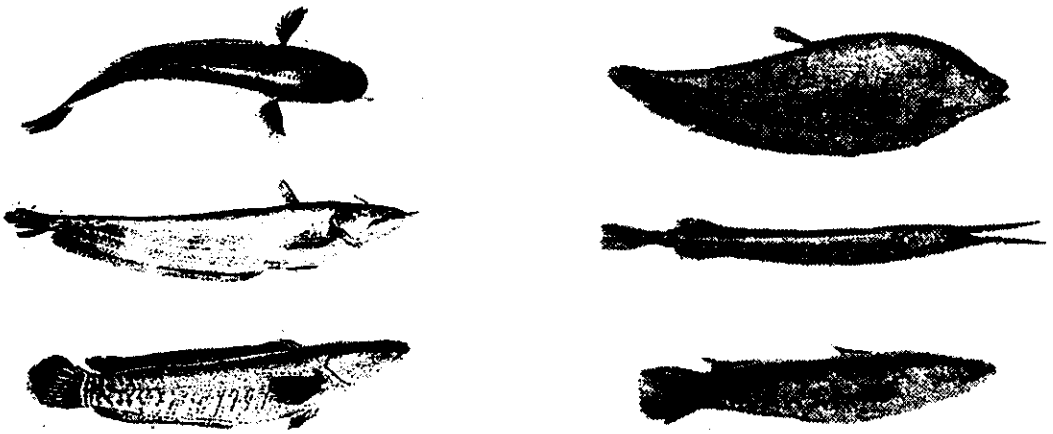

চিত্র ঃ ২৯ কতিপয় রাক্ষুসে মাছ

অচাষযোগ্য মাছ

মলা, ঢেলা, কই, চাপিলা, পুটি, চান্দা, ছোট চিংড়ি, বইচা ইত্যাদি রুই জাতীয় মাছের সাথে অচাষযোগ্য মাছ। এরা চাষযোগ্য মাছের জায়গা দখল করে এবং খাবার ও অক্সিজেন সব কিছুতেই ভাগ বসায় ফলে চাষকৃত মাছের উৎপাদন কমে যায়। ১ কেজি ছোট মাছ বড় হতে প্রায় ১০-১৪ কেজি বড় মাছের উৎপাদন কমায়।

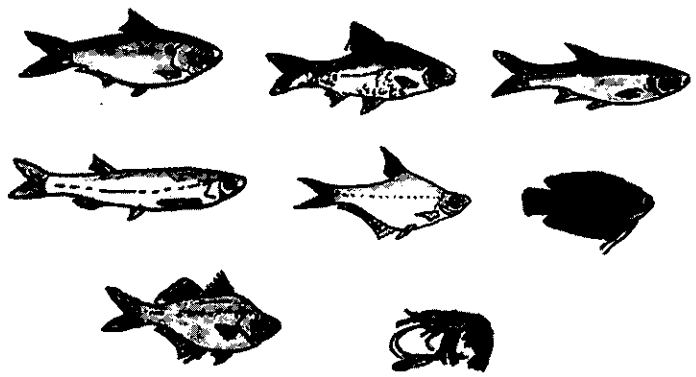

চিত্র ঃ ৩০ মিশ্র চাষের পুকুরে কতিপয় অচাষযোগ্য মাছ

রাক্ষুসে ও অচাষযোগ্য মাছ দূর করার উপায়

- পুকুর শুকিয়ে
- বার বার জাল টেনে
- ঔষধ প্রয়োগ করে।

পুকুর শুকানো

পুকুরের সমস্ত পানি সেচে ফেলে দিয়ে মাছ ধরতে হবে। তারপর কড়া রোদে পুকুর শুকাতে হবে যাতে তলায় ফাটল ধরে। বর্ষার পূর্বেই ফাল্গুন/ চৈত্র মাসে এ কাজটি করা সবচেয়ে ভাল।

বার বার জাল টানা

মাছ মারার ঔষধ না পাওয়া গেলে বা পুকুর শুকানোর খরচ বেশী পড়লে বা সম্ভব না হলে বার বার ঘন ফাঁসের জাল টেনে পুকুর থেকে রাক্ষুসে ও অচাষকৃত মাছ দূর করতে হবে। জালের ফাঁসের ভিতর দিয়ে বা নীচ দিয়ে যাতে এসব মাছ বেরিয়ে যেতে না পারে সে জন্য জালের নীচের অংশে ইটের টুকরা বা ভারী বস্তু বেঁধে আস্তে আস্তে জাল টানতে হবে। বার বার জাল টানার পরও রাক্ষুসে এবং বাজে মাছ থেকে যেতে পারে । এরা পরে পুকুরে বংশ বিস্তার করে আবার সংখ্যায় বেড়ে উঠতে পারে।

রোটেনন পাউডার প্রয়োগ

কম গভীরতা ও প্রখর সূর্যের আলোতে রোটেনন প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায় । প্রতি শতাংশ পানির ৩০ সেঃমিঃ (১ ফুট) গভীরতার জন্য ২৫-৩০ গ্রাম রোটেনন এর ৩ ভাগের ২ ভাগ পানিতে গুলে এবং বাকী ১ ভাগ কাই করে ছোট ছোট বল করে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। ১৫-২০ মিনিট পর যখন মাছ পানির উপর ভাসতে বা দৌড়াদৌড়ি শুরু করবে তখন জাল টেনে মাছ ধরে ফেলতে হবে। রোটেনন প্রয়োগে মারা মাছ খাওয়া যায় । পানিতে রোটেনন বিষক্রিয়ার মেয়াদকাল ৭ দিন পর্যন্ত থাকে।

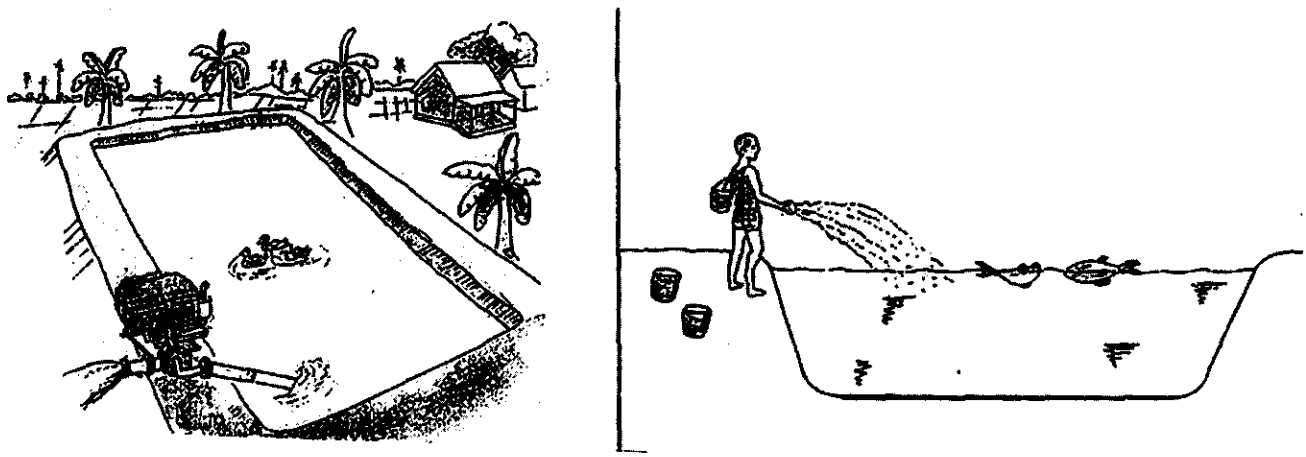

চিত্র ঃ ৩১ পুকুর শুকানো ও ঔষধ প্রয়োগের মাধ্যমে রাক্ষুসে ও অচাষযোগ্য মাছ দূর করা

মহুয়ার খৈল প্রয়োগ

প্রতি শতাংশ পানিতে ৩০ সেঃমিঃ (১ ফুট) গভীরতার জন্য ৩ কেজি মহুয়ার খৈল পানিতে গুলে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। প্রয়োগের ১-২ ঘন্টা পর জাল টেনে পানি ,ওলট-পালট করে দিতে হবে যাতে মহুয়ার খৈল সমস্ত পুকুরে ভাল করে মিশে। তারপর মাছ ভাসতে শুরু করলে জাল টেনে মাছ ধরতে হবে। মহুয়ার খৈল প্রয়োগ করলে কোন কোন সময় বিষক্রিয়া ১০-১২ দিন পর্যন্ত থাকে। মহুয়া খৈল প্রয়োগ করলে সার দেয়ার দরকার হয় না।

চুন প্রয়োগ

পুকুর শুকানো অথবা বিষ প্রয়োগের ১-২ দিন পর চুন প্রয়োগ করতে হবে। পুকুরের জন্য পাথুরে চুনই সবচেয়ে ভাল। পুকুর শুকানো হলে তলার মাটি নাড়িয়ে চুন প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

ব্যবহার মাত্রা

সাধারণভাবে প্রতি শতাংশে ১কেজি। তবে লালমাটির জন্য পরিমাণ শতাংশে ২ কেজি হতে পারে।

প্রয়োগ পদ্ধতি

পুকুরের পাড়ে গর্ত করে অথবা অন্য কোন মাটির পাত্রে বা ড্রামের মধ্যে পানিতে চুন ভেজাতে হবে। কিছুক্ষণ পর চুন ফুটে ঠান্ডা হলে পানি মিশ্রিত চুন সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে।

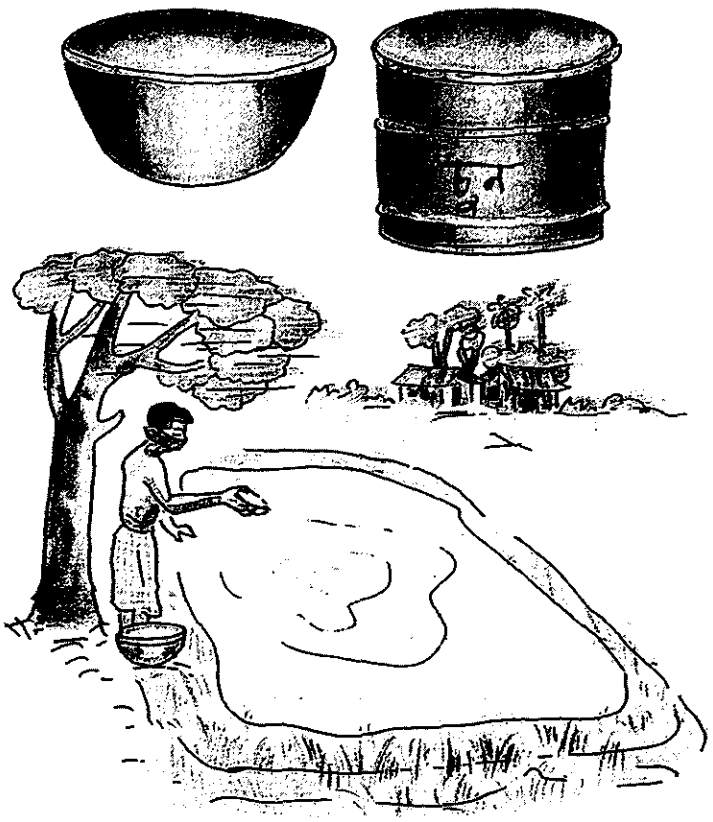

চিত্র ঃ ৩২ পুকুরে চুন প্রয়োগ

চুনের উপকারিতা

- পুকুরের প্রাকৃতিক খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করে
- পানির গুণাগুণ বৃদ্ধি পায়
- সারের কার্যকারিতা বাড়ায়
- রোগ জীবানু ধবংস করে
- বিষাক্ত গ্যাস বিনষ্ট করে
- মাটি বা পানীয় অম্লতা দূর করে
- পানির ঘোলাত্ব দূর করে
- পরিবেশের উন্নয়ন ঘটায় যায়
- কম্পোষ্টে ব্যবহৃত জৈব পদার্থের পচন ত্বরান্বিত করে।

সতর্কতা

- চুন কখনো প্লাষ্টিকের বালতিতে ভিজাবেন না
- বাতাসের অনুকূলে চুন ছিটান
- চুন ছিটানোর সময় নাক-মুখ গামছা দিয়ে বেধে রাখুন
- চোখে চুন লাগলে বার বার পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন
- বাঁশ বা লাঠি দিয়ে চুন নাড়বেন
- ঠান্ডা হলে চুন ছিটাবেন।

পোনার খোঁজ নেয়া

বিভিন্ন জাতের পোনা সঠিক সময়ে পাওয়ার জন্য এবং পোনা ছাড়ার আগে সার প্রয়োগের সময় ঠিক করার জন্য পোনা প্রাপ্তির উৎস সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে হবে। ব্যক্তিগত ভাবে পোনা উৎপাদনকারীদের সাথে অথবা সংশ্লিষ্ট মৎস্য বিভাগীয় কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করে পোনা প্রাপ্তির উৎস জেনে নিতে হবে এবং সে মোতাবেক সঠিক সময়ে পোনা সংগ্রহের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। উন্নত মানের পোনা সংগ্রহের বিষয়টি এ ব্যাপারে প্রধান বিবেচ্য বিষয় হওয়া উচিত।

সার প্রয়োগ

সার মাছের খাবার নয়। সার পানিতে মিশে মাছের প্রাকৃতিক খাবার তৈরী করে। চুন প্রয়োগের এক সপ্তহ পর সার প্রয়োগ করতে হবে। রৌদ্দজ্জল দিনে সার প্রয়োগ করতে হয়। পোনা ছাড়ার ৭ দিন আগে এই সার দিতে হবে। ফলে পোনা মজুদেরসময় পুকুরে প্রচুর প্রাকৃতিক খাদ্য জন্মাবে।

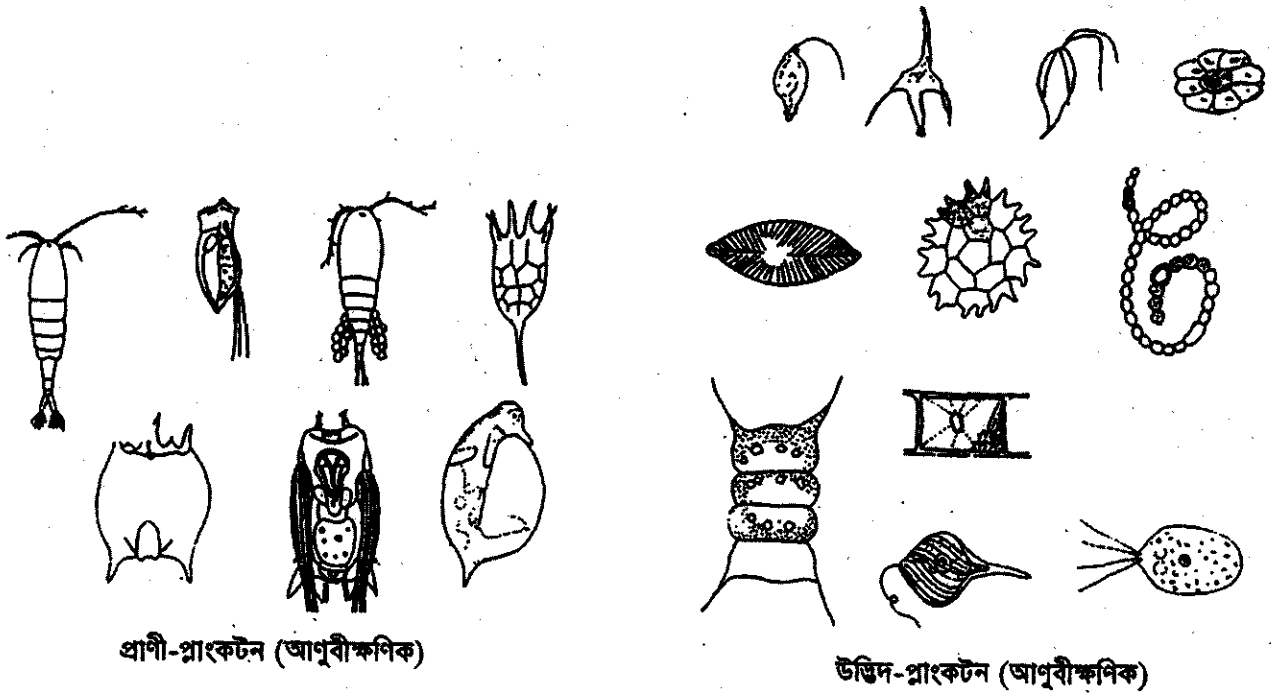

চিত্র ঃ ৩৩ সার ব্যবহারে পুকুরে প্রাকৃতিক (প্লাংকটন) খাদ্য জন্মায়

সারের পরিমাণ ও ব্যবহার পদ্ধতি

পুকুরে জৈব এবং রাসায়নিক দু' ধরণের সারই ব্যবহার করতে হবে।

জৈব সার

পুকুরে শতাংশ প্রতি ৫-৭ কেজি গোবর অথবা ৩-৫ কেজি হাঁস মুরগির বিষ্ঠা প্রয়োগ করতে হবে।

রাসায়নিক সার

পুকুরে শতাংশ প্রতি ১০০-১৫০ গ্রাম ইউরিয়া, ৫০-৭৫ গ্রাম টি.এস.পি. সার প্রয়োগ করতে হবে।

সার ব্যবহারের পদ্ধতি

জৈব এবং রাসায়নিক এ দু'ধরনের সার একত্রে একটি পাত্রে যথেষ্ট পরিমাণ পানির মধ্যে গুলে নিতে হবে তারপর গুলানো সার সমস্ত পুকুরে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে।

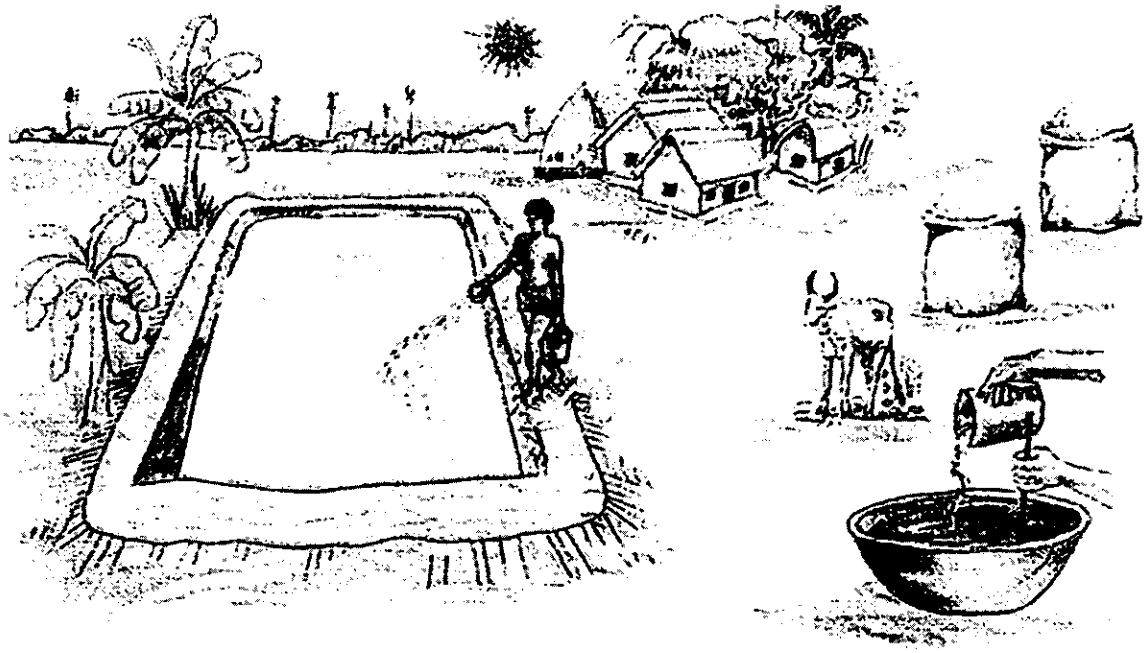

চিত্র ঃ ৩৪ সার ব্যবহারের পদ্ধতি

প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা

পুকুরে পোনা মজুদেরপুর্বে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা দরকার। এ কাজটি কয়েকটি পদ্ধতিতে করা যায়, যেমন-

হাত দিয়ে পরীক্ষা

পুকুরের পানিতে দিনের বেলায় সূর্যের আলোতে হাত কনুই পর্যন্ত ডুবিয়ে যদি হাতের তালু দেখতে পাওয়া না যায় তাহলে বুঝতে হবে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাবার আছে । আর যদি হাতের তালু দেখা যায় তাহলে বুঝতে হবে প্রয়োজনীয় খাবার নেই।

সেক্কী ডিস্ক দিয়ে পরীক্ষা

সেক্কী ডিস্ক হচ্ছে টিনের বা লোহার একটি সাদা কালো রংয়ের গোলাকার চাকতি যার ব্যাস ২০ সেঃমিঃ। চাকতিটি সুতা দিয়ে ঝুলানো থাকে। হাত দিয়ে সুতা ধরে সেক্কী ডিস্ক পানিতে ডুবানোর পর যে গভীরতা পর্যন্ত চাকতিটি দেখা দেখা যায় তদানুসারে উর্বরতা নির্ণয় করা যায়। যদি ২৫-৩৫ সেঃমিঃ গভীরতায় দেখা না যায় তবে বুঝতে হবে ভাল খাবার আছে। ৩৫ সেঃমিঃ এর বেশী গভীরতায় সেক্কী ডিস্ক দেখা গেলে বুঝতে হবে খাবার অত্যন্ত কম। তখন আরো সার দিতে হবে। সূর্যের আলোকিত দিনের বেলা ১১-১ টার মধ্যে সেক্কী ডিস্ক বা হাত দিয়ে খাবার পরীক্ষা করুন। কখনো ঘোলা পানিতে পরীক্ষা করবেন না।

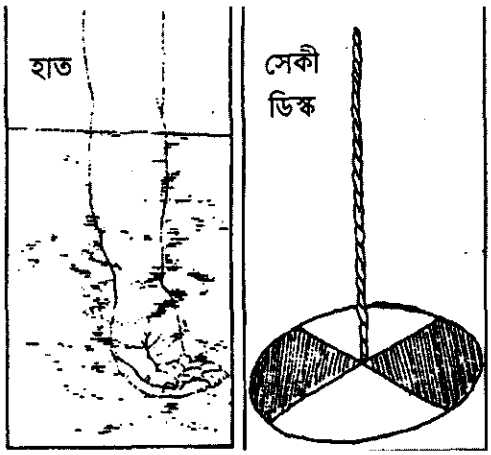

চিত্র ঃ ৩৫ প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা

স্বচ্ছ কাঁচের গ্লাস দ্বারা

একটি স্বচ্ছ কাঁচের গ্লাসে পুকুরের পানি নিয়ে তা আলোর দিকে ধরলে পানির রং সবুজ অথবা বাদামী দেখা যাবে। তাছাড়া গ্লাসের পানিতে অসংখ্য ছোট ছোট পোকার মতো দেখা যায়, এ কণাগুলো প্রাণিকণা। এ প্রাণিকণা মাছ ও চিংড়ির প্রকৃতিক খাদ্য।

চিত্র ঃ ৩৬ স্বচ্ছ কাচের গ্লাস দ্বারা প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা

পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা

যে পুকুরে ঔষধ প্রয়োগ করে মাছ মারা হয়েছে, মাছ এবং চিংড়ির পোনা মজুদের একদিন আগে সে পুকুরের পানির বিষক্রিয়া অবশ্যই দেখে নিতে হবে। বিষক্রিয়া পরীক্ষার আগে পুকুরে একবার জাল টেনে পানি ওলট পালট করে দিয়ে সে পানিতে পরীক্ষা করলে ভাল হয়।

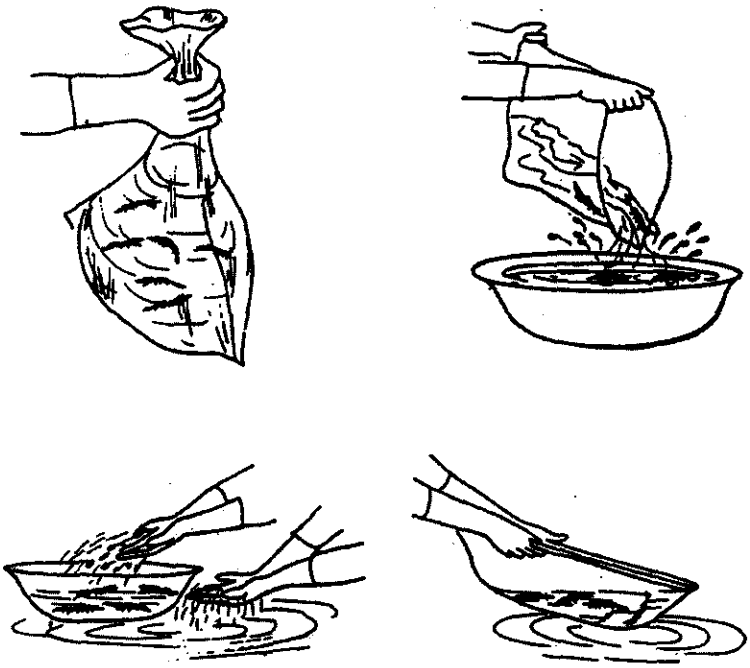

চিত্র ঃ ৩৮ চিংড়ির পোনা শোধন

পোনা পরিবহণ

পাতিল ড্রাম কিংবা অক্সিজেন ব্যাগে পোনা পরিবহণ করা যায়।

প্রকৃতি	প্রজাতি	আকার	পরিমাণ	সময়
পাতিল/ ড্রাম	রুইজাতীয়	১০-১২সেঃমিঃ	১৫-২০টি প্রতি লিটার পানিতে	৪-৬ ঘন্টা
অক্সিজেন ব্যাগ	রুইজাতীয়	১০-১২ সেঃমিঃ	২৫-৩০টি প্রতি লিটার পানিতে	৪-৬ ঘন্টা
ঐ	চিংড়ি	পিএল ১৫	২৫০-৩০০টি প্রতি লিটার পানিতে	১২ ঘন্টা
ঐ	চিংড়ি	পিএল ১৫	৪০০-৫০০ টি প্রতি লিটার পানিতে	৫ ঘন্টা
ঐ	চিংড়ি	জুভেনাইল	১০০-১৫০ টি প্রতি লিটার পানিতে	৬ ঘন্টা

পরামর্শ

- পোনার পেট খালি করতে কমপক্ষে ৫-৬ ঘন্টা আগে থেকে খাবার প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে।
- পোনা সঠিক ঘনত্বে পরিবহণ করা প্রয়োজন।
- সকালে অথবা বিকালে ঠান্ডা পরিবেশে পোনা পরিবহণ করা ভাল।
- যাত্রাপথে পাতিল / ড্রামের পানি পরিবর্তন ও মাঝে মাঝে নাড়াচাড়া করা দরকার।
- যাত্রাপথে ছায়াযুক্ত জায়গায় পোনা রাখতে হবে।
- একটি ব্যাগে/ পাত্রে একই আকারের ও প্রজাতির পোনা দিতে হবে।

পোনা টেকসই ও পুকুরে ছাড়া

- পোনা বহনকারী পাত্র বা ব্যাগটি পুকুরের পানিতে ২০-২৫ মিনিট ভাসিয়ে রাখুন।
- তারপর পাতিল বা ব্যাগের মুখ খুলে হাত দিয়ে পুকুরের পানি আস্তে আস্তে পাতিল বা ব্যাগের পানির সাথে মিশাতে হবে। পাতিল বা ব্যাগ পানি ভর্তি হয়ে গেলে কিছু পানি কমিয়ে পুনরায় পুকুরের পানি মিশাতে হবে।

পোনা নির্বাচন

এ ধরণের মিশ্রচাষের পুকুরে মৃগেল, কমন/মিরর কার্প , কালবাউশ এসব তলায় বসবাসকারী মাছ মজুদ করা যাবে না । রুই মাছের সংখ্যাও কমিয়ে দিতে হবে। বাস্তবে চাষীদের পুকুরে রুই মাছ সহ এবং রুইমাছ ব্যতীত চিংড়ির সাথে কার্পের মিশ্র চাষে প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয় ক্ষেত্রে চিংড়ির ভাল ফলন লক্ষ্য করা গেছে। তাছাড়া গ্রাস কার্পের সাথে এবং গ্রাস কার্প ছাড়া মিশ্র চাষেও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে চিংড়ির ফলন ভাল হয়।

ভাল ও খারাপ পোনা সনাক্তকরণ

গলদার পোনা

দেখার বিষয়	ভাল	খারাপ
দেহের রং	লালচে বাদামী /ছাই	লালচে/কমলা
খোলস	পরিষ্কার, প্রতিটি খন্ডাংশে আড়াআড়ি দাগ	নোংরা, দাগগুলো অল্প
গোলাকার পাত্রে স্রোত সৃষ্টি করলে	স্রোতের বিপরীতে সাতার কাটে	পাত্রের মাঝখানে জমা হয়।

কার্পের পোনা

দেখার বিষয়	ভাল পিএল	খারাপ পিএল
বিজল/ পিচ্ছিল ভাব	বেশী	খসখসে
দেহের রং	ঝকঝকে ,উজ্জ্বল	ঘোলা ,ফ্যাকাসে
বিভিন্ন দাগ	ফুলকা /দেহে দাগ নেই	লাল, কালো দাগ
গোলাকার পাত্রে স্রোত সৃষ্টি করলে	চঞ্চল, স্রোতের বিপরীতে এ সাঁতার কাটে	ধীর স্থির, পাত্রের মাঝখানে জমা হয়।

পোনা শোধন

পোনা ছাড়ার আগে পোনা শোধন করে নিলে পোনা সুস্থ থাকবে এবং রোগ বালাই এর সম্ভাবনা কমে যাবে।

- *একটি বালতিতে ১০ লিটার পানি নিয়ে এর মধ্যে ২০০ গ্রাম খাবার লবণ অথবা ১ চা চামচ ডাক্তারী পটাশ মিশান*
- বালতির উপর একটি ঘন জাল রেখে তার মধ্যে প্রতিবার ২০০-৩০০টি কার্পের পোনা ছাড়ুন
- জাল ধরে পোনাগুলোকে বালতির পানিতে আধা মিনিট গোসল করান।
- এভাবে একবার তৈরী করা লবণ/ পটাশের পানিতে ৫-৭ বার শোধন করা যাবে
- চিংড়ির পিএল দশলক্ষ ভাগের ১ ভাগ ক্লোরিন পাউডার দ্বারা তৈরী দ্রবণে ১০-১৫ সেকেন্ড রেখে ছাড়তে হবে।

- পাত্র বা ব্যাগের পানির তাপমাত্রা পুকুরের পানির তাপমাত্রার সমান হলে ব্যাগ বা পাত্রটি কাত করে আস্তে আস্তে ব্যাগ বা পাত্রের দিকে ঢেউ দিলে পোনা ধীরে ধীরে পুকুরে চলে যাবে।
- পুকুরের যে জায়গায় চিংড়ির আশ্রয়স্থল আছে তার কাছে চিংড়ির পোনা ছাড়তে হবে। এতে দ্রুত আশ্রয়স্থল খুঁজে পাবে।

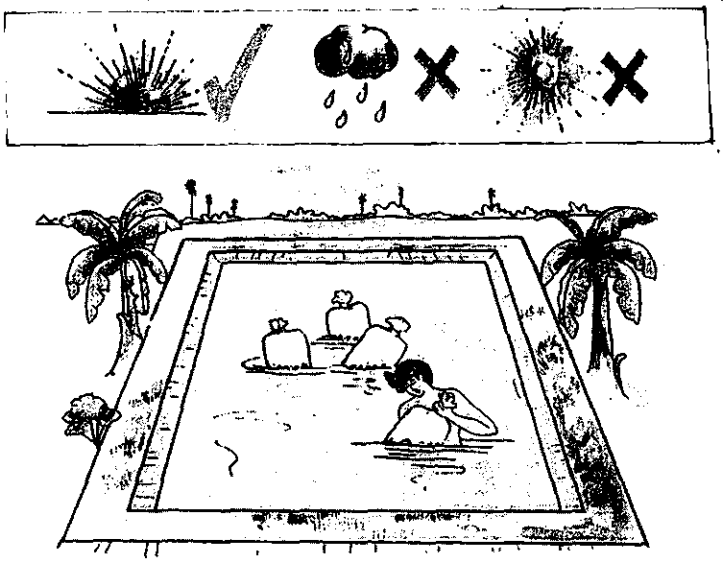

চিত্র ঃ ৩৯ পোনা ছাড়ার পদ্ধতি

সাবধানতা

- দুপুরে প্রখর রৌদ্রে বা প্রবল বৃষ্টিতে পোনা ছাড়া উচিৎ নয়।
- পাতিল বা ব্যাগের পানির তাপমাত্রা সমতা না আসা পর্যন্ত পোনা ছাড়া ঠিক হবে না।

পোনা মজুদ পরিমাণ নির্ধারণ

পুকুরে পোনা মজুদেরপরিমাণ ও হার নির্ভর করে ঐ পুকুরের বাস্তব উৎপাদিকা শক্তির এবং ব্যবস্থাপনার উপর। কার্প চিংড়ি মিশ্রচাষে বিষয়টি দু'ভাগে বিবেচনা করা যেতে পারে।

১) কার্প চাষকে প্রাধান্য দিয়ে চিংড়ি প্রজাতিসহ
২) চিংড়ির চাষকে প্রাধান্য দিয়ে কার্পের প্রজাতিসহ

কার্প - চিংড়ির মিশ্র চাষের জন্য পোনার মজুদেরসম্ভাব্য হার নীচে দেখানো হলো

পোনার সংখ্যা প্রতি বিঘায় (৩৩ শতাংশ বা ০.১২ হেঃ)		
প্রজাতি	কার্প প্রধান চাষ	চিংড়ি প্রধান চাষ
সিলভার কার্প	২৫০-২৭৫	১৫০-২০০
কাতলা	১২৫-১৫০	৭৫-১০০
রুই	২২৫-২৫০	-
গ্রাস কার্প	৫-৭	-
গলদা চিংড়ি	১০০০-১৩০০	৩০০০-৬০০০

কার্পের পোনার আকার হবে ১০-১৫ সেঃমিঃ আর গলদা চিংড়ির পোনার আকার হবে ৪-৬ সেঃমিঃ।

মজুদপরবর্তী পাঁচটি কাজ

- নিয়মিত সার প্রয়োগ
- নিয়মিত সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ
- নমুনায়ন
- আংশিক মাছ ধরা ও পোনা পুনঃমজুদ
- মাছ ধরা ও বিক্রী করা

সার প্রয়োগ

পোনা ছাড়ার পর পুকুরের কার্প এবং চিংড়ির প্রাকৃতিক খাবারের যোগান অব্যাহত রাখার জন্য দৈনিক অথবা সাপ্তাহিক কিস্তিতে সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সার	শতাংশ প্রতি পরিমাণ /দৈনিক	শতাংশ প্রতি পরিমাণ/সাপ্তাহিক
গোবর	২০০-২৫০ গ্রাম	২ কেজি
অথবা হাঁস মুরগির বিষ্ঠা	১২৫-১৫০ গ্রাম	১কেজি
ইউরিয়া	৮-১০ গ্রাম	৬০ গ্রাম
টিএসপি	১০-১২ গ্রাম	৮০ গ্রাম

সারের মাত্রা পুকুরে কম বেশী হবে। সার ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক খাদ্যের প্রাচুর্য্যতা পরীক্ষা করে পরিমাণ এবং কিস্তি নির্ধারণ করা উচিৎ।

বিবেচ্য বিষয়

- ঘন সবুজ রং এর পানিতে সার দেয়া যাবে না
- ঘোলা পানিতে সার কম কার্যকর
- মেঘলা দিনে সার দেয়া যাবে না
- চুন প্রয়োগ করার অন্তত ৭ দিন পর সার প্রয়োগ বেশী কার্যকর

সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ

পুকুরে মাছ ও চিংড়ির প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি অতিরিক্ত কিছু খাবার দিলে উৎপাদন ভাল হয়। পুকুরের সিলভার কার্প ও কাতলা মাছ বাদ দিয়ে বাকী মাছের মোট ওজনের শতকরা ৩-৫ ভাগ হারে খাবার দিতে হবে। সহজ প্রাপ্য খাবার হিসাবে চালের বা গমের ভূষি ২০%, তৈলবীজের খৈল ৫০%, শামুকের মাংস বা ফিশমিল ৩০% ব্যবহার করা যায়। গ্রাস কার্পের জন্য ক্ষুদে পানা, কলাপাতা, নরম ঘাস একটি কাঠি বা বাঁশের ফ্রেমে দিলে ভাল হয়। ফ্রেমটি একটি বাঁশ পুঁতে আটকিয়ে দেয়া যায়।

খাদ্য বল তৈরী

সম্পূরক খাদ্য গ্রহণকারী মাছের মোট ওজনের উপর নির্ভর করে খাদ্যের উপাদানসমূহ নির্ধারণ করার পর খৈলের মোট ওজনের দ্বিগুণ ওজনের পানির মধ্যে খৈল ভিজিয়ে রেখে ১২ ঘন্টা পর পরিমাণ মত ভূষি / কুড়া এবং ফিশমিল / শামুকের মাংস মিশিয়ে কাই করে ছোট ছোট গোলাকার বল তৈরী করে অল্প কিছুক্ষণ রৌদ্রে শুকিয়ে পুকুরে প্রয়োগ করতে হবে।

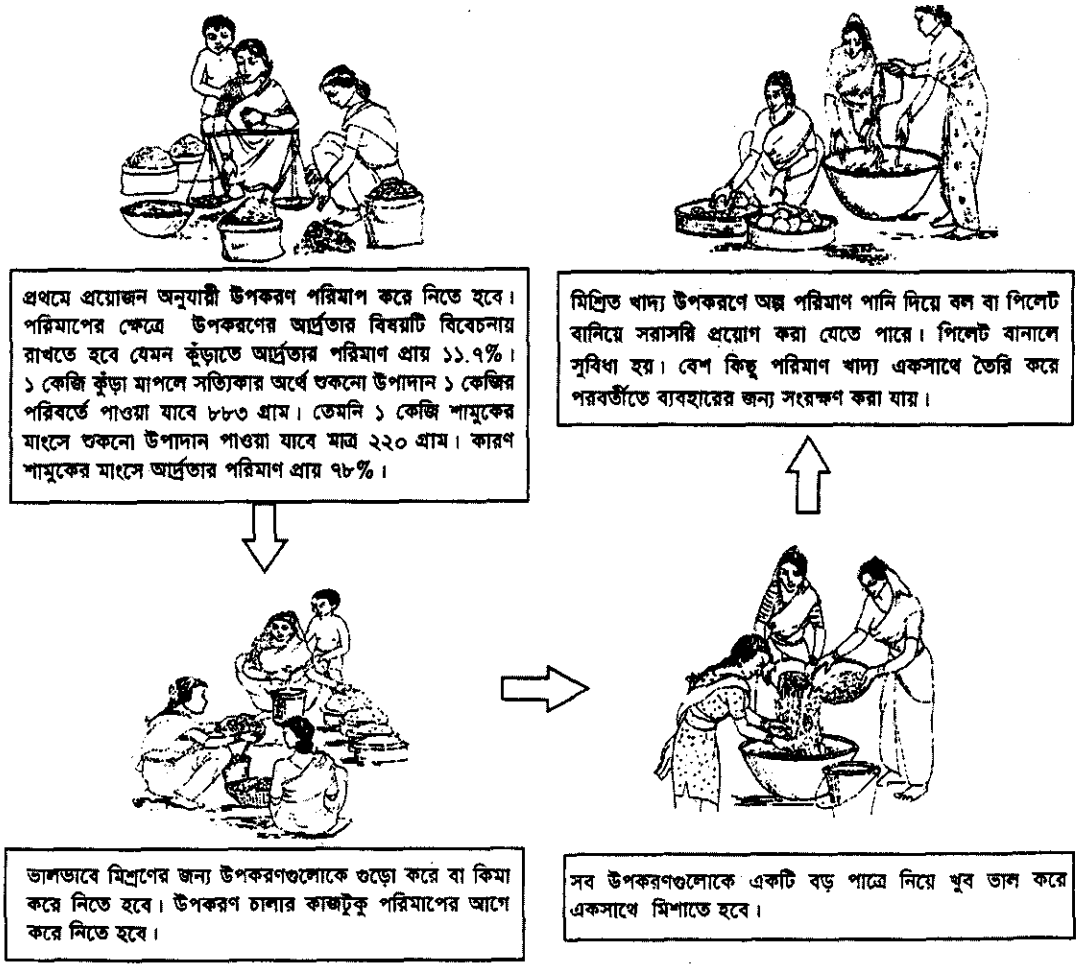

চিত্র ঃ ৪০ খাদ্য বল তৈরী

খাদ্য প্রয়োগ

অর্ধেক খাদ্য-বল সকালে ৯.০০ টায় এবং অর্ধেক খাদ্য-বল বিকালে (৪-৫টায়) পুকুরের নির্জন অর্থাৎ মানুষের উঠা-নামার জায়গা থেকে দূরে নির্দিষ্ট জায়গায় প্রতিদিন প্রয়োগ করতে হবে। তবে মাছ সে খাদ্য ঠিক মত খায় কিনা তা পরদিন ঐ জায়গা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। তবে মাছের ও পানির অবস্থা ভেদে খাদ্য প্রয়োগ বন্ধও রাখা হতে পারে।

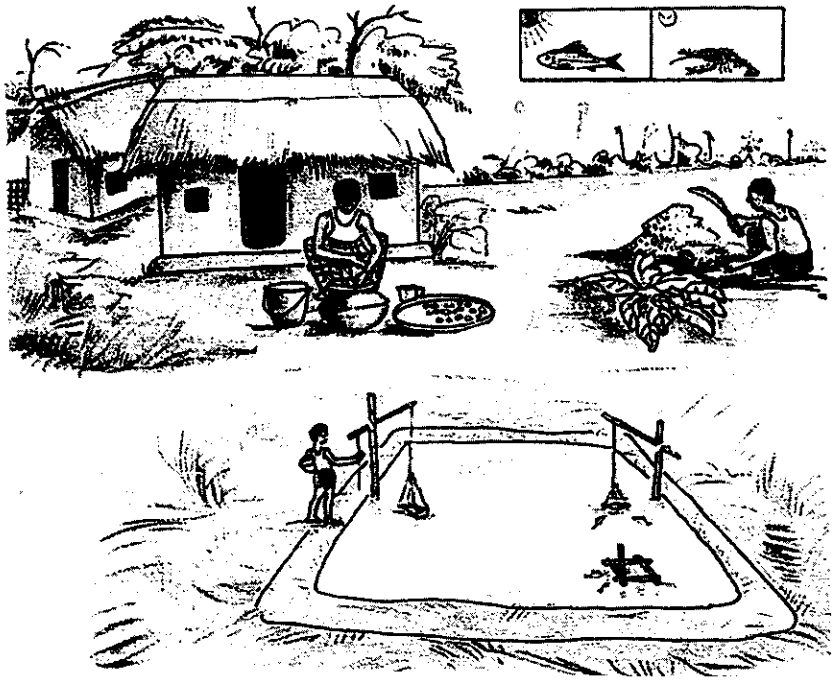

চিত্র ঃ ৪১ কার্প ও চিংড়ির খাদ্য প্রয়োগের পদ্ধতি

খাদ্য দানী

খাদ্য দানী (ট্রে) তে খাদ্য দিলে খাদ্যের অপচয় হয় না। ১ বর্গমিটার আকারের একটি বাঁশের /কাঠের ফ্রেমে মশারীর জাল লাগিয়ে খাদ্য দানী তৈরী করা যায়। পুকুরের তলদেশের ৩০-৪০ সেঃমিঃ উপরে বিঘাপ্রতি ২টি খাদ্যদানী স্থাপন করলেই চলে। খাদ্য পুকুরের এক জায়গায় না দিয়ে বেশ কয়েক জায়গায় দেয়া উচিৎ। এতে সব মাছই খাদ্য পাবে।

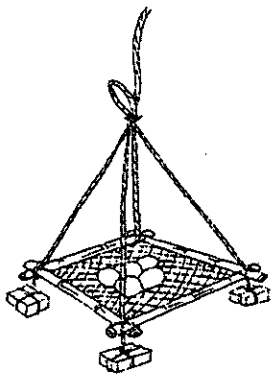

চিত্র ঃ ৪২ খাদ্য দানী

নমুনায়ন

মাসে একবার ঝাঁকি জাল দিয়ে পুকুরের মাছের নমুনা সংগ্রহ করে মাছের বৃদ্ধি ঠিকভাবে হচ্ছে কিনা, মাছের স্বাস্থ্য ঠিক আছে কিনা, রোগ-বালাই আছে কিনা এবং সর্বোপরি সম্পূরক খাদ্যের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে। নমুনা সংগ্রহকালে কমপক্ষে প্রত্যেক প্রজাতির ১০টি করে মাছ সংগ্রহ করে নমুনায়ন করা ভাল । নমুনা সংগ্রহ করার সময় ধৃতমাছ পুকুরের হাপা স্থাপন করে তাতে রেখে ছোট ফাঁসযুক্ত ব্যাগে মাছ ওজন করতে হবে। মাছ যেন আঘাত না পায় তা লক্ষ্য রাখতে হবে।

আংশিক মাছ ধরা ও পোনা পুনঃমজুদ

উৎপাদন ও লাভ বেশী পাওয়ার জন্য ৪-৬ মাস পর বিক্রীযোগ্য মাছ আংশিক আহরণ করা যেতে পারে। বিক্রিত মাছের সমসংখ্যক একই জাতের বড় আকারের (১২-১৫ সেঃ মিঃ) পোনা ঐ সময় ছাড়তে হবে।

বিবেচ্য বিষয়

চিংড়ির জন্য

- ৭০-৮০ গ্রাম (মাথাসহ) হলে চিংড়ি ধরতে হবে
- পুকুর থেকে নীল দাঁড়ার চিংড়ি ধরে ফেলতে হবে
- কমলা দাঁড়ার চিংড়ি পুকুরে রেখে দিন
- বড় চিংড়ি নিয়মিত ধরে ফেলুন
- শক্ত খোলসযুক্ত চিংড়ি ধরুন

কার্পের জন্য

- সিলভার কার্প, কাতলা, গ্রাস কার্প, রুই মজুদের ৫-৬ মাসের মধ্যেই কিছু মাছ বাজারজাত করণের উপযোগী আকারে পৌঁছায়।
- বাজারজাতকরণের উপযোগী সমস্ত মাছ ধরে ফেলুন।

মাছ ধরা ও বিক্রয় করা

পুকুরের মোট জীবভর প্রতি শতাংশে ৫-৬ কেজি হলে কিংবা মাছের দৈহিক ওজন আশানুরুপ পর্যায়ে পৌঁছে গেলেই মাছ ও চিংড়ির বিক্রির ব্যবস্থা নেয়া উচিৎ। রুই ,কাতলা , সিলভার কার্প , গ্রাস কার্প ৭৫০ গ্রামের উপর হলে এবং চিংড়ি ৭০ গ্রামের উপর হলেই বিক্রি করা যেতে পারে।

পরামর্শ

- মাছ ধরার পূর্বে বাজার দর বা চাহিদা যাচাই করুন
- মাছ ধরার পূর্বে পুনঃপোনা মজুদ করার জন্য পোনা প্রাপ্তি নিশ্চিত করুন
- বাজারে বা শহরে দ্রুত মাছ পরিবহণের ব্যবস্থা করুন
- খাওয়ার জন্য ঝাঁকি জাল , বিক্রির জন্য বেড় জাল / ঝাঁকি জাল এবং চুড়ান্ত ভাবে মাছ ধরার জন্য পুকুর শুকিয়ে মাছ ধরতে পারেন।

চিত্র ঃ ৪৩ ঝাঁকি জাল দিয়ে মাছ ধরা

চিত্র ঃ ৪৪ মিশ্র চাষের ফসল কার্প ও চিংড়ি

প্রতিদিন মাছ চাষীর করণীয়

ভোর বেলায়

- মাছ খাবি খাচ্ছে কিনা দেখা
- পুকুর পাড় দিয়ে পানি চুয়াচ্ছে বা পানি ভিতরে ঢুকছে কিনা
- গ্রাস কার্পের খাবার আছে কি না

সকাল বেলায়

- সম্পূরক খাবার প্রয়োগ করা
- পানির রং দেখা
- সেক্কী ডিস্ক, হাত বা স্বচ্ছ গ্লাস দিয়ে পানিতে প্রাকৃতিক খাবার আছে কিনা পরীক্ষা করা
- প্রয়োজনে সার প্রয়োগ করা

বিকাল বেলায়

- দ্বিতীয় বার সম্পূরক খাবার প্রয়োগ

রাত্রি বেলায়

- পাহারার ব্যবস্থা করা
- হিসাবপত্র ঠিক করা

রোগ বালাই

রোগ প্রতিকারের চেয়ে রোগ প্রতিরোধই উত্তম। প্রথমে জানতে হবে কিকি কারণে মাছের রোগ হয় এবং আমরা যদি ঐ সকল কারণগুলো সফলভাবে সমাধান করতে পারি তবে আশা করা যায় মাছ রোগাক্রান্ত হবে না। রোগ প্রতিরোধের জন্য শীত আসার পূর্বে শতাংশ প্রতি ২৫০-৫০০ গ্রাম হারে চুন দিলে রোগ হবার সম্ভাবনা কমে যায়। এ ছাড়া ১০ লক্ষ ভাগের ১ ভাগ ব্লিচিং পাউডার (৬০%) মাসে একবার প্রয়োগ করলে রোগ হবার সম্ভাবনা থাকে না।

প্রতিকার

- পুকুরে চিংড়ির ঘনত্ব কমিয়ে দিতে হবে
- পানি বদল করতে হবে
- প্রতি শতাংশে আধা কেজি হারে চুন প্রয়োগ করতে হবে

মাছ চাষে কিছু সমস্যা ও প্রতিকার

সমস্যা	কারণ	প্রতিক্রিয়া	প্রতিকার
খাবি খাওয়া/হা করে পানির উপর ভাসে	তলায় কাঁদা, বিষাক্ত গ্যাস, পঁচা পাতা, হিসাবের বেশী মাছ থাকা, আকাশে মেঘ	মাছ মারা যায়	সাঁতার কাটা, বাঁশ দিয়ে পানি পিটানো , সম্ভব হলে পানি বদল করা, বড় পাতিল ঝাকানি দিয়ে ঢেউ তুলা, পানি ছিটানো।
ঘোলা পানি	বৃষ্টির পানি ধুয়ে পুকুরে ঢোকে,পাড়ে ঘাস না থাকা, গরু গোসল করানো,	খাদ্য জন্মায় না, সূর্য্যের আলো ঢুকতে পারে না,	শতাংশ প্রতি ২৫০ গ্রাম চুন, ছোট আকারে খড়ের মোচা ৪/৫ জায়গায় পানিতে স্থাপন করা।
পানির উপরের স্তর ঘন সবুজ হওয়া	ইউগ্লিনা নামক শেওলা	খাবি খায়, শ্বাস কষ্ট,	সার দেওয়া বন্ধ করতে হবে। সিলভার কার্প মজুদ এবং সম্ভব হলে পানি বদল করতে হবে।
পানির উপরে লাল স্তর	অতিরিক্ত লোহার কারণে লাল শেওলা,	সূর্য্যের আলো ঢুকে না খাদ্য সৃষ্টি হয়না।	প্রতি সপ্তাহে কলা পাতার/ খড়ের দড়ি দিয়ে তুলে ফেলা।
সাপ, উদ্, কাকঁড়া	পাড়ের আগাছা	মাছকে খেয়ে ফেলে	বাঁশের ফাঁদ,চুন ভর্তি ডিমের খোলস উদের পথের মধ্যে রাখা
বুদবুদ উঠা	তলায় কাদা বেশী হলে, পাতা পঁচা, কোন কিছু পঁচলে বিষাক্ত গ্যাস তৈরী হয়।	মাছ মারা যায়।	পুকুরে ঘনঘন হররা টানা, হররা হল মাটির কাটি যাহা দড়িতে মালার মত করে তৈরী হয় । ইট দিয়ে ও হররা তৈরী করা যায়। সম্ভব হলে পানি পরিবর্তন করতে হবে।

সম্ভাব্য উৎপাদন, আয় ও ব্যয়

এক হেক্টর আয়তনের পুকুরে কার্প ও গলদা চিংড়ির মিশ্র চাষের জন্য বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব

ক্রমিক নং	ব্যয়ের বিবরণ	পরিমাণ	মূল্য
১	পুকুর শুকানো/মাছ মারার ঔষধ প্রয়োগ	গুচ্ছ	৫,০০০/-
২	পাথুরে চুন	৫০০ কেজি	৪,০০০/-
৩	জৈব সার	১৫,০০০ কেজি	১৫,০০০/-
৪	ইউরিয়া	৫০০ কেজি	৩,০০০/-
৫	টিএসপি	২৫০ কেজি	৩,০০০/-
৬	এমপি	১০০ কেজি	৬০০/-
৭	সম্পুরক খাদ্য	৩,০০০ কেজি	৩০,০০০/-
৮	মাছের পোনা (১০-১২ সেঃমিঃ)	১০,০০০টি	১০,০০০/-
৯	চিংড়ির পোনা	১০,০০০টি	১০,০০০/-
১০	মাছ চাষের যন্ত্রপাতি	গুচ্ছ	২,০০০/-
১১	ঔষদ/রাসায়নিক	গুচ্ছ	২,০০০/-
১২	মাছ আহরণ ও বাজার জাত করণ	গুচ্ছ	৪,০০০/-
১৩	বিবিধ	গুচ্ছ	১,৪০০/-
		মোট =	৯০,০০০/-

* পুকুর ভাড়া এবং ব্যাংক ঋণ নিয়ে মাছ চাষ করলে আরও ২৯,০০০/- টাকা বেশী ব্যয় হবে।

উৎপাদন ও আয়

ক) কার্প প্রধান চাষ

উৎপাদন ঃ কার্প- ৩,৫০০ কেজি মাছ।
চিংড়ি- ৩০০ কেজি।

আয় ঃ প্রতি কেজি ৪০/- টাকা হিসেবে ৩,৫০০ কেজির মূল্য = ১,৪০,০০০/- টাকা।
চিংড়ি ৩০০ কেজি ২০০/- টাকা হিসেবে ৪০০ কেজির মূল্য = ৬০,০০০/- টাকা।

মোট = ২,০০,০০০ টাকা।

মুনাফা ঃ ২,০০,০০০/- - ৯০,০০০/- = ১,১০,০০০/- টাকা।

খ) গলদা চিংড়ি প্রধান চাষ

উৎপাদন - কার্প ৩০০০ কেজি
- চিংড়ি ৫০০ কেজি

আয় ঃ প্রতি কেজি ৪০/- টাকা হিসেবে ৩,০০০ কেজির মূল্য = ১,২০,০০০/- টাকা।
চিংড়ি প্রতি কেজি ২০০/- টাকা হিসেবে ৫০০ কেজির মূল্য = ১,০০,০০০/- টাকা।

মোট = ২,২০,০০০ টাকা।

মুনাফা ঃ ২,২০,০০০/- - ৯০,০০০/- = ১,৩০,০০০/- টাকা।

পাংগাস মাছের চাষ

পাংগাস মাছ অতি তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ছোট-বড় সব ধরণের জলাশয়ে এ মাছ চাষ করা যায়। বাজারে এর চাহিদা আছে। এ মাছের পোনা দেশের সর্বত্র পাওয়া যায়। তাই পাংগাস মাছ চাষের দ্রুত প্রসার ঘটছে।

চিত্র ঃ ৪৫ পাংগাস মাছ

পুকুর প্রস্তুতি

আগাছা পরিষ্কার ঃ জলজ আগাছা তুলে ফেলতে হবে। পুকুর পাড়ে ঝোপ-ঝাড় থাকলে তা পরিষ্কার করতে হবে। বড় গাছের ডাল-পালা কেটে ছোট করে ফেলতে হবে।

চিত্র ঃ ৪৬ পাড়ে অবস্থিত বড় গাছের ডাল পালা ছেটে দিতে হবে

অচাষযোগ্য মাছ দমন ঃ পুকুর সম্পূর্ণরূপে সেচের মাধ্যমে পানি অপসারণ করতে হবে। পুকুর শুকানো সম্ভব না হলে শতাংশ প্রতি ৩০ সেঃ মিঃ গভীরতায় জন্য ২৫-৩০ গ্রাম রোটেনন পাউডার পানিতে গুলে পুকুরে ছিটিয়ে দিলে চাষ পুর্ব সকল মাছ মারা যাবে।

চুন প্রয়োগ ঃ সাধারণতঃ শতাংশ প্রতি ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করতে হবে। চুন পানিতে গুলে সমানভাবে সারা পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে।

সার প্রয়োগ ঃ পুকুর অনুর্বর হলে চুন দেয়ার ৭ দিন পর শতাংশে ৫-৭ কেজি গোবর অথবা ৩-৪ কেজি হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা ১০০-১৫০ গ্রাম ইউরিয়া, ৫০-৭৫ গ্রাম টি.এস.পি এবং ২০ গ্রাম এম.পি সার প্রয়োগ করতে হবে। পুকুর প্রস্তুতির বিস্তারিত বিবরণ কার্প ও গলদা চিংড়ি চাষের অধ্যায়ে দেয়া আছে।

পোনা মজুদ

এককভাবে সার ও খাদ্য ব্যবহার করে পাঙ্গাস চাষ করলে শতাংশ প্রতি ৬০-৭০ টি পোনা মজুদ করা উত্তম। পোনা ১০-১৫ সেঃ মিঃ আকারের হলে ভাল উৎপাদন পাওয়া যাবে।

সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ

পাঙ্গাস মাছের সম্পূরক খাদ্যে ২০% ফিশ মিল, ৪৫% তৈলবীজের খৈল এবং ৩৫% চালের কুঁড়া বা গমের ভুষি এবং প্রতি ১০০ কেজি খাবারে জন্য ২৫০ গ্রাম ভিটামিন মিশ্রণ একত্রে মিশিয়ে মেশিনের সাহায্যে দানাদার খাদ্য তৈরী করতে হয়। এ খাদ্য রৌদ্রে কিছুক্ষণ শুকিয়ে পুকুরে প্রয়োগ করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়।

খাদ্য প্রয়োগমাত্রা

পুকুরে মজুদ মাছের মোট ওজনের শতকরা ৫-১০ ভাগ হারে দৈনিক খাদ্য সরবরাহ করতে হয়। এ খাদ্য দিনে দু বার পানিতে ডুবন্ত পাত্রে সরবরাহ করা উচিত। পুকুরের মধ্যে বেশ কয়েকটি জায়গায় মোট খাদ্য ভাগ করে দিলে সব মাছ ঐ খাদ্য খাবার সুযোগ পায়। তৈরী পিলেট খাবার পানিতে ভাসে, তাই এ ধরণের খাদ্য পুকুরে ছিটিয়ে দেয়া যায়।

চিত্র ঃ ৪৭ পুকুরে সম্পুরক খাদ্য প্রয়োগ

পুকুরের তলদেশ পরিচর্যা

পুকুরের তলদেশে ক্ষতিকর গ্যাস হররা টেনে বের করে দিতে হবে। এ কাজটি সপ্তাহে এক বা দু বার করা দরকার।

স্বাস্থ্য ও বৃদ্ধি পরীক্ষা

মাসে অন্তত একবার জাল টেনে মাছ ধরে স্বাস্থ্য ও বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করতে হয়। এসময় মাছের মজুদ নির্ণয় করে খাদ্য প্রয়োগের মাত্রা নির্ধারণ করতে হয়।

মাছ আহরণ

পুকুরে পাঙ্গাস মাছ বছরে গড়ে প্রায় ১ কেজি হয়ে থাকে। তবে ৭০০-৮০০ গ্রাম হলেই বাজারজাত শুরু করা ভাল। ফলে অপেক্ষাকৃত ছোট মাছ বড় হবার সুযোগ পাবে এবং বছর শেষে চুড়ান্তভাবে আহরণ করা সম্ভব হবে।

সম্ভাব্য উৎপাদন, আয় ও ব্যয়

এক হেক্টর আয়তনের পুকুরে পাংগাস মাছ চাষের জন্য বাৎসরিক আয় ব্যয়ের হিসাব

ক্রমিক নং	ব্যয়ের বিবরণ	পরিমাণ	মূল্য
১	পুকুর শুকানো/মাছ মারার ঔষধ প্রয়োগ	গুচ্ছ	৫,০০০/-
২	পাথুরে চুন	২৫০ কেজি	২,০০০/-
৩	জৈব সার	২,০০০ কেজি	২,০০০/-
৪	ইউরিয়া	২৫০ কেজি	১,৫০০/-
৫	টিএসপি	১২৫ কেজি	১,৫০০/-
৬	এমপি	২০ কেজি	৩০০/-
৭	পিলেট খাবার	১৫,০০০ কেজি	২,১০,০০০/-
৮	পাংগাস মাছের পোনা (১০-১২ সে:মি:)	২০,০০০টি	৪৫,০০০/-
৯	কার্প জাতীয় মাছের পোনা	২,৫০০ টি	২,৫০০/-
১০	শ্রমিক ব্যয়	১২ শ্রম মাস	১৯,০০০/-
১১	চিকিৎসার ঔষধ/রাসায়নিক	গুচ্ছ	৩,০০০/-
১২	আহরণ ও বাজার জাত করণ	গুচ্ছ	৪,০০০/-
১৩	বিবিধ	গুচ্ছ	৪,২০০/-
		মোট =	৩,০০,০০০/-

* পুকুর ভাড়া এবং ব্যাংক ঋণ নিয়ে মাছ চাষ করলে আরও ৫০,০০০/- টাকা বেশী ব্যয় হবে।

উৎপাদন ও আয়

উৎপাদন ঃ ১০,০০০ কেজি।
আয় ঃ প্রতি কেজি ৫০/- টাকা হিসেবে ১০,০০০ কেজির মূল্য = ৫,০০,০০০/- টাকা।
মুনাফা ঃ ৫,০০,০০০/- - ৩,০০,০০০/- = ২,০০,০০০/- টাকা।

দেশী মাগুর ও শিং মাছ এর চাষ

এদেশে বাণিজ্যিক ভাবে দেশী শিং মাগুরের চাষ ব্যাপকভাবে শুরু হয়নি। পরীক্ষামুলক ভাবে সীমিত জলাশয়ে এর চাষ চালু হয়েছে। আগ্রহী চাষীদের এ ব্যাপারে ধারণা দেবার জন্য চাষ পদ্ধতির বর্ণনা দেয়া হলো।

ছোট-বড় সব ধরণের জলাশয়ে মাগুর ও শিং চাষ করা যায়। এসব মাছ বাতাস থেকেও শ্বাস গ্রহণ করতে পারে বলে চাষে ঝুঁকি অনেক কম। বর্তমানে স্বল্প পরিসরে হ্যাচারিতে এর পোনা উৎপাদন শুরু হয়েছে। তবে অদুর ভবিষ্যতে সহজেই পোনা পাওয়া যাবে।

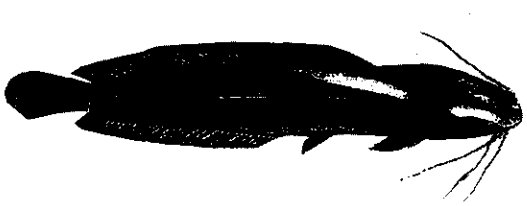

দেশী মাগুর মাছ

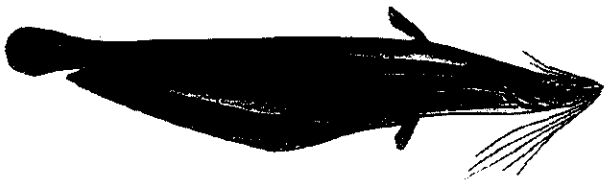

শিং মাছ

চিত্র ঃ ৪৮

পুকুর প্রস্তুতি

পুকুরের পানি সেচের মাধ্যমে শুকিয়ে ফেলতে হবে। পুকুর শুকানো সম্ভব না হলে শতাংশ প্রতি ৩০ সেঃ মিঃ গভীরতায় ২৫-৩০ গ্রাম হারে রোটেনন পাউডার পানিতে গুলে পুকুরে ছিটিয়ে দিলে সব ধরণের মাছ মারা যাবে। নতুবা পুকুরে বড় আকারের কোন রাক্ষুসে মাছ থাকলে তা শিং-মাগুরের পোনা খেয়ে ফেলবে।

চুন প্রয়োগ ঃ শতাংশ প্রতি ১-১.৫ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করতে হবে। পুকুর শুকনা থাকলে চুন প্রয়োগের পর পুকুরে পানি সরবরাহ করতে হবে।

সার প্রয়োগ ঃ চুন প্রয়োগের ৭-১০ দিন পর শতাংশ প্রতি ৫-৭ কেজি গোবর বা ৩-৪ কেজি হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা, ১০০-১৫০ গ্রাম ইউরিয়া, ৫০-৭৫ গ্রাম টি.এস.পি এবং ২০ গ্রাম এম.পি সার প্রয়োগ করতে হয়।

পোনা মজুদ

৪-৬ সেঃ মিঃ দৈর্ঘের সুস্থ-সবল পোনা পুকুরে মজুদ করা উত্তম। শতাংশ প্রতি ১০০-১৫০টি (হেক্টরে ২৪,৭০০-৩৭,০০০টি) পোনা মজুদ করা যায়।

সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ

মাগুর, শিং এর খাদ্যে চালের কুঁড়া শতকরা ৪০ ভাগ, তৈলবীজের খৈল ৩০ ভাগ এবং শুটকী ৩০ ভাগ একত্রে মিশিয়ে গোলাকার বল তৈরী করে মাছকে সরবরাহ দিতে হয়।

এ গুলো মিশ্রিত করে পিলেট তৈরী মেশিনে পিলেট করে খাওয়ালে উৎপাদন বেশী হতে পারে। এ ছাড়া শামুক বা ঝিনুকের মাংস খাওয়ানো যেতে পারে।

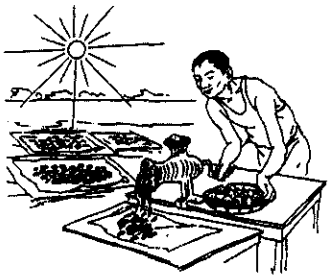

চিত্র ঃ ৪৯ পিলেট মেশিনে খাদ্য তৈরী

খাদ্য প্রয়োগের মাত্রা

মজুদকৃত মাছের ৫-১০ % হারে দৈনিক খাদ্য সরবরাহ করতে হয়।

আহরণ ও বাজারজাতকরণ

মাগুর ও শিং মাছ প্রায় ১০০ গ্রাম ওজনের হলে পর্যায়ক্রমে আহরণ করা যেতে পারে। এ মাছ জীবিত অবস্থায় বাজারজাত করতে হবে। নতুবা কাংখিত মুল্য পাওয়া যাবে না।

সম্ভাব্য উৎপাদন, আয় ও ব্যয়

এক হেক্টর আয়তনের পুকুরে শিং-মাগুর চাষের জন্য বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব

ক্রমিক নং	ব্যয়ের বিবরণ	পরিমাণ	মূল্য
১	পুকুর শুকানো/মাছ মারার ঔষধ	গুচ্ছ	৪,০০০/-
২	চুন	২৫০ কেজি	২,০০০/-
৩	জৈব সার	২০০০ কেজি	২,০০০/-
৪	ইউরিয়া	২৫০ কেজি	১,৫০০/-
৫	টিএসপি	১২৫ কেজি	২,০০০/-
৬	এমপি	১০০ কেজি	৬০০/-
৭	সম্পূরক খাদ্য	৩৬০০ কেজি	৫৪,০০০/-
৮	মাছের পোনা (৪-৬ সেঃমিঃ)	২৫০০০টি	৩৭,৫০০/-
৯	ঔষধ ও রাসায়নিক	গুচ্ছ	১,০০০/-
১০	মাছ আহরণ ও বাজার জাত করণ	গুচ্ছ	৪,৫০০/-
১১	বিবিধ	গুচ্ছ	১,৪০০/-
		মোট =	**১,১০,৫০০/-**

* পুকুর ভাড়া এবং ব্যাংক ঋণ নিয়ে চাষ করলে ২৮,০০০ টাকা বেশী ব্যয় হবে।

উৎপাদন ও আয়

উৎপাদন ঃ ১৮০০ কেজি মাছ।
আয় ঃ প্রতি কেজি ১২৫/- হিসেবে ১৮০০ কেজির মূল্য = ২,২৫,০০০/- টাকা।
মুনাফা ঃ ২,২৫,০০০/- - ১,১০,৫০০/- = ১,১৪,৫০০/- টাকা।

মৌসুমী পুকুরে মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা

যে সব পুকুরে বছরে ৩-৮ মাস পানি থাকে সেগুলো মৌসুমী পুকুর। বাংলাদেশের পল্লী এলাকায় এরূপ অসংখ্য ছোট ছোট জলাশয় আছে। এসব জলাশয়ে সহজেই গিফট জাতের তেলাপিয়া, রাজপুঁটি এবং পোনা চাষ করা যায়।

চাষ পদ্ধতি

মৌসুমী পুকুরে চাষাবাদ সময় কালের ব্যবস্থাপনা পর্যায়কে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়।

ক) মজুদ পূর্ব ব্যবস্থাপনা
খ) মজুদ ব্যবস্থাপনা
গ) মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা

চিত্র ঃ ৫০ মৌসুমী পুকুরে মাছ চাষ

মজুদপূর্ব ব্যবস্থাপনা

গিফট জাতের তেলাপিয়া, রাজপুঁটি এবং পোনা চাষের জন্য মজুদপূর্ব ব্যবস্থাপনা একই রকম। মৌসুমী পুকুরে শুকনো মৌসুমে পানি থাকার কথা নয়। তবে নানা ধরণের আগাছা থাকতে পারে। আগাছা বা জঙ্গল থাকলে তা পরিষ্কার করতে হবে। কারণ সেগুলো ক্ষতিকর কীট-পতঙ্গ ও রাক্ষুসে প্রাণীর আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে। তাই পুকুর প্রস্তুত করার সময় পুকুর ও পাড়ে সবধরণের আগাছা, জঙ্গল, পাড়ের বড় গাছের ডাল-পালা পরিষ্কার করে নিতে হবে।

চুন প্রয়োগ

সাধারণতঃ শতাংশ প্রতি ১ কেজি চুন পানিতে গুলে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। চুন দেয়ার পর পুকুরে পানি সরবরাহ করতে হবে।

সার প্রয়োগ

পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরীর জন্য পুকুর প্রস্তুতিকালে শতাংশ প্রতি ৫-৭ কেজি গোবর, ১০০-১৫০ গ্রাম ইউরিয়া, ৫০-৭৫ গ্রাম টি.এস.পি এবং ২০ গ্রাম এম.পি সার একত্রে পানিতে গুলে ছিটিয়ে দিতে হবে।

গিফট জাতের তেলাপিয়া চাষ

পুকুর প্রস্তুতি শেষে প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষার পর পানির রং সবুজ বা হালকা বাদামী হলে পোনা মজুদ করতে হবে। প্রতি শতাংশে ৪-৫ সেঃমিঃ আকারের ৮০-১০০ টি গিফট জাতের তেলাপিয়ার পোনা মজুদ করলে ভাল উৎপাদন পাওয়া যায়।

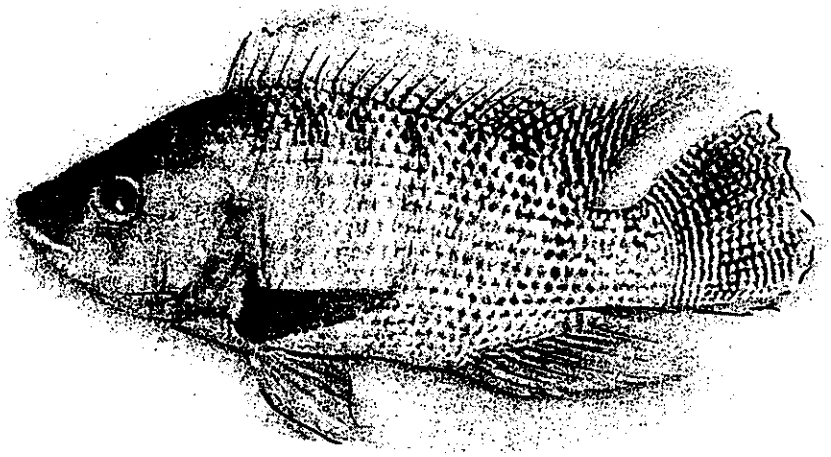

চিত্র ঃ ৫১ গিফট তেলাপিয়া

সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ

পোনা মজুদের পরদিন থেকে প্রতিদিন মজুদ মাছের ওজনের শতকরা ৪-৬ ভাগ হারে চালের কুঁড়া দিতে হয়। মাছ কিছুটা বড় হলে সবধরণের খাবার পুকুরে দেয়া যায়। রান্না ঘরের উচ্ছিষ্ট, তরকারী ইত্যাদি ছোট টুকরা করে পুকুরে সরবরাহ দেয়া যায়।

পোনা সরানো

গিফট জাতের তেলাপিয়া বদ্ধ জলাশয়ে বাচ্চা দেয়। মাছের বয়স ৩ মাস পর পুকুরে পোনা দিতে থাকে। আর এ পোনা এত বেশী পরিমাণ হয় যে, পুকুর ভরে যায়। এজন্য পুকুরে জাল টেনে ছোট বাচ্চাগুলো ধরে ফেলতে হয়।

আহরণ

৫-৬ মাসের মধ্যে মাছ ১৫০-২৫০ গ্রাম ওজনের হয়ে যায়। তখন বেড় জাল দিয়ে মাছ ধরে ফেলতে হয়।

সম্ভাব্য উৎপাদন, আয় ও ব্যয়

০.০৮ হেক্টর (২০ শতাংশ) আয়তনের পুকুরে গিফট জাতের তেলাপিয়া চাষের ছয় মাসের জন্য আয় ব্যয়ের হিসাব

ক্রমিক নং	ব্যয়ের বিবরণ	পরিমাণ	মূল্য
১	পুকুর সংস্কার	গুচ্ছ	৫৫০/-
২	চুন	২০ কেজি	১৬০/-
৩	জৈব সার	৬০০ কেজি	৬০০/-
৪	ইউরিয়া	২০ কেজি	১৬০/-
৫	টিএসপি	১০ কেজি	১২০/-
৬	পোনা	১৬০০ টি	৮০০/-
৭	চালের কুড়া	৪০০ কেজি	২৪০০/-
৮	বিবিধ	গুচ্ছ	২১০/-
		মোট =	৫,০০০/-

উৎপাদন ও আয়

উৎপাদন ঃ ২০০ কেজি মাছ।
আয় ঃ প্রতি কেজি ৪০/- হিসেবে ২০০ কেজির মূল্য = ৮,০০০/- টাকা।
মুনাফা ঃ ৮,০০০/- - ৫,০০০/- = ৩,০০০/- টাকা।

রাজপুঁটির চাষ

এ মাছ উচ্চ ফলনশীল ও সুস্বাদু। ৫-৬ মাসে একটি রাজপুঁটি ১৫০-২০০ গ্রাম ওজনের হয়। যে কোন জলাশয়ে এ মাছ চাষ করা যায়।

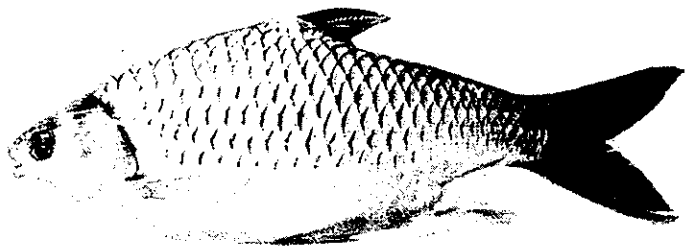

চিত্র ঃ ৫২ রাজপুঁটি

পুকুর প্রস্তুতি

মৌসুমী পুকুর প্রস্তুতির ন্যায় এ মাছ চাষের পুকুর প্রস্তুত করে নিতে হবে।

পোনা মজুদ

সার প্রয়োগের ৭ দিনের মধ্যে পানির রং সবুজ বা হালকা বাদামী রং ধারণ করবে। এ অবস্থায় শতাংশ প্রতি ৪-৬ সেঃমিঃ আকারের ৭০-৮০ টি পোনা মজুদ করতে হয়।

চিত্র ঃ ৫৩ রাজপুঁটির পোনা মজুদ

সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ

পোনা ছাড়ার পরের দিন থেকে পুকুরে মজুদ মাছের ওজনের শতকরা ৪-৬ ভাগ হারে চালের কুঁড়া দৈনিক খাবার দিতে হয়। ক্ষুদিপানা বা নরম ঘাস এ মাছের প্রিয় খাবার। তাই চালের কুঁড়ার পাশাপাশি ক্ষুদিপানা পুকুরে সরবরাহ করলে ভাল উৎপাদন পাওয়া যাবে। এছাড়া ১৫ দিন পর পর শতাংশে ১ কেজি মুরগির বিষ্ঠা বা ২ কেজি গোবর পুকুরে ছিটিয়ে দিলে প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরী হবে।

আহরণ

বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে ভালভাবে চাষ করলে ৫-৬ মাসে মাছের গড় ওজন ১৫০-২০০ গ্রাম হলে জাল টেনে সব মাছ ধরে ফেলতে হয়।

সম্ভাব্য উৎপাদন, আয় ও ব্যয়

০.১০ হেক্টর (২৫ শতাংশ) আয়তনের পুকুরে রাজ পুটির চাষের জন্য ছয় মাসে আয় ব্যয়ের হিসাব

ক্রমিক নং	ব্যয়ের বিবরণ	পরিমাণ	মূল্য
১	পুকুর সংস্কার	গুচ্ছ	২৫০/-
২	চুন	২৫ কেজি	২০০/-
৩	জৈব সার	৪০০ কেজি	৪০০/-
৪	ইউরিয়া	২৫ কেজি	২০০/-
৫	টিএসপি	১২ কেজি	১৪৪/-
৬	পোনা	২০০০ টি	১০০০/-
৭	চালের কুড়া	৫০০ কেজি	২৫০০/-
৮	ক্ষুদি পানা	গুচ্ছ	২০০/-
৯	বিবিধ	গুচ্ছ	১০৬/-
		মোট =	৫,০০০/-

উৎপাদন ও আয়

উৎপাদন ঃ ২৫০ কেজি মাছ।
আয় ঃ প্রতি কেজি ৪০/- হিসেবে ২৫০ কেজির মূল্য = ১০,০০০/- টাকা।
মুনাফা ঃ ১০,০০০/- - ৫,০০০/- = ৫,০০০/- টাকা।

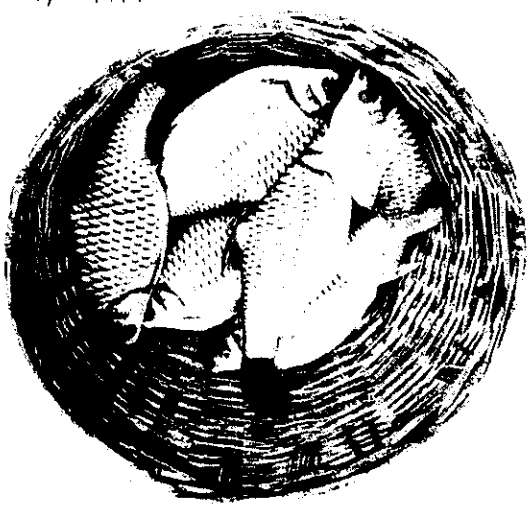

চিত্র ঃ ৫৪ রাজপুঁটি

মৌসুমী পুকুরে পোনার চাষ

পুকুর প্রস্তুতি

কার্প জাতীয় মাছের চারা পুকুর প্রস্তুতি সম্পর্কে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। একই ভাবে পোনার পুকুর প্রস্তুত করতে হবে। তবে পুকুরে রেনু পোনা মজুদের ৪৮ ঘন্টা আগে হাঁস পোকা, কীট-পতঙ্গ দূর করার জন্য শতাংশে ৩০ সেঃমিঃ গভীরতার পানিতে ৬ মিঃলিঃ সুমিথিয়ন বা ১২-১৫ গ্রাম ডিপটারেক্স প্রয়োগ করতে হয়। অথবা যে দিন বায়ু প্রবাহ না থাকে সে দিন বিঘা (৩৩ শতাংশ) প্রতি আধা লিটার ডিজেল ছিটায়ে দিলে হাঁস পোকা মারা যায়।

চিত্র ঃ ৫৫ মাছের পোনা দেশের সোনা

রেণু মজুদ

হাঁস পোকা ও কীট-পতঙ্গ দমনের পর ৪-৫ দিন বয়সের রেণু পোনা শতাংশ প্রতি ৬-৮ গ্রাম নার্সারী পুকুরে মজুদ করতে হয়।

সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ

পোনা মজুদের ১ দিন পর থেকে খাবার দিতে হয়। সমপরিমাণ চালের কুঁড়া ও ভেজানো সরিষার খৈল মিশিয়ে মজুদ পোনার ৪-৫গুণ হারে দৈনিক ৩-৪ বার সরবরাহ দিতে হয়। ১৫-২০ দিন পর খাবার মাত্রা মজুদ পোনার এক থেকে দেড়গুণ হারে সরবরাহ দিতে হবে। খাদ্য সরবরাহের মাত্রা পুকুরের প্রাকৃতিক খাদ্যে উপর নির্ভর করে কম বা বেশী হতে পারে। তাছাড়া পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য কম থাকলে তা বাড়াতে হবে। সেক্ষেত্রে গোবর সার শতাংশ প্রতি দৈনিক ২০০ গ্রাম হারে দেয়া যায়। নিয়মিত পুকুরে হররা টেনে তলার গ্যাস বের করে দিতে হবে। দের মাস পর থেকে যে সব পোনা ৮-১০ সে.মি. হবে ঐ গুলো বিক্রি করা শুরু করতে হবে। এক বিঘা থেকে ছয় মাসে ৮-১০ সে.মি. আকারের ৫০,০০০টি পোনা উৎপাদন করা যাবে।

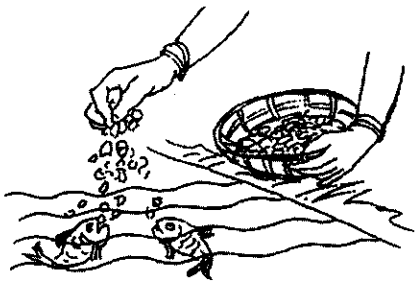

চিত্র ঃ ৫৬ সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ

নবম অধ্যায়ে পোনার চাষ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

সম্ভাব্য উৎপাদন, আয় ও ব্যয়

০.১৩ হেক্টর (৩৩ শতাংশ) আয়তন পুকুরে পোনা চাষের জন্য ছয় মাসে আয় ব্যয়ের হিসাব

ক্রমিক নং	ব্যয়ের বিবরণ	পরিমাণ	মূল্য
১	পুকুর সংস্কার	গুচ্ছ	৫০০/-
২	চুন	৩৩ কেজি	২৬০/-
৩	জৈব সার	৬৬০ কেজি	৬০০/-
৪	ইউরিয়া	৩৩ কেজি	১৯৮/-
৫	টিএসপি	১৬ কেজি	১৯২/-
৬	সুমিথিয়ন	৩০০ মি: লি:	১০০/-
৭	রেণু	২৬৪ গ্রাম	৭৫০/-
৮	সরিষার খৈল	২০০ কেজি	১,৪০০/-
৯	চাউলের কুড়া/গমের ভূষি	২০০ কেজি	১,০০০/-
		মোট =	৫,০০০/-

উৎপাদন ও আয়

উৎপাদন ঃ ৫০,০০০ টি (৮-১০ সে: মি:) পোনা।
আয় ঃ প্রতি টি ৩০ পয়সা হিসেবে ৫০,০০০টি পোনার মূল্য = ১৫,০০০/- টাকা।
মুনাফা ঃ ১৫,০০০/- - ৫,০০০/- = ১০,০০০/- টাকা।

ক্ষেত্র বিশেষে চাষ পরিহারযোগ্য মাছের প্রজাতি

দেশে বিভিন্ন প্রজাতির দেশী ও বিদেশী প্রজাতির মাছ চাষের প্রচলন রয়েছে। কিন্তু কতিপয় প্রজাতির ক্ষেত্রে আমাদের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। দু'একটি প্রজাতি এমন যে, এ গুলোর সার্বিক চাষ কার্যক্রমই পরিহার করা প্রয়োজন। এ সব প্রজাতি এ দেশের সার্বিক জলজ জীববৈচিত্রের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে কিংবা ক্ষেত্র বিশেষে মাছ চাষ কার্যক্রম ব্যাহত করে থাকে। নিম্নে এ ধরণের প্রজাতি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

আফ্রিকান মাগুর

এ প্রজাতির মাছটি থাইল্যান্ড থেকে এ দেশে আনা হয়েছিল। কিন্তু বিগত বছরগুলোতে দেখা গেছে এর অতি রাক্ষুসে স্বভাব এদেশের মাছের জীববৈচিত্রের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। তাছাড়া এর আকৃতি, খাদ্য গ্রহণের স্বভাব, স্বাদ ইত্যাদির কারণে বাজারে সর্বসাধারণের নিকট এর গ্রহণ যোগ্যতাও ব্যাপকভাবে কমে গেছে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্টের সম্ভাবনা সহ অন্যান্য কারণে এ মাছের চাষ নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে। এ মাছের চাষ সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা বাঞ্ছনীয়।

চিত্র ঃ ৫৭ আফ্রিকান মাগুর

তেলাপিয়া

একক ভাবে এ মাছের চাষ বদ্ধ জলাশয়ে করা যেতে পারে। তবে কোন ক্রমে যাতে উন্মুক্ত প্রাকৃতিক উৎসে চলে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। এ মাছও প্রাকৃতিক জীববৈচিত্রের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। এ মাছ চাষযোগ্য কার্প বা অন্য অরাক্ষুসে মাছের সাথে চাষ পরিহার করতে হবে। নতুবা চাষকৃত অন্যান্য প্রজাতি তেলাপিয়ার সাথে খাদ্য ও অক্সিজেন গ্রহণের প্রতিযোগিতায় টিকতে পারে না। ফলে চাষকৃত প্রজাতির কাংখিত উৎপাদন অর্জন সম্ভব হয় না।

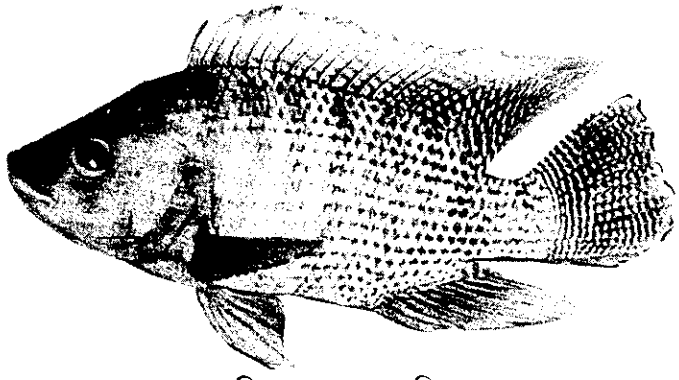

চিত্র ঃ ৫৮ তেলাপিয়া

কমনকার্প ও মিরর কার্প

কমন কার্প ও মিরর কার্প চাষযোগ্য প্রজাতি। দেশী রুই জাতীয় মাছের সাথে চাষ করা যায়। এ মাছ চাষ করলে পাড় ভেঙ্গে ফেলার সম্ভাবনা থাকে। মাটি থেকে খাবার খোঁজার অভ্যাস থাকায় এ মাছ পাড়ের মাটি সরিয়ে ফেলে, ফলে পাড় ভেঙ্গে পড়ে। এজন্য যে সব পুকুরের পাড়ে ঘর-বাড়ি, বাগান, বা অন্যান্য অর্থকরী বৃক্ষ আছে, সে সব পুকুরে এ মাছের চাষ পরিহার করা উচিত।

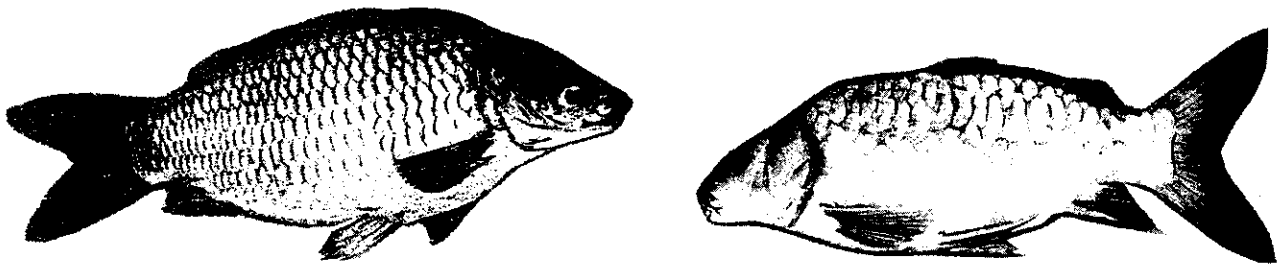

চিত্র ঃ ৫৯ কমনকার্প ও মিরর কার্প

গ্রাস কার্প

গ্রাস কার্প একটি চাষযোগ্য প্রজাতি। এ মাছ রুই জাতীয় মাছের সাথে চাষ করা হয়ে থাকে। গ্রাস কার্প জলজ আগাছা এবং নরম উদ্ভিদ খেয়ে থাকে। এজন্য ধান ক্ষেত্রের সাথে সংযুক্ত কোন জলাশয়ে এ মাছ চাষ না করাই শ্রেয়। কারণ এ মাছ ধানের জমিতে প্রবেশ করে ধানের ক্ষতি করতে পারে।

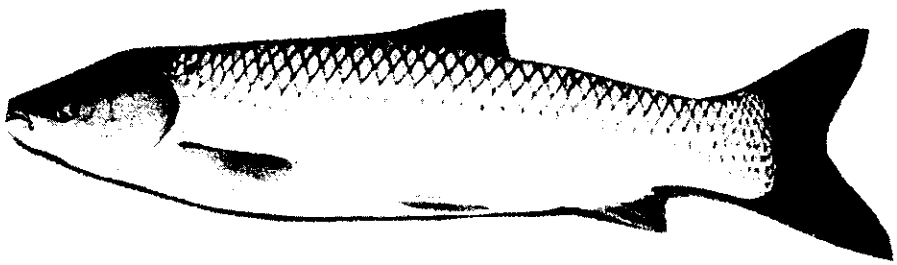

চিত্র ঃ ৬০ গ্রাস কার্প

বোয়াল, শোল, গজার

এসব মাছ একক ভাবে চাষ করা যায়। তবে কার্প জাতীয় মাছের সাথে এ মাছের চাষ পরিহার করতে হবে। এ সব মাছের রাক্ষুসে স্বভাবের জন্য এরা চাষকৃত কার্প জাতীয় মাছের পোনা খেয়ে ফেলে।

বোয়াল শোল

চিত্র ঃ ৬১ বোয়াল, শোল

চতুর্থ অধ্যায়

পুকুরে সমন্বিত মাছ চাষ

বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকার প্রায় প্রতিটি বাড়ীতেই এক বা একাধিক পুকুর দেখতে পাওয়া যায়। তাছাড়াও বসত বাড়ীর আশে পাশে রয়েছে অসংখ্য ডোবা, নালা, বরোপিট ও মৌসুমী জলাশয়। মাছ ছাড়াও গৃহস্থালির অনেক কার্যক্রমেই পুকুর বা জলাশয়ের ভুমিকা অনস্বীকার্য। ঐতিহ্যগত ভাবে আবহমান বাংলার গ্রামীণ সব পরিবারেই গৃহপালিত পশুপাখি পালন করার রেওয়াজ চালু আছে। তাছাড়া ইদানিং খামার পর্যায়েও হাঁস-মুরগি এবং গবাদি পশু পালন করা হচ্ছে। গবাদি পশুর গোবর ব্যতীত অন্য কোন প্রাণীর মলমূত্র বা বিষ্ঠা পরিকল্পনা ভিত্তিক কোন কাজে ব্যবহার হয় না। মাছ চাষে এ সব জীবজন্তুর মলমূত্র এবং পরিত্যক্ত খাদ্য দ্রব্য মাছের পুকুরে ব্যবহার করা যায়। বিজ্ঞান ভিত্তিক মাছ চাষের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ব্যয়ের শতকারা ৬০-৬৫ ভাগই ব্যয় করতে হয় পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্যের এবং সম্পুরক খাদ্যের যোগান দিতে। এ ব্যয় অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব সব অপ্রয়োজনীয় এবং অব্যবহৃত দ্রব্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে।

সমন্বিত মাছ চাষের উপযোগিতা

সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার

সমন্বিত খামার পরিচালনায় একই সময়ে একাধিক ফসল উৎপাদন করা যায়। ফলে কম জায়গায় কম খরচে অধিক উৎপাদন পাওয়া যায়। তাছাড়া এমন অনেক অব্যবহৃত অথবা উচ্ছিষ্ট জিনিষ আছে যা কোন কাজে লাগে না, তার ব্যবহারও নিশ্চিত করা সম্ভব হয় এবং প্রতি একর আয়তনের জায়গা হতে বেশী উৎপাদন পাওয়া যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে একটি ফসল অপর ফসলের সহায়ক হিসাবে কাজ করে।

উৎপাদন ব্যয়হ্রাস

মাছ চাষে সার প্রয়োগ এবং সম্পুরক খাদ্যের ব্যয় সাধারণতঃ মোট ব্যয়ের শতকারা ৫০-৬০ ভাগ। কিন্তু সমন্বিত মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনায় নাম মাত্র মূল্যের বিভিন্ন দ্রব্যাদি এবং উচ্ছিষ্ট খাদ্য পুকুরে সার এবং মাছের সম্পুরক খাদ্য হিশেবে ব্যবহৃত হওয়ায় উৎপাদন ব্যয়হ্রাস পায়।

বাড়তি খাদ্য উৎপাদন

সমন্বিত মাছ চাষে মাছ উৎপাদনের পাশাপাশি পুকুরের পানি, ঢাল এবং পাড় ব্যবহার করে শাকসব্জি চাষ এবং হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশু পালন করা যায়। একই ক্ষেত্র থেকে একই সংগে একাধিক খাদ্য যেমন মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, শাকসব্জি ও ফুলমূল পাওয়া যায়।

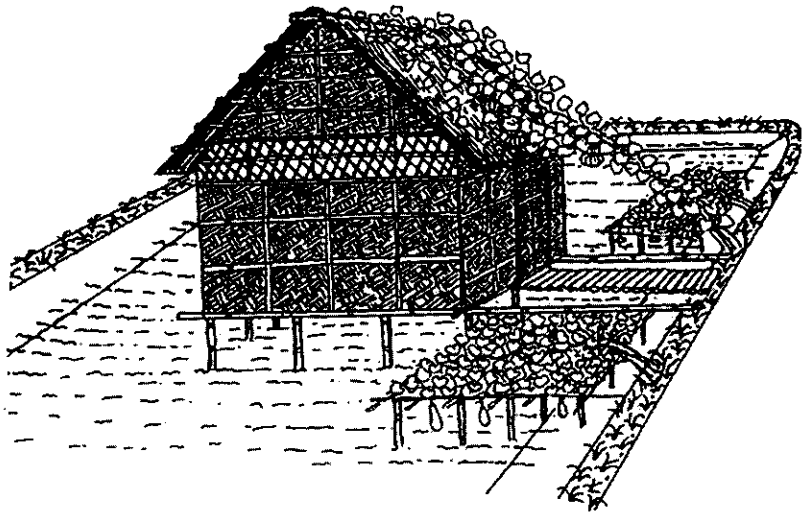

চিত্র ঃ ৬২ মুরগির ঘরের চালে ও পুকুরের পাড়ের ঢালে সব্জির চাষ

পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা

কৃষির আধুনিকীকরণের জের হিসাবে বিভিন্ন উপকরণের ব্যবহার পরিবেশের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে চলছে। তাছাড়া বিভিন্ন শিল্প, কলকারখানা ও কসাইখানার বিভিন্ন উপজাত বর্জ্য এবং উচ্ছিষ্ট বস্তুও পরিবেশ দূষিত করে থাকে, সমন্বিত মৎস্য চাষ কার্যক্রমে এসব পরিবেশ দূষণকারী অনেক দ্রব্যকে পুকুরে মাছের প্রাকৃতিক অথবা সম্পুরক খাবারের সহায়ক উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা যায়। ফলে একদিকে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায় অন্য দিকে পরিবেশ দূষণের মাত্রা অনেকাংশে লাঘব করা সম্ভব হয়।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি

সমন্বিত খামার ব্যবস্থপনায় একই সঙ্গে বিভিন্ন ধরণের উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালিত হয় এতে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন কার্যক্রমে ভিন্ন ভিন্ন কর্মক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। কম পুঁজিতে বেশী লোকের কর্মসংস্থানের জন্য সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা উল্লেখযোগ্য ভুমিকা রাখতে পারে।

টেকসই উন্নয়ন

সমন্বিত চাষে কোন একক ক্ষেত্রে হাতের নাগালের মধ্যে প্রাপ্য বিভিন্ন সম্পদের পরস্পরের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ও আদান প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন উৎপাদন প্রক্রিয়া পরিচালনা করা হয় যা টেকসই উন্নয়ন ঘটাতে সাহায্য করে।

সারা বছরই নানা খাত থেকে আয়

মৎস্য চাষে মাছ থেকে আয় পেতে বেশ কিছু সময় অপেক্ষা করতে হয়। কিন্তু সমন্বিত মৎস্য চাষে সারা বছরই কোন না কোন খাত থেকে আয়ের সুযোগ থাকে। ফলে খামার ব্যবস্থাপনায় অর্থ সংকট সহজেই কাটিয়ে উঠা সম্ভব হয়।

ঝুঁকি কম

সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনায় ঝুঁকি কম থাকে। কোন উৎপাদন কার্যক্রম প্রাকৃতিক কারণ বা অন্য কোন কারণে ব্যাহত হলে অন্য উৎপাদন কার্যক্রমের মাধ্যমে সে ক্ষতি কোন কোন ক্ষেত্রে অনেকটা পুষিয়ে নেয়া যায়।

সমন্বিত মৎস্য চাষের ক্ষেত্রসমূহ

গ্রামীণ ছোট বা বড় পুকুরে মাছ চাষের সাথে অন্য একটি বা দুটি কার্যক্রম সমন্বয় করা যায়। তবে অপেক্ষকৃত বড় খামারে দুই বা ততোধিক কার্যক্রমের সমন্বয় ঘটানো সম্ভব হয়। উৎপাদনের বিভন্ন পদ্ধতি অনুযায়ী সমন্বিত মাছ চাষকে নিম্নরূপে ভাগ করা যেতে পারে, যথা ঃ

১) সমন্বিত মাছ ও মুরগি চাষ মুরগি
২) সমন্বিত মাছ ও হাঁস চাষ
৩) সমন্বিত মাছ ও গবাদিপশু পালন
৪) ধানক্ষেতে মাছ চাষ
৫) মাছ ও শাকসব্জি চাষ
৬) সেচ প্রকল্প এলাকায় সমন্বিত মাছ চাষ
৭) খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানা ও মাছের সমন্বিত চাষ
৮) রেশম কীট ও মাছের সমন্বিত চাষ
৯) মাছ ও গবাদি পশুর জন্য ঘাসের চাষ
১০) মাছের সাথে মুক্তা চাষ
১১) ক্ষুদিপানা/ অ্যাজোলার সাথে মাছ চাষ

এ অধ্যায়ে সমন্বিত মৎস্য চাষ পদ্ধতির গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পদ্ধতির উপর আলোকপাত করা হলো ।

মাছ ও মুরগির সমন্বিত চাষ

বাংলাদেশের গ্রামের প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই হাঁস-মুরগি পালন করতে দেখা যায়, যার সংখ্যা প্রায় ১০কোটি। এদের বিষ্ঠা সাধারণতঃ কোন উৎপাদনমুলক কাজে ব্যবহার হয় না। সমন্বিত মাছ ও মুরগির চাষ পদ্ধতিতে মুরগির বিষ্ঠা এবং উচ্ছিষ্ট খাবার সরাসরি পুকুরে পড়ার ফলে কোন সার বা খাবার ছাড়াই মাছ উৎপাদন করা সম্ভব। মাছ ও মুরগি সমন্বিত চাষ দু' ভাবে করা যেতে পারে-

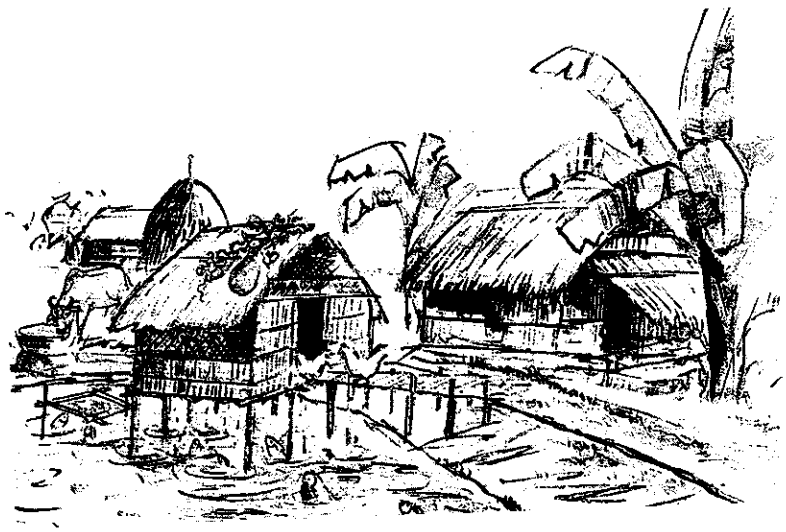

চিত্র ঃ ৬৩ পুকুরের উপরে ঘর তৈরী করে সমন্বিত মাছ ও মুরগির চাষ

চিত্র ঃ ৬৪ বসতবাড়ীর আঙ্গিনায় মুরগি পালন করে মুরগির বিষ্ঠা পুকুরে প্রয়োগ

- পুকুর বা জলাশয়ের উপর ঘর করে মুরগি পালন
- পুকুর বা জলাশয়ের বাহিরে যথা বসতবাড়ীর আঙ্গিনায় বা পুকুর পাড়ে মুরগি পালন করে মুরগির বিষ্ঠা বা উচ্ছিষ্ট খাদ্য দ্রব্য নিয়মিত পুকুরে প্রয়োগের মাধ্যমে।

সমন্বিত ব্যবস্থাপনায় মাছ ও মুরগি পালন একত্রে চললেও এ চাষ পদ্ধতিকে সহজভাবে বোধগম্য করার জন্য মাছ ও মুরগি পালন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আলোচনা করা হলো

মাছ চাষ

পুকুর নির্বাচন ঃ মাছ ও মুরগির সমন্বিত চাষের ক্ষেত্রে একে বারে ছোট আকারের পুকুর উপযোগী নয়। এতে পানির গুণাগুণ নষ্ট হবার সম্ভাবনা থেকে যায়। পুকুর বা জলাশয় উঁচু জায়গায় হওয়া বাঞ্ছনীয় যাতে বন্যার পানি কিংবা বৃষ্টির পানিতে মাছ ও মুরগির কোন ক্ষতি না হয়।

পুকুর প্রস্তুতকরণ ঃ পুকুর প্রস্তুত বলতে পোনা মাছ মজুদ করার পূর্বে যে সকল কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়ে থাকে সেগুলোকে বুঝানো হয়। মাছ চাষের জন্য পুকুর প্রস্তুতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পুকুর বা জলাশয়ে পোনা মজুদের আগে সবচেয়ে প্রাথমিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে পুকুরটি মাছ চাষের উপযোগী করে প্রস্তুত করে নেয়া। পুকুর প্রস্তুত বলতে পুকুরের পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নয়ন, জলজ আগাছা নিয়ন্ত্রণ, রাক্ষুসে মাছ অপসারণ এবং পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা ইত্যাদি কার্যক্রমকে বুঝানো হয়ে থাকে। এ জন্য প্রথমেই পুকুরের পাড় ভাঙ্গা থাকলে তা মেরামত করতে হবে এবং পাড় এমন উঁচু করতে হবে যাতে বর্ষায় প্লাবিত না হয়। পুকুরে জলজ আগাছা থাকলে তা শিকড়সহ তুলে ফেলতে হবে। পুকুর পাড়ে ঝোপ ঝাড় ও বড় গাছ থাকলে তার ডালপালা কেটে পরিস্কার রাখতে হবে। পুকুরের তলায় অতিরিক্ত কাদা থাকলে পুকুরের পানি শুকিয়ে ফেলতে হবে। পুকুর শুকিয়ে রাক্ষুসে ও অচাষযোগ্য মাছ

সর্ম্পূণরূপে অপসারণ করা সম্ভব। পুকুর শুকালে তলায় সূর্যের আলো পড়বে যা তলায় জমে থাকা ক্ষতিকর গ্যাস ও রোগজীবাণু দূর করবে। পুকুর শুকানো সম্ভব না হলে বার বার জাল টেনে অথবা মাছ মারার ঔষধ প্রয়োগ করে রাক্ষুসে ও অচাষযোগ্য মাছ দূর করতে হবে। প্রতি শতকে ৩০ সেমিঃ গভীর পানির জন্য ২৫-৩০ গ্রাম হারে রোটেনন প্রয়োগ করে এসব অচাষযোগ্য ও রাক্ষুসে মাছ দমন করা যায়। এসব ঔষধের বিষ ক্রিয়া পুকুরে ৭ দিন পর্যন্ত থাকে। রাক্ষুসে ও অচাষযোগ মাছ দূরীকরণের পর পুকুরে শতাংশ প্রতি ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করতে হবে। তবে লাল বা অম্ল মাটির পুকুরে চুনের মাত্রা দ্বিগুণ করতে হবে। চুন দেয়ার ৭ দিন পর পুকুরের উপরে বানানো ঘরে মুরগির বাচ্চা ছাড়তে হবে। মুরগির বাচ্চা ছাড়ার ৭-৮ দিন পরে পুকুরে মাছের পোনা ছাড়তে হবে।

পোনা মাছের প্রজাতি নির্বাচন

মাছ ও মুরগির সমন্বিত চাষের ক্ষেত্রে পুকুরে বিভিন্ন প্রজাতির এমন সব পোনা মাছ ছাড়তে হবে যাতে এরা খাদ্য গ্রহণে বিভিন্ন স্তরের মাছের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত না হয় এবং পুকুরে প্রকৃতিক খাদ্য স্বাচ্ছন্দে গ্রহণ করে। মুরগি পালিত পুকুরের তলদেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে মুরগির বিষ্ঠা বা খাবার জমা হয়। মৃগেল, কার্পিও ও মিরর কার্প মাছ পুকুরের তলদেশের খাদ্য খেয়ে থাকে এবং সাথে সাথে মাটি নাড়াচাড়া করে তলদেশে জমে থাকা সারবস্তু পানিতে মিশিয়ে দেয়, ফলে পুকুরের পানির উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে যায়। মুরগির বিষ্ঠা পানিতে পড়ে পুনরায় সাররবস্তু পানিতে মিশে অণূজীবের কার্যক্রম বেড়ে যায় ফলে অক্সিজেনের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এ ধরণের পুকুরে অক্সিজেনের অভাব হওয়া একটি সাধারণ বিষয় হয়ে দেখা যায়। প্রয়োজনীয় পরিমাণ অক্সিজেন পুকুরের পানিতে বিদ্যমান না থাকলে অক্সিজেনের অভাবে মাছ দ্রুত মারা যেতে পারে। স্বাভাবিকভাবে পুকুরে কিছু জলজ আগাছা জন্মায়। এগুলো নিয়ন্ত্রণের জন্য পুকুরে অল্প সংখ্যক গ্রাসকার্পের পোনা ছাড়তে হয়। উদ্ভিদ কণার আধিক্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে সিলভার কার্প মজুদ করা প্রয়োজন।

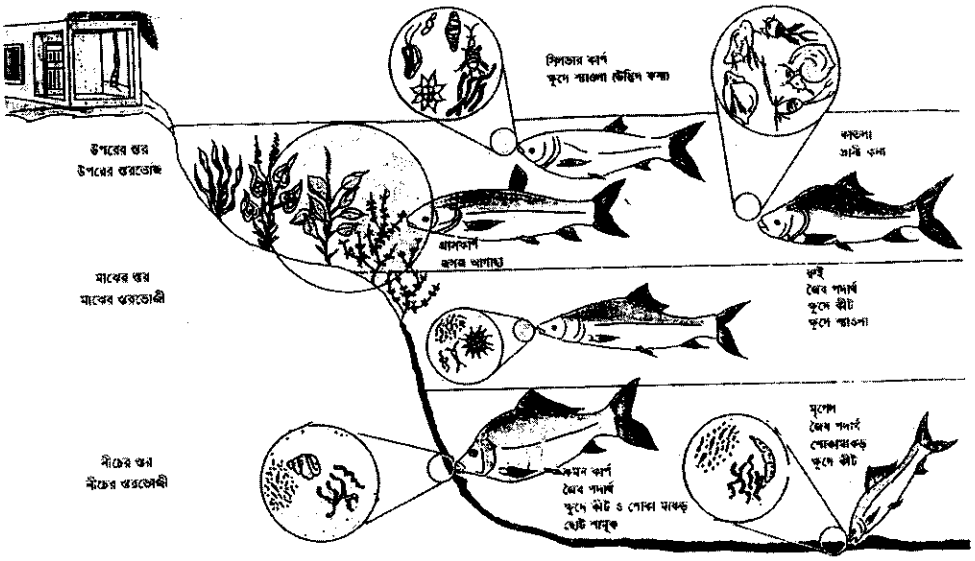

চিত্র ঃ ৬৫ পুকুরে বিভিন্ন স্তরের মাছের চাষ করলে খাদ্য গ্রহণে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয় না।

পোনার আকার ও মজুদ ঘনত্ব

নিম্নে শতাংশ প্রতি বিভিন্ন প্রজাতির পোনার সংখ্যা উল্লেখ করা হলো।

মাছের প্রজাতি	প্রতি শতাংশে সংখ্যা
সিলভার কার্প	৯
কাতলা/বিগহেড	৪
রুই	৮
মৃগেল	৪
মিরর কার্প/কার্পিও	৪
গ্রাস কার্প	১
থাই সরপুঁটি	৫-১০
মোট	৩৫-৪০টি

পোনার আকার ১২-১৫ সেঃমিঃ হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে থাই সরপুঁটি ৮-১০ সেঃমিঃ হতে পারে।

মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা

সমন্বিত মাছ ও মুরগি চাষে পানিতে দ্রবীভুত অক্সিজেনের মাত্রা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা দরকার। এ ধরণের চাষের পুকুরে তলায় বিষ্ঠা জমা হয়ে পুকুরে হঠাৎ করে অক্সিজেনের অভাব হতে পারে এবং মাত্রাতিরিক্ত ক্ষতিকর গ্যাস সৃষ্টি হতে পারে ফলে ব্যাপকহারে মাছ মারা যেতে পারে। এজন্য সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনায় পুকুরের ধারে কাছে ভালো পানির উৎস থাকা উচিত। মাছের সুষ্ঠু জীবনধারণ ও বৃদ্ধির জন্য পানিতে ৫-৮ পিপি এম (নিযুতাংশ) হারে অক্সিজেন থাকা প্রয়োজন। পুকুরে মাঝে মাঝে হররা টেনে পুকুরের তলায় জমে থাকা মুরগির বিষ্ঠা পানির সাথে মিশিয়ে দেয়া প্রয়োজন। এতে পানিতে পরিমিত প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদিত হয় আর দ্রবীভুত অক্সিজেনের পরিমাণ যথাযথ থাকে এবং তলায় কোন ক্ষতিকর গ্যাস থাকলে তা বের হয়ে আসে। এছাড়া সমন্বিত মাছ চাষের ক্ষেত্রে পুকুরের পানির গুণাগুণ ঠিক রাখার জন্য অন্ততঃ প্রতি দুই মাস পর পর শতাংশ প্রতি ০.৫কেজি হারে কলিচুন প্রয়োগ করতে হয়।

মাছ আহরণ ও বাজারজাতকরণ

আংশিক মাছ আহরণ মৎস্য চাষের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত মাছ দ্রুত বৃদ্ধিপায়। এরপর খাদ্য গ্রহণের হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেলেও আশানুরূপ দৈহিক বৃদ্ধি ঘটেনা। এজন্য সুষ্ঠু খামার ব্যবস্থাপনায় অধিক উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্য সময়ে সময়ে মাছ ধরে বাজারজাত করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। রুই, কাতলা, মৃগেল ৮-১০ মাসের মধ্যে ৭০০ গ্রাম থেকে ১.৫ কেজি হয়ে থাকে। সিলভার কার্প বিগহেড, মিরর কার্প, গ্রাস কার্প, কার্পিও ৬-৭ মাসের মধ্যে ১.০ কেজি হয়। পোনা মজুদের ৬-৭ মাসের মধ্যে বড় আকারের মাছ গুলো বিক্রয় করে সমসংখ্যক একই প্রজাতির বড় পোনা আবার পুকুরে ছাড়তে হবে। এতে অধিক উৎপাদন পাওয়া যাবে।

মুরগি পালন

সমন্বিত মাছ চাষ কার্যক্রমে যদিও মাছ চাষই বেশী গুরুত্বপূর্ণ দিক, তথাপি সমন্বয়ের অন্য কার্যক্রমকে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করা প্রয়োজন।

চিত্র ঃ ৬৬ পুকুরে উপরে নির্মিত ঘরে ডিম পাড়া মুরগি

মুরগির ঘর তৈরী

মুরগির ঘর খোলামেলা জায়গায় হওয়া উচিত যাতে ঘরে পর্যাপ্ত আলো বাতাস ঢুকতে পারে। মুরগির ঘর পুকুরে পানির উপরেও হতে পারে কিংবা পুকুরের পাড়ে বা বাড়ীর আঙ্গিনায় হতে পারে। তবে ঘর পুকুরের উপর তৈরী করাই উত্তম ।

মুরগির ঘরের আয়তন কত হবে তা নির্ভর করে পুকুরের আয়তনের উপর। কারণ পুকুরের আয়তনের ওপর নির্ভর করেই মুরগির সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়। সাধারণতঃ প্রতিটি ব্রয়লার মুরগির জন্য ১.৫ বর্গফুট বা ০.০৯-০.১৪ বঃ মিঃ এবং ডিম পাড়া মুরগির জন্য ২-২.৫ বর্গফুট বা ০.২-০.৩ বর্গমিটার জায়গার প্রয়োজন। মুরগির ঘর পুকুরের উপর তৈরী করলে পানি কমে গেলেও মুরগির বিষ্ঠা ও উচ্ছিষ্ট যেন সরাসরি পানিতে পড়তে পারে। বাঁশ ও ছন দিয়ে কম খরচে এ ঘর তৈরী করা যায়। বাঁশের বাতা দিয়ে ঘরের মেঝে তৈরী করা যায়। এক বাতা থেকে অন্য বাতার দুরত্ব হবে ১-১.৫ সে. মি. যাতে মুরগির বিষ্ঠা ও উচ্ছিষ্ট খাদ্য দ্রব্য সরাসরি পানিতে পড়তে পারে । কিন্তু মুরগির পা বাতার ফাঁকে ঢুকতে না পারে। ঘরের মেঝে হতে চালার উচ্চতা হবে ১-১.৫ মিটার। মেঝে থেকে ০.৫ মিটারের বেশী উঁচু করে কাঠ দিয়ে শক্ত বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরে দিতে হবে। যাতে ফাঁক দিয়ে পর্যাপ্ত বাতাস প্রবেশ করতে পারে। মুরগি পালনের জন্য যে সব তৈরী করা তারের খাঁচা পাওয়া যায় সে গুলোও পুকুরের উপর ব্যবহার করা যায়। তবে রোদবৃষ্টি থেকেমুরগিকে রক্ষা করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

মুরগির প্রজাতি নির্বাচন

ডিম পাড়া মুরগিকে বলা হয় লেয়ার। আর লেয়ার মুরগির উল্লেখযোগ্য প্রজাতির মধ্যে আছে ষ্টার ক্রস, হাই সেক্স, ইসাব্রাউন, ব্যবকক, বিভি ৩০০, হাই লাইন, লোমেন, ব্রাউন, হোয়াইট লেগ হর্ন, আরআইআর, ফাউমি, মির্নকা, অষ্টালর্প ইত্যাদি।

চিত্র ঃ ৬৭ মাংস ও ডিম উৎপাদনের জন্য ব্রয়লার ও লেয়ার পালন

মুরগির বাচ্চা প্রাপ্তি স্থান

দেশে অনেক সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে মুরগির বাচচা পাওয়া যায়। উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান গুলোর তালিকা এ বইয়ের শেষে দেয়া হলো।

মুরগির সংখ্যা

মুরগির সংখ্যা নির্ভর করে পুকুরের জলায়তনের উপর। অতিরিক্ত বিষ্টা ও উচ্ছিষ্ট পানিতে জমা হলে পানির গুণাগুণ নষ্ট হয়ে মাছের ক্ষতি করতে পারে। একটি ব্রয়লার মুরগি সাধারণতঃ ৩-৪ মাসের উৎপাদনকালে ৩-৪ কেজি বিষ্ঠা ত্যাগ করে। এক হেক্টর জলায়তনের পুকুরের জন্য ৫০০-৬০০টি ডিম পাড়া মুরগি পুকুরের ওপর নির্মিত ঘরে পালন করলে পুকুর ব্যবস্থাপনার জন্য কোন প্রকার সার ও সম্পুরক খাদ্যের প্রয়োজন পড়ে না।

সতর্কতা

প্রতিদিন সকাল বিকাল মুরগির স্বাভাবিক চলাফেরা ও খাওয়া দাওয়া লক্ষ্য করতে হবে। যে কোন ধরণের অস্বাভাবিক কিছু পরিলক্ষিত হলে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। ঝড় বৃষ্টির সময় মুরগি যেন না ভিজে সেদিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে। তাছাড়া শীতের সময় যাতে মুরগি কষ্ট না পায় এবং কুয়াশা মুরগির ঘরে ঢুকার ফলে মুরগি যেন ঠান্ডায় আক্রান্ত না হয় সে দিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।

মুরগির খাদ্য

ব্রয়লার মুরগির ওজন বৃদ্ধি এবং ডিম পাড়া মুরগির ডিম উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য মুরগিকে সুষম খাবার খাওয়াতে হবে। নিচে ব্রলায় এবং লেয়ার মুরগির বিভিন্ন পর্যায়ে চাহিদা অনুযায়ী খাদ্য তৈরীর জন্য বিভিন্ন খাদ্য উপাদান এবং এগুলোর মিশ্রণের হার দেয়া হলো ঃ

উপকরণের নাম	ব্রয়লার মুরগরি খাদ্য উপাদানের মিশ্রণের হার (%)		লেয়ার মুরগির খাদ্য উপাদানের মিশ্রণের হার (%)		
	স্ট্রাটার (০-৩ সপ্তাহ)	ফিনিশার (৪-৮ সপ্তাহ)	স্ট্রাটার (০-৩ সপ্তাহ)	গ্রোয়ার (৪-১৮ সপ্তাহ)	ফিনিশার (১৮-৭২ সপ্তাহ)
গমভাঙ্গা	৩০.০০	২৮.০০	২৫.০০	২২.০০	২০.০০
ভুট্টা	২০.০০	১৯.০০	২৫.০০	২৫.০০	২৩.০০
মিহিকুড়া	১৮.০০	২৩.০০	১৮.৭৫	২৮.২৫	২২.৫০
তিলের খৈল	১০.০০	১০.০০	১২.০০	১০.০০	১০.০০
সয়াবিন মিল	৫.০০	৫.০০	-	-	-
ফিশমিল	১৫.০০	১২.০০	১৬.০০	১২.০০	১৪.০০
ভিটামিন প্রিমিক্স	০.২৫	০.২৫	-	০.৫০	-
সয়াবিন তৈল	১.০০	০.৫০	২.০০	-	২.০০
লবন	০.৫০	০.৫০	০.২৫	০.২৫	০.২৫
ঝিনুকের গুড়া	-	১.৫০	১.০০	২.০০	৮.০০
ডিএল মিথিউনিন	০.২৫	০.২৫	-	-	০.২৫

উৎস ঃ সমন্বিত মাছ চাষ, মৎস্য অধিদপ্তর।

উপরোক্ত উপাদান সমূহ উল্লেখিত অনুপাত অনুযায়ী একত্রে মিশিয়ে সুষম খাদ্য তৈরী করা যেতে পারে। তাছাড়া নিম্নবর্ণিত উপাদানের সংমিশ্রণেও উভয় ধরণের মুরগির সুষম খাবার তৈরী করা যায়।

খাদ্য উপাদান	ব্রয়লার মুরগির খাদ্য উপাদানের মিশ্রণের হার (%)	লেয়ার মুরগির খাদ্য উপাদানের মিশ্রণের হার (%)
গম বা ভুট্টা ভাঙ্গা	৫০.০০	৪৪.০০
অটো মিলের কুড়া	১৬.০০	২৭.০০
ফিশমিল	১৮.০০	১২.০০
তিলের খৈল	১৫.০০	১০.০০
ঝিনুকের গুড়া	০.২৫	৬.৫০
লবণ	০.৫০	০.২৫
ভিটামিন প্রিমিক্স	০.২৫	০.২৫

লেয়ার মুরগি এবং ব্রয়লার মুরগির খাবারের পরিমাণ এক রকম নয়। মাত্র ৮-৯ সপ্তাহেই ব্রয়লার মুরগি বিক্রিযোগ্য হয়। এ সময়কালে এদের নিম্নরূপ পরিমাণ খাবার সরবরাহ করা যেতে পারে।

বয়স (দিন)	প্রতি ব্রয়লারের দৈনিক খাবার (গ্রাম)	বয়স (দিন)	প্রতি ব্রয়লারের দৈনিক খাবার (গ্রাম)
১-৫	১০	৩১-৩৫	৮০
৬-১১	২০	৩৬-৪০	৯০
১১--১৫	৩২	৪১-৪৫	১০০
১৬-২০	৪৪	৪৬-৫০	১১০
২১-২৫	৫৮	৫১-৫৫	১১৫
২৬-৩০	৭০	৫৫-৬০	১২০

ডিম পাড়া বড় মুরগিকে প্রতিদিন ১১৫-১২৫ গ্রাম খাদ্য সরবরাহ করতে হয়। এছাড়া মুরগিকে প্রতিদিন কিছু পরিমাণ টাটকা শাকসব্জি খাওয়াতে হবে।

মুরগিকে খাওয়ানোর পদ্ধতি

প্রথম ১৫ দিন মুরগির বাচ্ছা যেহেতু খুব ছোট থাকে তাই এসময় থালা বা ট্রেতে খাবার দিতে হয়। ৫০টি মুরগি বাচ্চাকে একসঙ্গে একটি ট্রেতে খাবার সরবরাহ করা যায়। সেজন্য ট্রের আকার হবে ৬০ সেঃমিঃ × ৪৫ সেঃমিঃ। ১৫ দিন পর ৬০-৯০ সেঃমিঃ লম্বা ২৫ সেঃমিঃ চওড়া এবং ৭-৮ সেঃমিঃ উঁচু কাঠের বা টিনের পাত্রে খাদ্য দ্রব্য দিতে হয়। এ ধরণের একটি পাত্রে ২৪টি মুরগি অনায়াসেই দুদিক থেকে খাদ্য গ্রহণ করতে পারে। খাবার পাত্রের তিন ভাগের দুই ভাগ খাদ্য দ্বারা পূর্ণ করে দিতে হয়। লেয়ার মুরগির ক্ষেত্রে ১০-১২ দিন বয়সের বাচ্চার ঠোঁট কেটে দিতে হয়। এতে মুরগি ঠোকাঠুকি করে না এবং সমভাবে খাদ্য গ্রহণ করে এবং খাদ্যের অপচয় কম হয়। ব্রয়লার মুরগির ক্ষেত্রে ঠোঁট কাটার প্রয়োজন হয় না। খাদ্যের পাশাপাশি মুরগিকে নিয়মিত বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করতে হয়।

পরিচর্যা ও রোগ প্রতিরোধ

যথাসময়ে ভ্যাকসিন দিতে পারলে মুরগির সাধারণতঃ কোন রোগ দেখা দেয়না। স্থানীয়ভাবে উপজেলা পশুসম্পদ কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করে এ ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য জানা যায়। নিচে ব্রয়লার ও লেয়ার মুরগির ভ্যাকসিন দেয়ার একটি তালিকা প্রদান করা হলো ।

বয়স	ভ্যাকসিনের নাম	প্রয়োগ বিধি	রোগের নাম
১দিন	মারেক্স	২০০ সিসি দ্রাবকের সাথে মিশিয়ে ০.২ সিসি করে রানের মাংসে দিতে হবে	মারেক্স
৭ দিন	বিসিআর ডিভি	৬ সিসি পাতিত পানির সাথে মিশিয়ে ১ ফোটা করে উভয় চোখে দিতে হবে।	রাণীক্ষেত
১৫ দিন	গামবোরো	৩৬ সিসি ডাইলুয়েন্টের সাথে মিশিয়ে ১ ফোটা করে উভয় চোখে দিতে হবে।	গামবোরো
২১ দিন	বিসিআর ডিভি (বুষ্টার)	৬ সিসি পাতিত পানির সাথে মিশিয়ে ১ পোটা করে উভয় চোখে দিতে হবে।	রাণীক্ষেত
২৫ দিন	গামবোরো (বুষ্টার)	৩৬ সিসি পাতিত পানির সাথে মিশিয়ে পাখার পাতালা চামড়ার নিচে সুচের ম্যাধমে খোচা মেরে দিতে হবে।	গামবোরো
৩০ দিন	ফাউল পক্স	৩ সিসি পাতিত পানির সাথে মিশিয়ে ১ ফোটা করে উভয় চোখে দিতে হবে।	ফাউল কলেরা
৭৫-৮০ দিনের মধ্যে ১ম ডোজ, ১৫দিন পর বুস্টার ডোজ এবং ৫-৬ মাস অন্তর অন্তর নিয়মিত	ফাউল কলেরা ভ্যাকসিন	১ সিসি হারে রাণের চামড়ার নিচে দিতে হবে।	ফাউল কলেরা
৮০-৯০ দিন ২৬০-২৭০ দিন ৪৫০-৪৬০ দিন	বিসিআরডিভি	১টি টিকাবীজ ১০০ সিসি পাতিত পানিতে মিশিয়ে রানের মাংসে ১ সিসি করে ইনজেশন দিতে হবে।	
৩৭৫-৩৯০ দিন	ফাউল পক্স	৩ সিসি পাতিত পানির সাথে মিশিয়ে পাখার পাতালা চামড়ার নিচে সুচের ম্যাধমে খোচা মেরে দিতে হবে।	ফাউল পক্স

উৎস ঃ সমন্বিত মৎস্য চাষ, মৎস্য অধিদপ্তর।

উৎপাদন ও সম্ভাব্য আয়-ব্যয়

- মাছ ঃ মাছ ও মুরগির সমন্বিত চাষের ক্ষেত্রে পুকুরে কোন সার প্রয়োগ বা খাবার সরবারহ করা ছাড়াই হেক্টর প্রতি ৫-৬ টন মাছ উৎপাদন করা সম্ভব ।
- ব্রয়লার মুরগি ঃ মাছের সাথে ব্রয়লার মুরগির সমন্বিত চাষ করা হলে বছরে ৬ ব্যাচে হেক্টর প্রতি ৩০০০টি (৫০০×৬) মুরগি পালন করা সম্ভব। ৭-৮ সপ্তাহে প্রতিটি মুরগি ১.৫-২.০ কেজি পর্যন্ত হয়।
- লেয়ার মুরগি ঃ মাছের সাথে উন্নত জাতের লেয়ার মুরগির সমন্বিত চাষে শতকরা ৭০-৭৫ ভাগ ডিম অর্থাৎ প্রতিটি মুরগি থেকে বছরে ২৩০-২৭৫টি পযর্ন্ত ডিম পাওয়া যায়।
- আয় ব্যয় ঃ লেয়ার মুরগি ও মাছের একত্র চাষে এক বিঘা পুকুর হতে বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব নিম্নে দেয়া হলো।

ক) বিনিয়োগ		ব্যয়
পুকুরে বার্ষিক পত্তনী ও সংস্কার	১ বিঘা	২,০০০.০০
মুরগির ঘরের অবচিত মূল্য (ঘরের মুল্য ২৫০০.০০ টাকা আয়স্কাল দুই বৎসর)	-	১২৫০.০
মজুরী/ শ্রমিক (থোক)	১০০ কর্ম দিবস	৫,০০০.০০
বিবিধ	-	৫০০.০০
খ) উপকরণাদি		
চুন	৪৫কেজি	৩০০.০০
মুরগির বাচ্চা (লেয়ার ১দিন বয়স) পরিবহন ব্যয় সহ	৬৬টি	১১৮৮.০০
মুরগির খাদ্য প্রতিকেজি ১০.০০ টাকা হারে	২৩৭৬ কেজি	২৩,৭৬০.০০
মুরগি ও মাছের খাবার পাত্র ও পানির পাত্রের অবচিত মূল্য (পাত্রের মূল্য ৮০০.০০, আয়ুষ্কাল চার বৎসর।)		২০০.০০
ঔষধ		৫০০.০০
মাছের পোনা	১০০০টি	১০০০.০০
বিবিধ		
গ) প্রকৃত ব্যয় মূলধনের উপর ব্যাংক সুদ ১৩%		৩৫,৬৯৮.০০ ৪,৬৪০.০০
সর্বমোট ব্যয়		৪০,৩৩৮.০০
আয়ঃ		
ডিম প্রতিটি ৩ টাকা হারে	১২,০০০টি	৩৬,০০০.০০
মাছ প্রতি কেজি ৪৫ টাকা হারে	৬৫০ কেজি	২৯,২৫০.০০
মুরগি দুই বৎসর পালনের পর গড় মূল্য ৫০.০০ টাকা হারে	৬২ টি	৩,১০০.০০
সর্বমোট আয়		৬৮,৩৫০.০০
বিঘাপ্রতি মুনাফা (আয় ৬৮,৩৫০.০০- ব্যয় ৪০,৩৩৮.০০) টাকা = ২৮,০১২.০০ টাকা		
অর্থাৎ হেক্টর প্রতি লাভ প্রায় ২,১০,০০০ টাকা		

উৎস ঃ সমন্বিত মাছ চাষ , জাতীয় প্যাকেজ কর্মসূচীর মাধ্যমে মৎস্যচাষ উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

মাঠ পর্যায়ে অভিজ্ঞতার নিরিখে পুকুরে ব্রয়লার মুরগি ও মাছের একত্রে চাষে এক বিঘা (৩৩ শতাংশ) পুকুরে বিক্রয়যোগ্য ব্রয়লার মুরগি ও মাছের বার্ষিক উৎপাদন ব্যয় ও আয়ের খাত ঃ

হিসাবের খাত	পরিমান/ সংখ্যা	মূল্য (টাকা)
ক) বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা		
পুকুরে বার্ষিক পত্তনী ও সংস্কার	১ বিঘা	২,০০০.০০
মুরগির ঘরের অবচিত মূল্য (ঘরের মূল্য ২৫০০.০০ টাকা আয়ুস্কাল দুই বৎসর)	-	১২৫০.০০
মজুরী / শ্রমিক	১০০ কর্ম দিবস	৫,০০০.০০
খ) উপকরণাদি		
চুন	৪০ কেজি	২৪০.০০
ব্রয়লার মুরগির বাচ্চা (১দিনের) পরিবহন ব্যয় সহ	৩৯৬টি	৯,৯০০.০০
মুরগির খাদ্য প্রতি কেজি ১০.০০ টাকা হারে	১৭৮২ কেজি	১৭,৮২০.০০
ঔষধ	-	১০০.০০
মাছের পোনা	৮০০টি	৮০০.০০
বিবিধ	-	৫০০.০০
গ) প্রকৃত ব্যয় মূলধনের উপর সুদ ১৩%		৩৭৮১০.০০ ৪৯১৫.০০
সর্বমোট ব্যয়		৪২,৭২৫.০০
ব্রয়লার মুরগির মাংস প্রতিকেজি ৬০.০০ টাকা হারে (জীবন্ত)	৭৪০ কেজি	৪৪,৪০০.০০
মাছ প্রতিকেজি ৪৫.০০ টাকা হারে	৬৫০ কেজি	২৯,২৫০.০০
সর্বমোট আয়		৭৩,৬৫০.০০
বিঘা প্রতি প্রকৃত মুনাফা (আয় ৭৩,৬৫০.০০- ব্যয় ৪২,৭২৫.০০) টাকা = ৩০,৯২৫.০০ টাকা অর্থাৎ হেক্টর প্রতি প্রায় ২,৩২,০০০ টাকা		
বাৎসরিক মুনাফা হার = ৮২%		

উৎস ঃ সমন্বিত মাছ চাষ, জাতীয় প্যাকেজ কর্মসূচীর মাধ্যমে মৎস্যচাষ উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

হাঁস ও মাছের সমন্বিত চাষ

মাছের সাথে হাঁসের সমন্বিত চাষ মাছের সাথে মুরগির সমন্বিত চাষের অনুরূপ। এজন্য মাছ চাষের বিষয়টি আর আলোচনা না করে শুধুমাত্র হাঁসের লালন পালন নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো ঃ

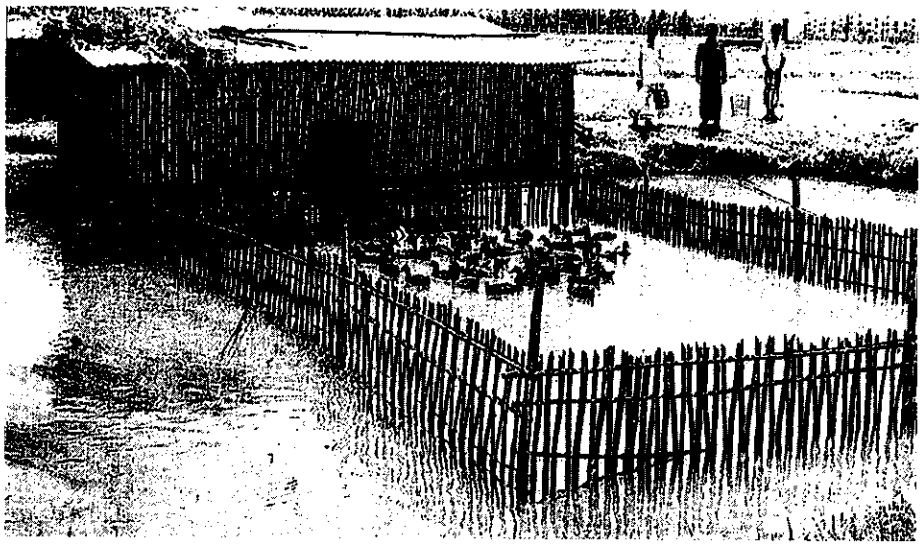

চিত্র ঃ ৬৮ হাঁস ও মাছের সমন্বিত চাষ

হাঁসের বিষ্টা ও অব্যবহৃত খাদ্য পুকুরে মাছের জন্য খাদ্য ও সারের কাজ করে। হাঁস ডুব দিয়ে মাটি থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে বলে পুকুরের তলায় ক্ষতিকারক গ্যাস বের হয়ে আসে এবং পানির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া হাঁস পানিতে সাঁতার কেটে পানিতে অক্সিজেন বাড়ায় এবং জলজ আগাছা এবং অচাষযোগ্য মাছ দমনে সাহায্য করে।

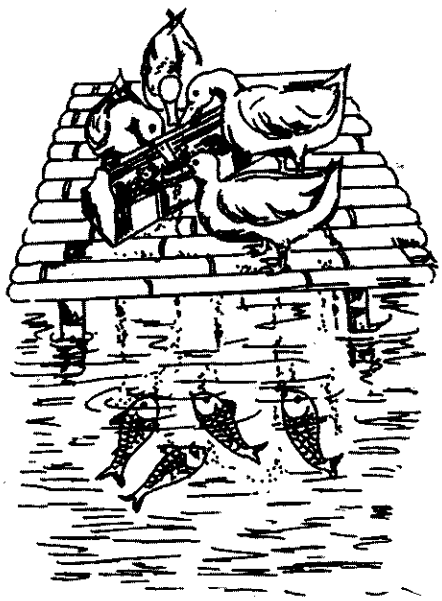

চিত্র ঃ ৬৯ হাঁসের বিষ্ঠা ও অব্যবহৃত খাদ্য পুকুরে মাছের জন্য খাদ্য ও সারের কাজ করে

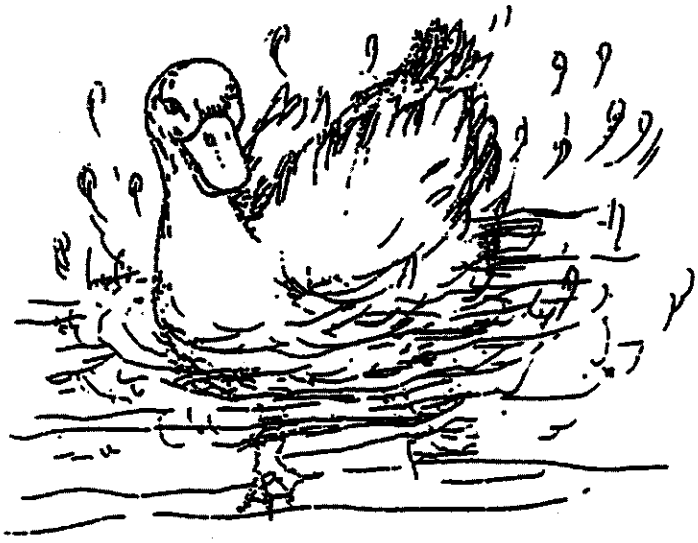

চিত্র ঃ ৭০ হাঁস সাঁতার কেটে পানিতে অক্সিজেন বাড়ায়

হাঁস যেহেতু দিনের অধিকাংশ সময় পানিতে বাস করে সেহেতু পুকুরের আশে পাশেই ঘর তৈরী বাঞ্ছনীয়। প্রতিটি হাঁসের জন্য ৩ বর্গফুট (০.৩ বর্গমিটার) স্থান হিসেবে ঘর তৈরী করা যেতে পারে। ঘরের উচ্চতা হবে ১.৫-২ মিঃ। মুরগির ঘরের ন্যায় হাঁসের ঘরও অনুরূপ জিনিষ দিয়ে তৈরী করা যায়। মেঝেতে বাঁশের একটি বাতা থেকে অন্যটির দূরত্ব হবে ২ সেঃমিঃ।

চিত্র ঃ ৭১ দুই ধরনের হাঁসের ঘর

হাঁসের জাত

হাঁসের মাংসের চেয়ে ডিমের চাহিদা বেশী। সেহেতু যে সকল জাতের হাঁস বছরের বেশী দিন ডিম দেয় চাষের ক্ষেত্রে সেগুলোকে বিবোচনা করতে হয়। এ ক্ষেত্রে খাকি ক্যাম্পবেল ও ইন্ডিয়ান রানার নির্বাচন যুক্তিযুক্ত, কেননা

- এরা বছরে প্রায় ২৫০-৩০০ ডিম দেয়।
- দেশের আবহাওয়া এবং পরিবেশ এদের বসবাসের উপযোগী।
- পাঁচ মাস বয়স থেকেই দুই আড়াই বছর ধরে এরা লাভ জনক ভাবে ডিম দেয়।

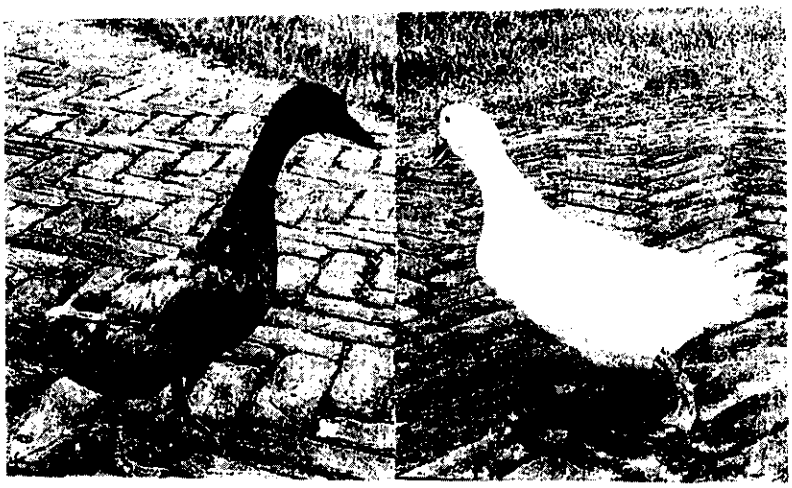

চিত্র ঃ ৭২ চাষ যোগ্য উন্নতজাতের বিদেশী প্রজাতির হাঁস

উন্নত জাতের হাঁস ও হাঁসের বাচ্চা প্রাপ্তি স্থান

- নারায়ণগঞ্জ হাঁস খামার
- দৌলতপুর হাঁস খামার

- এ ছাড়া রংপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী, দিনাজপুর, পাবনা, ফরিদপুর, টাংগাইল, কুমিল্লা, রাংগামাটি, কুষ্টিয়া, কিশোরগঞ্জ হাঁসের খামার থেকে প্রয়োজন অনুয়ায়ী হাঁস বা হাঁসের বাচ্চা সংগ্রহ করা যেতে পারে। নিজস্ব খামারেও বাচ্চা উৎপাদন করা যায়।

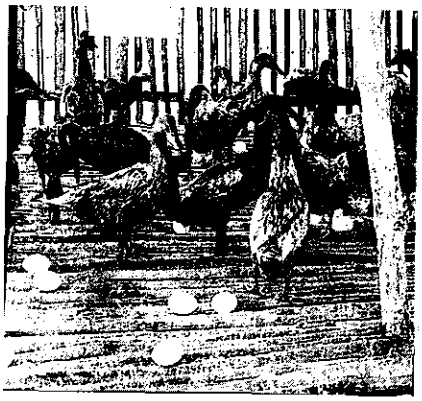

চিত্র ঃ ৭৩ হাঁসের ঘরে উন্নত জাতের ডিম পাড়া হাঁস

হাঁসের সংখ্যা

পুকুরের আয়তনের উপর নির্ভর করে হাঁসের সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। সাধারণতঃ প্রতি শতাংশের জন্য ২টি করে হাঁস পালন করা যেতে পারে। হাঁসের ডিম দিয়ে বাচ্চা ফুটাতে চাইলে পুকুরে ২-৩ টি পুরুষ হাঁস রাখা যেতে পারে ।

হাঁসের খাওয়া ও খাওয়ানো পদ্ধতি

হাঁস আশে পাশের পরিবেশ থেকে কিছু খাদ্য গ্রহণ করে থাকে তবে প্রয়োজনের তুলনায় তা অপ্রতুল। তাই হাঁসের জন্য নিয়মিত খাদ্য সরবরাহ করতে হয়। হাঁসের খাদ্য ও পানি আলাদা আলাদা পাত্রে দেয়া হয়। হাঁসকে কখনই শুষ্ক খাদ্য দেয়া উচিত নয়। সব সময় কিছুটা ভেজা খাদ্য দেয়া উচিত। খাদ্যে আমিষের পরিমাণ বাচ্চা হাঁসের ক্ষেত্রে শতকরা ২১ ভাগ ও ডিম দেয়া হাঁসের জন্য শতকরা ১৭-১৮ ভাগ থাকা উচিত। হাঁস সাধারণতঃ সকালে ডিম দেয় তাই সকালে ৯টার দিকে প্রথম খাবার দিয়ে পুকুরে ছাড়া যেতে পারে।

হাঁসের জন্য একটি সুষম খাদ্যের গঠন প্রাণালী দেয়া হলো

খাদ্যের উপাদান	শতকরা উপস্থিতির পরিমাণ বাচ্চা অবস্থায় (গ্রাম)	শতকরা উপস্থিতির পরিমাণ পরিণত অবস্থায় (গ্রায়)
আধা ভাংগা গম	৪৫.০০	৪৫.০০
চালের কুড়া	২৭.০০	৩০.০০
তিলের খৈল	১৪.০০	১২.০০
মাছের গুড়া	১২.০০	১০.০০
ঝিনুক চূর্ণ	১.৫	২.৫
ভিটামিন প্রিমিক্স	০.৫	০.৫
মোট	১০০ গ্রাম	১০০ গ্রাম

খাবারের পাত্র

খাদ্যের পাত্র গুলো কাঠের তৈরী এবং পানির পাত্র গুলো টিনের বা এলুমিনিয়াম তৈরী হতে পারে।

- সাধারণতঃ ২০টি হাঁসের জন্য ১ মিটার দৈর্ঘ্য, ১৫ সে.মি. প্রস্থ, ১৫সে.মি. গভীরতা মাপের পাত্রই যথেষ্ট ।
- পানি ও খাদ্য দ্রব্য আলাদা পাত্রে দিতে হয়।
- প্রতিদিন সকাল বেলা খাদ্য পাত্র গুলো পরিস্কার করা অতীব প্রয়োজন।

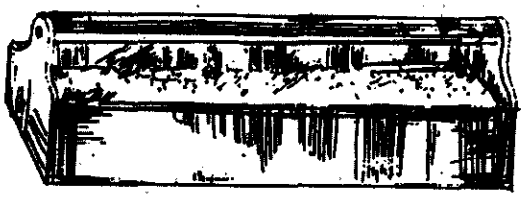

হাঁসের খাবার দানি

হাঁসকে পানি খাওয়ানোর পাত্র

চিত্র ঃ ৭৪

খাওয়ানো পদ্ধতি

সাধারণতঃ ১-৩ সপ্তাহ বয়সেই হাঁসকে দিনে ৪-৫ বার খাবার দিতে হয়। চার সপ্তাহ বয়সের হাঁসকে দিনে ৪-৫ বার খাবার দিতে হয়। চার সপ্তাহ বয়স থেকে ২-৩ বার এবং প্রাপ্ত বয়স্ক হাঁসকে দিনে ২ বার খাবার দিতে হয়। প্রাপ্ত বয়স্ক খাঁকি ক্যাম্পবেল ও ইন্ডিয়ান রানার প্রতিটি হাঁসকে প্রতিদিন ১১০ গ্রাম খাদ্য দেয়া প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত খাদ্য এরা পুকুর থেকে পেয়ে থাকে।

হাঁসের রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকার

- হাঁসের ঘর সবসময় শুকনা ও পরিস্কার রাখা উচিত ।
- ঘরের মেঝে এবং খাদ্য ও পানির পাত্র গুলো নিয়মিত পরিস্কার করে শুকিয়ে নিতে হবে।
- অসুস্থ হাঁসকে ঘর থেকে দ্রুত সরিয়ে ফেলতে হবে।
- হাঁস মারা গেলে মাটিতে গর্ত করে পুঁতে ফেলতে হবে।
- নিয়মিত প্রতিষেধক টিকা দিতে হবে।
- ৭ দিন বয়সে একবার এবং তারপর প্রতি দুমাস পর রোগ প্রতিষেধক টিকা দেয়া প্রয়োজন ।

চিত্র ঃ ৭৫ হাসকে প্রতিষেধক টিকা দেয়া হচ্ছে

হাঁসের সংক্রামক রোগ প্রতিকার

রোগের নাম	টিকা ও ঔষধের নাম	মাত্রা	লক্ষণ	ঔষধের প্রয়োগের
হাঁসের প্লেগ	হাঁসের প্লেগ ভ্যাকসিন		সাতার কাটতে চায় না, তৃষ্ণা বৃদ্ধিপায়, ঝিমায় নাকদিয়ে পানি ঝরে, সবুজ পায়খানা করে পালক এলোমেলে হয়ে পড়ে।	জন্মের ৩০ দিন বয়সে ১ম বার জন্মের ৫২ দিন বয়সে ২য় বার এবং প্রতি ৬ মাস অন্তর
হাঁসের কলেরা	হাঁসের কলেরা ভ্যাকসিন		পাতলা পায়খানা, ক্ষুধা কমে যাওয়া, মুখ দিয়ে পানি ঝরা, মাথা ও হাঁটু ফুলে যায়।	জন্মের ৬ সপ্তাহ বয়সে ১ম বার এবং প্রতি ৬মাস অন্তর
কৃমি রোগ	ইউভিলন এভিপার ইত্যাদি		ওজন কমে যায় , হাঁস দূর্বল হয়ে যায়।	৪ মাস বয়সে ১ বার এবং ৬ মাস অন্তর

সম্ভাব্য আয়-ব্যয়

৫০ শতাংশ আয়তনের একটি পুকুরে সমন্বিত মাছ ও হাঁস চাষের আয় ব্যয়ের খতিয়ান

খরচের খাত	টাকার পরিমাণ
মুলধন বিনিয়োগ	
পুকুর ইজারা	৩০০০.০০
১০০ হাঁসের জন্য ৩০০বর্গফুট বিশিষ্ট ঘর নির্মাণ খরচ	৫০০০.০০
হাঁসের খাদ্য ও ডিম পাড়া বাক্স বাবদ	৫০০.০০
মোট মূলধন বিনিয়োগ	৮,৫০০.০০
আবর্তক খরচ	
৬ মাস বয়সের ১০০টি হাঁস প্রতিটি ১০০টাকা হারে ১০০টি	১০,০০০.০০
মাছের জন্য পুকুর প্রস্তুত করণ	৫০০.০০
চার ইঞ্চি মাপের দেড় হাজার মাছের পোনা	১৫০০.০০
পোনা পরিবহন	২০০.০০
বিবিধ	৪০০.০০
একশত হাঁসের খাদ্য	
প্রতিটি হাঁসের জন্য দৈনিক ১৫০ গ্রাম খাদ্য আবশ্যক। হাঁস পুকুর থেকে আহরণ করবে ২৫ গ্রাম বাকী ১২৫ গ্রাম হিসেবে একশত হাঁসের এক বছরে (১২৫×১০০×৩৬৫) মোট ৪,৫৬৩ কেজি খাদ্য প্রয়োজন। প্রতি কেচি ১০/- টাকা হারে দাম (৪,৫৬৩×১০) টাকা	৪৫,৬৩০.০০
শ্রমিকের মজুরি বাবদ এক বছরে খরচ	৯,০০০.০০
হাঁসের ঔষধ ও আনুসাঙ্গিক খরচ	২০০০.০০
মোট আবর্তক খরচ	৬৯,২৩০.০০
মূলধনসহ মোট খরচ	৭৭,৭৩০.০০
মোট খরচের উপর সুদ	১০,১০৪.০০
সর্বমোট ব্যয়	৮৭,৮৩৪.০০

আয়

ডিম বিক্রি প্রতিটি হাঁস বছরে গড়ে ২৫০টি হিসাবে ১০০টি হাঁস থেকে (১০০×২৫০) = ২৫০০০টি ডিম পাওয়া যাবে, প্রতিটি ৩.০০ টাকা করে মোট (২৫,০০০×৩.০০)	৭৫,০০০.০০০
এক বছরে ১০০ হাঁসের বিক্রি মূল্য টাঃ ৬০.০০ করে (১০০×৬০) মোট	৬,০০০.০০
এক বছর পর (১৫%মৃত্যু বাদে) মাছের মোট উৎপাদন ১০০০কেজি, প্রতি কেজি ৪৫.০০ করে মোট (১০০০ × ৪৫) টাকা	৪৫,০০০.০০
মোট আয়	টাঃ ১,২৬,০০০.০০
নীট মুনাফা	
১ম বছরে মোট আয়	টাঃ ১,২৬,০০০.০০
১ম বছরে মোট ব্যয়	টাঃ ৮৭,৮৩৪.০০
১ম বছরে নীট আয়	টাঃ ৩৮,১৬৬.০০
২য় বছরে মোট আয় (৫% বৃদ্ধি)	১,৩২,০০০.০০
২য় বছরে মোট আয় (মূলধন ৮,৫০০/- বাদে)	৭৯,৩৩৪.০০
২য় বছর নীট মুনাফা	৫২,৯৬৬.০০

উৎস ঃ সমন্বিত মৎস্য চাষ, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

মাছ ও গবাদিপশুর সমন্বিত চাষ

বাংলাদেশের শতকর ৮০ ভাগ মানুষই গ্রামে বাস করে যাদের অধিকাংশই কৃষির উপর নির্ভরশীল। সনাতনী চাষ পদ্ধতি বহাল থাকার কারণে কৃষকগণ হালের বলদের মাধ্যমে এখনও চাষাবাদ করে যাচেছ। প্রায় প্রতিটি বাড়ীতেই কৃষকগণ গরু পুষে থাকেন। এছাড়া উন্নতজাতের গাভী লালন পালন করে কিংবা গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্প গ্রহণ করে অনেকেই বিকল্প কর্মসংস্থানের চেষ্টা করছে। পশুপাখির পরিত্যক্ত মলমূত্রের মধ্যে গরু থেকে উৎপাদিত মলমূত্রের পরিমাণ অনেক বেশী। একটি ৫০০ কেজি ওজনের গরু বছরে প্রায় ১.৫ টন গোবর ও ১.০ টন প্রস্রাব ত্যাগ করে। বিশেষজ্ঞদের মতে একটি এক হেক্টর আয়তনের পুকুরে মাছ চাষের জন্য তিনটি গরুই যথেষ্ট। চীনে এক গবেষণায় দেখা গেছে গোবর সার দিয়ে পরিচর্যা করা পুকুরে মাছের উৎপাদন গোবর ব্যবহার না করা পুকুর থেকে ২.২-৩.৫ গুণ বেশী।

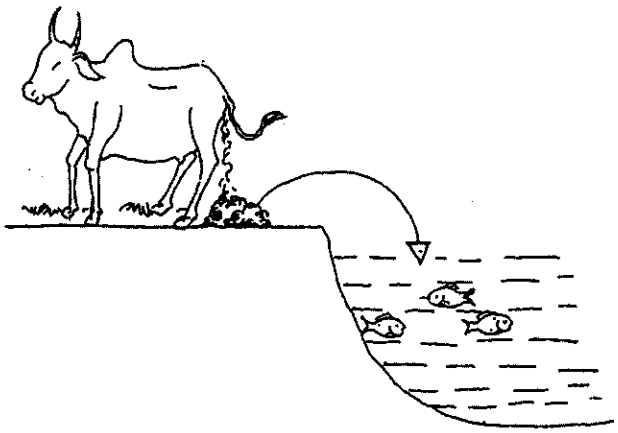

চিত্র ঃ ৭৬ গবাদি পশুর বিষ্ঠা মাছের পুকুরে সার ও প্রাকৃতিক খাদ্য যোগায়

উন্নতজাতের গরু প্রাপ্তিস্থান

উন্নতজাতের গরু লালন পালন করলে দুধ ও মাংস বেশী পাওয়া যায়, পাশাপাশি গোবরের পরিমাণও বেশী পাওয়া যায় যা পুকুর ব্যবস্থাপনার জন্য সহায়ক। আজকাল বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উন্নতজাতের গাভী দেখতে পাওয়া যায়। সরকারী খামারে উন্নতজাতের গাভী বা বাচ্চা পাওয়া যায়।

গরুর পরিচর্যা

গরুর নিয়মিত পরিচর্যা করতে হবে। গোয়াল ঘরে যাতে আলো বাতাস লাগে তার ব্যবস্থা করতে হবে। উন্নতজাতের গরুর জন্য সবুজ ঘাস খুব প্রয়োজন। সাধারণতঃ একটি গরুর জন্য ০.১৫-০.২০ একর ঘাসের জমিতে উন্নতজাতের যেমন নেপিয়ার, এ্যালিফেন্ট, সুদান, পারা প্রভৃতি ঘাস চাষ করতে হয়। ঘাস ছাড়াও উন্নতমানের শুষ্ক খাদ্যের সংস্থান রাখতে হবে। প্রতিদিন নিয়মিত গরু ঘরের গোবর, মূত্র পরিষ্কার করতে হবে। গরুর স্বাস্থ্য নিয়মিত পরীক্ষা করিয়ে নিতে হবে। গবাদিপশু রোগাক্রান্ত হলে নিকটস্থ পশু চিকিৎসক বা উপজেলা পশুসম্পদ কর্মকর্তার পরামর্শ নিতে হবে।

পুকুর ব্যবস্থাপনা

মাছ ও গবাদিপশুর সমন্বিত চাষের ক্ষেত্রে মাছ চাষের জন্য পুকুর ব্যবস্থাপনা হাঁস বা মুরগির সাথে মাছ চাষের ক্ষেত্রে যেমনটি হয়েছে এক্ষেত্রেও তেমনটি হবে।

দুইটি গরুর মল-মূত্রের দ্বারা এক একর পুকুরে মাছ চাষ করা সম্ভব। কেবল মাত্র সার প্রয়োগের মাধ্যমে চাষ করলে একর প্রতি প্রায় ২ মেঃ টন মাছ উৎপাদন সম্ভব। অর্থাৎ দুইটি গরু পালন থেকে অর্জিত লাভ ছাড়াও এক একর পুকুর থেকে ২ মেঃটন মাছ উৎপাদনের মাধ্যমে বাড়তি আয় সম্ভব।

পঞ্চম অধ্যায়

বাণিজ্যিক মাছ চাষ

বাংলাদেশে বাণিজ্যিক মাছ চাষের সম্ভাবনা

দেশে লক্ষ লক্ষ গ্রামীণ দীঘি-পুকুর আছে, যেখানে উন্নত সনাতনী কিংবা আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে মাছ চাষ করা হচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বেশ কম, তাছাড়া এসব বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো জলাশয়গুলোকে বাণিজ্যিক ভাবে উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে মাছ চাষের আওতায় আনা বেশ ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য। তাই দেশে বিদ্যমান লক্ষ লক্ষ দীঘি- পুকুরে কিছুটা উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিজ্ঞান সম্মতভাবে মাছের খামার প্রতিষ্ঠা করে তাতে উন্নত প্রযুক্তিতে প্রচুর মাছ উৎপাদন করা সম্ভব।

উন্নত প্রযুক্তি

দেশে গবেষণা ও মাছ চাষ উদ্যোক্তা কর্তৃক উদ্ভাবিত বিভিন্ন মাছ চাষ প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বিভিন্ন আকারের খামারে উৎপাদনশীলতা বহুগুণে বৃদ্ধি করা যায়। কার্পের মিশ্র চাষে বছরে হেক্টর প্রতি প্রায় ১১-১২ মেঃ টন, পাংগাসের চাষে ২২-২৫ মেঃ টন, স্বাদু পানিতে গলদা চাষে ১.০-১.৫ মেঃ টন চিংড়ি এবং শিং-মাগুর ৫-৬ মেঃ টন করা যায়। তবে বাণিজ্যিক খামারে এককভাবে মাছ চাষ করা ছাড়াও জমি ও পানির সর্বোচ্চ ব্যবহারের জন্য পোনার চাষ, গরু ও মুরগি পালন, শাক-সব্জির চাষ ইত্যাদি করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন মাত্রার উৎপাদনশীলতার প্রযুক্তিও রয়েছে। বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত কতিপয় প্রযুক্তির তালিকা নিচের সারণীতে দেয়া হলো।

প্রযুক্তি	উৎপাদনশীলতা (প্রতি হেক্টর)
কার্পের মিশ্রচাষ	১১-১২ মেঃ টন
পাংগাসের চাষ (বিদেশী)	২২-২৫ মেঃ টন
গিফ্‌ট জাতের তেলাপিয়ার চাষ	১২-১৫ মেঃ টন (বছরে ২টি চাষ)
দেশী শিং-মাগুরের চাষ	৫-৬ মেঃ টন
গলদা চিংড়ির চাষ	কার্প- ৫-৭ মেঃ টন গলদা- ১২০০-১৫০০ কেজি
মাছের পোনার চাষ (কার্প ও পাংগাস)	৫-৬ লক্ষ (৮.০-১০.০ সেঃ মিঃ আকারের)
জলাভূমি ও প্লাবনভূমির মাছ চাষ	১২০০-১৫০০ কেজি

জমি ও জলাভূমি

দেশে উর্বর কৃষি উপযোগী জমি মাছ চাষের জন্যও উপযোগী। কিন্তু উর্বর কৃষি উপযোগী জমির স্বল্পতা ও সীমাবদ্ধতা থাকায়, দেশে যে সব নিম্ন এলাকা রয়েছে যা অত্যন্ত স্বল্প সময়ের জন্য জলমগ্ন থাকে, কিংবা অন্য কোন কৃষি কাজে উপযুক্ত নয় এমন জমিতে বৃহদাকার বাণিজ্যিক খামার সৃষ্টি করা যায়। তবে চরাঞ্চলের বেলে জমি কিংবা পাহাড়ের উচু জমি মাছ চাষের উপযোগী নয়। বৃহদাকার চাষ উপযোগী প্লাবনভূমিতে যৌথভাবে পেন তৈরী করে বাণিজ্যিকভাবে মাছ চাষ করা যায়। এর ফলে ক্রমান্বয়ে দেশের লক্ষাধিক হেক্টরে এ চাষ পদ্ধতি প্রবর্তন করা সম্ভব। এ ধরনে খামারে ৬-৭ মাসের চাষ সময়কালে হেক্টর প্রতি ১০০০-১৫০০ কেজি মাছ উৎপাদন করা সম্ভব। এছাড়া বিদ্যমান গ্রামীণ দীঘি-পুকুরের মধ্যে যেগুলো বড় আকারের (কয়েক হেক্টর) সেগুলোতে বাণিজ্যিক মাছ চাষের কার্যক্রম হাতে নেয়া যায়। দেশে বর্তমানে স্বল্প সংখ্যক বড় বাণিজ্যিক খামার আছে। জরীপের মাধ্যমে উপযুক্ত এলাকাসমূহ চিহ্নিত করে খামার স্থাপন করলে দেশে ২-৩ হাজার বাণিজ্যিক মৎস্য খামার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব, যার প্রতিটির আয়তন গড়ে প্রায় ৮-১০ হেক্টর। অর্থাৎ দেশে প্রায় ৩০,০০০ হেক্টর আয়তনের খামার প্রতিষ্ঠা ৩-৫ বছরের মধ্যেই সম্ভব। প্রয়োজন কেবল পুঁজি, আগ্রহ ও প্রশিক্ষিত জনবল।

অর্থনৈতিক

বাণিজ্যিক খামারে উৎপাদনশীলতা বেশী হওয়ায় একই পরিমাণ জলাশয় থেকে সাধারণ মাছ চাষের চেয়ে কয়েক গুণ বেশী উৎপাদন পাওয়া যায়। এছাড়া নিবিড় ব্যবস্থার জন্য বেশী জনবলেরও প্রয়োজন পড়ে। এজন্য কর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি হয়।

উৎপাদন সম্ভাবনা

বাণিজ্যিক মাছ চাষের ক্রমান্বয় অথচ দ্রুত প্রসার ঘটাতে পারলে নতুন প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্যিক মৎস্য খামারে এবং প্লাবন ভূমিতে এবং বৃহদাকার দীঘিতে বাণিজ্যিক মৎস্য খামার থেকে বছরে ৩-৪ লক্ষ মেঃ টন মাছ উৎপাদন সম্ভব।

কারিগরী জনবল

দেশে বাণিজ্যিক মৎস্য খামার প্রসার লাভ করলে প্রশিক্ষিত কারিগরী জনবল প্রয়োজন হবে। তবে বর্তমানে দেশে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মৎস্য অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে কারিগরী জ্ঞান সম্পন্ন জনবল তৈরী হচ্ছে। সুতরাং বাণিজ্যিক মাছ চাষের ক্ষেত্রে এসব বেকার কারিগরী জনবল বিশেষ অবদান রাখতে পারবে।

বাণিজ্যিক খামারের বৈশিষ্টসমূহ

- বাণিজ্যিক খামারে কমপক্ষে ৮-১০ হেক্টর জলাভূমি থাকা প্রয়োজন। বেশী থাকলে আরো ভাল।
- বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত খামারে আতুর ও প্রতিপালন ও বড় মজুদ পুকুর থাকতে হবে।
- নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় উন্নতমানের বিভিন্ন প্রজাতির পোনা আতুর ও প্রতিপালন পুকুরে পালন করে ১২-১৫ সেঃ মিঃ আকার হলে চাষের জন্য মজুদ পুকুরে ছাড়তে হবে। আরো বড় আকারের পোনা ছাড়তে পারলে আরও ভাল।
- বাণিজ্যিক খামারের পুকুরগুলো একই জায়গায় থাকা বাঞ্চনীয় এবং বন্যামুক্ত স্থানে হতে হবে।

- খামারের যাতায়াতের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল হতে হবে।

- পুকুরে পানি সরবরাহ ও নিস্কাশনের ব্যবস্থা থাকতে হবে। পানি সরবরাহের জন্য গভীর নলকূপ বা প্রাকৃতিক জলাশয় থাকা প্রয়োজন। পানি নিস্কাশনের জন্য পাকা ড্রেন বা নালা থাকা দরকার।

- বাণিজ্যিকভাবে চাষের জন্য খাদ্য হিসেবে সুষম দানাদার খাবার প্রয়োগ করতে হবে। দানাদার খাবার তৈরীর জন্য নিজস্ব খাবার তৈরীর পিলেট মেশিন থাকা দরকার।

- বাণিজ্যিক চাষে অধিক ঘনত্বে পোনা মজুদ করতে হয় বিধায় পানিতে পর্যাপ্ত অক্সিজেন বজায় রাখার জন্য এ্যরেশনের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

- বাণিজ্যিক খামারে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং বিভিন্ন উপকরণ ও মাছ বিক্রির জন্য নিজস্ব পরিবহণ ব্যবস্থা অবশ্যই দরকার।

- বাণিজ্যিক খামারের নিকটবর্তী স্থানে বরফ কল থাকলে মাছের গুনগতমাণ বজায় রেখে দূরবর্তী স্থানে পরিবহণের সুবিধা হবে।

- বাণিজ্যিক খামারে মাছের খাবার মজুদের জন্য নিজস্ব গুদামঘর ও গোবর/মুরগির বিষ্ঠা মজুদের জন্য টিন বা ছনের সেড থাকতে হবে।

বাণিজ্যিক খামার স্থাপন

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে যেসব জায়গায় জমি বছরের অধিকাংশ সময় জলমগ্ন থাকে, বছরে একটি মাত্র ফসল ফলানো যায় এমন জায়গা বাণিজ্যিক ভাবে মাছ চাষের খামার নির্মানের জন্য নির্বাচন করা উচিৎ। কারণ উর্বর কৃষি জমির পরিমাণ কম থাকায়, তা নষ্ট না করে ফসলের জন্য কম গুরুত্বপূর্ণ অথচ মাছ চাষ উপযোগী, এমন জায়গায় খামার নির্মাণ করলে কম খরচে জমি ক্রয় ও খামার নির্মাণ করা লাভজনক হবে।

স্থান নির্বাচন

- খামারের জন্য নির্বাচিত স্থান বন্যামুক্ত হতে হবে বা পাড় স্বাভাবিক উঁচু করলে বন্যামুক্ত হয় এমন জায়গা নির্বাচন করতে হবে।
- খামারের আয়তন কমপক্ষে ১০ হেক্টর বা আরো অধিক জায়গা একই সীমানায় হতে হবে। এতে পুকুর নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা সহজ হবে।
- খামারে প্রবেশের জন্য উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকতে হবে। বড় রাস্তার কাছাকাছি হলে ভাল হয়। খামারের নিজস্ব রাস্তা থাকতে হবে।
- বিদ্যুৎ ব্যবস্থা থাকতে হবে। কারণ বিদ্যুৎ ছাড়া কোন খামারই বাণিজ্যিক ভাবে চলতে পারে না।
- টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকলে ভাল হয়।
- বাণিজ্যিক খামারের নিকটবর্তী স্থানে বরফ কল থাকতে হবে। তাহলে খামারে উৎপাদিত মাছ বাজারজাত করণ ও পরিবহণে মাছের গুণগত মান বজায় থাকে।
- বেশী উঁচু ও পাহাড়ী এলাকা বাণিজ্যিক মৎস্য খামারের জন্য উপযোগী নয়।

মাটির প্রকৃতি

- সারা বছর পানি ধারণ করে এমন জায়গা মাছের খামার নির্মাণের জন্য নির্বাচন করা উচিৎ।
- বেলেমাটি ও লাল মাটির জায়গা খামার নির্মাণের জন্য উপযোগী নয়। কারণ বেলে মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা নাই বললেই চলে আর লাল মাটি এসিডযুক্ত হওয়ায় এবং বৃস্টির ফলে পানি ঘোলা হয়ে যাওয়ায় খামার নির্বাচনে পরিহার করা উচিৎ।
- ভাল উর্বর ধানের জমি ব্যবহার না করাই উচিৎ কারণ বাংলাদেশে এধরনের জমির পরিমান কম। তাই দো-আশ,এটেল দো-আশ ও কিছুটা নিচু এলাকায় পুকুর খননঃ করলে খরচ কম পড়বে, পাড় ০.৫-১.০ মিটার উঁচু করলেই বন্যামুক্ত হবে এমন জায়গা বেছে নেওয়ায় ভাল।

পুকুর নির্মাণ

- খামারের মোট আয়তনের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন ধরনের পুকুর তৈরী করতে হবে। খামারে সারা বছর বড় আকারের পোনা মজুদের জন্য আতুর ও প্রতিপালন পুকুর এবং বাণিজ্যিক ভাবে চাষের জন্য মজুদ পুকুর তৈরী করতে হবে।
- পুকুরগুলি উত্তর দক্ষিণে লম্বালম্বি ও আয়তাকার হলে ভাল হয়। এতে প্রাকৃতিক বাতাস পুকুরের পানিতে লেগে ঢেউ সৃষ্টি করে এবং অক্সিজেন বৃদ্ধি পেতে পারে।
- আতুর ও প্রতিপালন পুকুরের আয়তন ০.১৪-০.৩০ হেঃ এবং গভীরতা ১-১.৫ মিটার হলে ভাল হয়।
- চাষকৃত বড় পুকুরের আয়তন ০.৫-১.০ হেক্টর বা আরো বড় হতে পারে ।পানির গড় গভীরতা ২.০-২.৫ মিটার রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।
- পুকুরের পাড়গুলো ১:২ হারে ঢালু হতে হবে এবং পাড় ঘাসে আবৃত থাকতে হবে যাতে বৃস্টিতে পাড় ভেংগে না যায়।
- পানি নিস্কাশনের জন্য খামারে পাকা ড্রেন বা নালার ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- প্রতিটি পুকুরে পানি সরবরাহের এবং নির্গমনের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

অবকাঠামো

- বাণিজ্যিক খামার পরিচালনার জন্য এবং খামারের নথিপত্র সংরক্ষণের জন্য অফিস ঘর থাকা দরকার।
- খাদ্য মজুদের জন্য গুদাম ঘর থাকতে হবে।
- খাদ্য তৈরীর জন্য নিজস্ব পিলেট মেশিন ও শেড থাকতে হবে।
- পাহারাদার ও অন্যান্য কর্মচারীদের থাকার জন্য গার্ড শেড থাকা প্রয়োজন।
- বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত খামারে পুকুরে অক্সিজেন সরবরাহের জন্য এরেটরের ব্যবস্থা করতে হবে।
- সর্বোপরি বাণিজ্যিক খামারের বিভিন্ন উপকরণ ও মাছ বিক্রির জন্য নিজস্ব যান থাকতে হবে।
- খামারে বরফ রাখার ঘর থাকতে হবে।
- খামারের নিরাপত্তার জন্য সীমানা প্রাচীর বা বেড়া থাকতে হবে।
- সমন্বিত খামারের ক্ষেত্রে মুরগির ঘর, গরুর গোয়ালঘর, হাঁসের ঘর, ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে।

বাণিজ্যিক মৎস্য খামার ব্যবস্থাপনা

কার্পের মিশ্রচাষ

কার্পের চাষ বলতে রুই জাতীয় বিভিন্ন প্রজাতির মাছ যেমন, রুই, কাতলা, মৃগেল, সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প, কমন কার্প, রাজপুঁটি ইত্যাদি মাছকে বুঝায়। এ সকল প্রজাতির মাছ রাক্ষুসে স্বভাবের নয়। খাদ্য নিয়ে প্রতিযোগিতা করে না, জলাশয়ে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে থাকে এবং খাদ্য গ্রহণের স্বভাব আলাদা।

বদ্ধ জলাশয়ে চাষোপযোগী মাছের মধ্যে রুই, কাতলা, মৃগেল ও কালিবাউশ দেশী প্রজাতির মাছ এবং সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প, কমন কার্প বিদেশী দ্রুত বর্ধনশীল কার্প একত্রে চাষ করলে অধিক ফলন হয়। বাণিজ্যিক ভাবে মিশ্র চাষ একটি বেশ লাভজনক প্রযুক্তি।

বাণিজ্যিক খামারে নির্মিত পুকুরগুলো মাছ চাষের উপযুক্ত স্থানে লাগসই ভাবে করা হয়ে থাকে। কার্প মাছ চাষের উদ্দেশ্যে পুকুরগুলো খনন করা হলে এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা হলে এগুলোতে সাধারনতঃ পোনা মজুদেরআগে মেরামতের প্রয়োজন পড়ে না। যেহেতু একটি খামারে পুকুরের রক্ষণাবেক্ষণ কাজ নিয়মিতভাবেই করা হয়ে থাকে। তবে নির্দিষ্ট খামার বহির্ভূত গ্রামীণ বড় আকারের পুকুরগুলোতে বাণিজ্যিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ করতে হলে পুকুর নির্বাচন, উন্নয়ন ইত্যাদির প্রয়োজন। এ বিষয়গুলো তৃতীয় অধ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পুকুর প্রস্তুতি

রাক্ষুসে মাছ ও অচাষযোগ্য মাছ দূরীকরণ

মাছ চাষ করার ফলে কোন ভাবে পুকুরে রাক্ষুসে বা অচাষযোগ্য মাছ ঢুকে যেতে পারে।পুকুর শুকিয়ে রাক্ষুসে মাছ ও অচাষযোগ্য মাছ দূর করতে হবে এবং বেশ কিছু দিন পুকুর শুকনো রাখতে পারলে ভাল হয়। পুকুরের তলায় অতিরিক্ত কাদা জমে থাকলে সরিয়ে ফেলতে হবে। তলদেশ সমান না থাকলে সমান করে নিতে হবে। এতে জাল টানা ও মাছ ধরা সহজ হবে। পুকুর শুকানোর সুবিধা না থাকলে রোটেনন প্রয়োগ করে রাক্ষুসে মাছ ও অচাষযোগ্য মাছ মেরে ফেলতে হবে। রোটেনন প্রয়োগ সবচেয়ে বেশী নিরাপদ। তাছাড়া বিকল্প হিসেবে টি সীড কেক, ব্লিচিং পাউডার এগুলোর যে কোনটি মাছ মারার জন্য প্রয়োগ করা যেতে পারে।

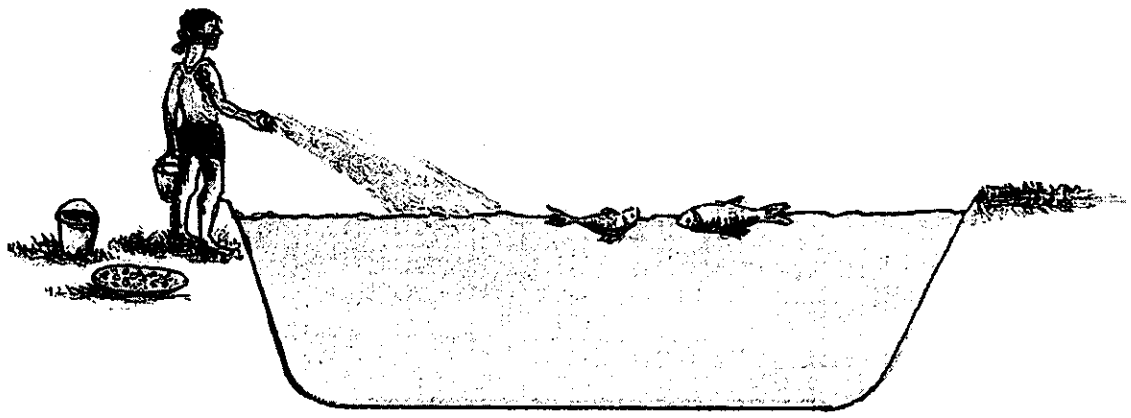

চিত্র ঃ ৭৭ পুকুরে রোটেনন প্রয়োগের মাধ্যমে রাক্ষুসে ও অচাষযোগ্য মাছ অপসারন

প্রতি শতাংশে প্রতি ৩০ সেঃ মিঃ গভীরতায় মাছ মারার ঔষধের প্রয়োগমাত্রা

বিষ/ঔষধের নাম	পরিমাণ	বিষ ক্রিয়ার মেয়াদ
রোটেনন	৩০ গ্রাম- ৩৫ গ্রাম	৭ দিন
টি সীড কেক	৩০০-৩৫০ গ্রাম	১০-১২ দিন
ব্লিচিং পাউডার	৫০০-৬০০ গ্রাম	৭-৮ দিন

পুকুর শুকানো ও বিষ প্রয়োগ সম্ভব না হলে বার বার জাল টেনে রাক্ষুসে ও অচাষযোগ্য মাছ সরিয়ে ফেলতে হবে। তবে নিবিড় মাছ চাষের জন্য পুকুর শুকিয়ে রাক্ষুসে মাছ দূর করে, পুকুরের অতিরিক্ত কাদা সরিয়ে ফেলা এবং পুকুরের তলা রৌদ্রে ফাটানো সবচেয়ে ভাল। এ কাজটি শুষ্ক মৌসুমে করাই ভাল। তখন পুকুরে পানি কম থাকে এবং খরচ ও কম হয়।

চুন প্রয়োগ

পুকুরের মাটি ও পানি জীবাণুমুক্ত রাখা এবং মাছের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির জন্য চুন ব্যবহার করা অত্যাবশ্যক। পুকুর শুকানো, ঔষধ প্রয়োগ বা জালটানার ১-২ দিনের মধ্যে পুকুরে শতাংশ প্রতি সাধারণতঃ ১ কেজি এবং লাল কিংবা অম্ল মাটির পুকুর হলে ২ কেজি হারে চুন ব্যবহার করতে হবে।

সার প্রয়োগ

চুন প্রয়োগের ১ সপ্তাহ পরে পুকুরে সার প্রয়োগ করতে হয়। পুকুরে জৈব ও রাসায়নিক উভয় প্রকার সার ব্যবহার করা যায়। তবে নতুন পুকুর এবং বেলে ও লাল মাটির পুকুরে জৈব সার অপেক্ষাকৃত কিছু বেশী মাত্রায় প্রয়োগ করতে হয়। পুকুর শুকনো থাকলে তলা হালকাভাবে চাষ দিয়ে পরিমাণ মত জৈব সার তলার সর্বত্র সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। পুকুরে পানি থাকলে একটি পাত্রে ১২ ঘন্টা জৈব সার ও টিএসপি সার ভিজিয়ে রেখে তার সাথে অন্যান্য রাসায়নিক সার মিশিয়ে পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। এক হেক্টর পুকুরের তলায় ৫০০ গ্রাম কপার সালফেট (তুঁতে) গুলে ছিটিয়ে দিলে পরে অবাঞ্চিত শেওলা হতে পারেনা।

চিত্র ঃ ৭৮ পুকুরে সার প্রয়োগ

পুকুর প্রস্তুতির জন্য শতাংশ প্রতি জৈব ও রাসায়নিক সারের প্রয়োগমাত্রা

সারের নাম		প্রয়োগমাত্রা (শতাংশ প্রতি)
জৈব সার	গোবর বা	৮ - ১০ কেজি
	মুরগির বিষ্ঠা বা	৪- ৫ কেজি
	কম্পোষ্ট	১২-১৫ কেজি
রাসায়নিক সার	ইউরিয়া	২০০-২৫০ গ্রাম
	টি.এস.পি	১০০-১২৫ গ্রাম
	এম.পি	৩০-৩৫ গ্রাম

সার প্রয়োগের পর পুকুরে পরিমাণমত পরিষ্কার পানি ঢুকাতে হবে। সার প্রয়োগের ৬-৭ দিনের মধ্যেই পুকুরে প্রচুর প্লাংকটন জন্মাবে এবং পানি সবুজ বা বাদামী রং এর হলেই পোনা মজুদ কুরতে হবে।

পোনা মজুদ

পোনা মজুদের পূর্বে পানিতে ঔষধের বিষক্রিয়া আছে কিনা তা নিরূপণ করেই পোনা মজুদ করতে হবে। পুকুরে একটি হাপা স্থাপন করে ২০-২৫ টি পোনা মাছ ছেড়ে ২৪ ঘন্টা পর্যবেক্ষণ করে যদি দেখা যায় যে, পোনা মাছ সুস্থ আছে তবেই পোনা ছাড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। আর যদি পোনা মাছ মারা যায় তবে ৪-৫ দিন অপেক্ষা করে পোনা ছাড়তে হবে।

চিত্র ঃ ৭৯ কাপ জাতীয় পোনা মজুদ করা হচ্ছে

কার্প জাতের বিভিন্ন প্রজাতির মাছ খাদ্যাভ্যাস ও প্রকৃতিগত কারণে পানির বিভিন্ন স্তরে খাদ্য খায় ও অবস্থান করে। এ সকল দিক বিবেচনা করে যাতে সার্বিক ভাবে মাছের খাদ্য প্রাপ্তি ও অবস্থান বন্টন সাঠিক হয়, সেভাবে মাছের প্রজাতি ও সংখ্যা নিরূপণ করতে হবে। হেক্টর প্রতি ১২-১৫ সেঃমিঃ আকারের পোনা আধা নিবিড় পদ্ধতিতে ১২,০০০-১৫,০০০টি এবং নিবিড় চাষ পদ্ধতিতে ২০,০০০টি মজুদ করা যেতে পারে। তবে এ পোনা একবারে না ছেড়ে পর্যায় ক্রমে ছাড়তে হয়। মাছ চাষের সফলতা নির্ভর করে ভাল জাতের সুস্থ-সবল ও সঠিক প্রজাতির বড় পোনা সঠিক সংখ্যায় মজুদের উপর।

শতাংশ প্রতি পোনা মজুদের হার নিম্নরুপ

পুকুরের স্তর	মাছের প্রজাতি	পোনার মজুদ সংখ্যা
উপরের স্তর	কাতলা	৮
	সিলভার বা বিগহেড কার্প	১৪
মধ্য স্তর	রুই	১৬
নীচের স্তর	মৃগেল/কালিবাউশ	৬
	মিরর/কমনকার্প	৮
সকল স্তর	গ্রাস কার্প	৩
	রাজপুঁটি	৫
গড় মজুদ		৬০ টি

মজুদ পরবর্তী পরিচর্যা

সার প্রয়োগ

পুকুরে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য না থাকলে মাছের বৃদ্ধি ভাল হয় না। পুকুরে দৈনিক বা সাপ্তাহিক ভিত্তিতে নিয়মিত সার ব্যবহার করা উচিৎ।

শতাংশ প্রতি সার প্রয়োগের দৈনিক বা সাপ্তাহিক মাত্রা নিম্নে দেখানো হলো

সারের প্রকার	মাত্রা (শতাংশ প্রতি, দৈনিক)	মাত্রা (শতাংশ প্রতি সাপ্তাহিক)
গোবর বা	৩০০-৩৫০ গ্রাম	২.০-২.৫০ কেজি
হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা বা	২০০-২৫০ গ্রাম	১.৫-২.০ কেজি
কম্পোষ্ট	৪০০-৫০০ গ্রাম	৩.০-৩.৫ কেজি
ইউরিয়া	৫-৭ গ্রাম	৪০-৫০ গ্রাম
টি.এস.পি	৩-৪ গ্রাম	২০-২৫ গ্রাম

পুকুরে জৈব্য ও রাসায়নিক সার মিশিয়ে পরিমাণমত ও নিয়মিত ব্যবহার করলে উৎপাদন বেশী পাওয়া যায়। মেঘলা ও বৃষ্টির দিন সার ব্যবহার করা যাবে না।

সম্পূরক খাদ্য

বাণিজ্যিক ভাবে মাছ চাষের জন্য প্রাকৃতিক খাবারের পাশাপাশি সুষম দানাদার খাবার প্রয়োগ করতে হবে। সুষম খাবার তৈরির জন্য ফিসমিল, সরিষার খৈল/তিলের খৈল, গমের ভূষি/ মিহি চাউলের কুড়া, আটা ও ভিটামিন-প্রিমিক্স যথাক্রমে ২০:৩০:৪৫:৪.৫:০.৫ হারে ভালভাবে মিশ্রন করে সুষম দানাদার পিলেট খাবার তৈরী করে দিনের নির্দৃষ্ট সময়ে মাছের মোট ওজনের শতকরা ৩-৫ ভাগ হারে দৈনিক খাবার দিতে হবে। সকাল ৮:০০-৯:০০ টার সময় মোট খাবারের ৬০ ভাগ এবং বিকার ৫:০০-৬:০০ ঘটিকায় ৪০ ভাগ মোট দুই বারে দিলে ভাল হয়। গ্রাসকার্প ও সরপুটির জন্য ক্ষুদে পানা, টোপা পানা, নেপিয়ার ঘাস পুকুরে দিতে হয়।

চিত্র ঃ ৮০ সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ

পর্যবেক্ষণ

প্রতিমাসে জাল টেনে মাছের স্বাস্থ্য ও রোগ-বালাই পরীক্ষা করতে হয়। মাঝে মাঝে হররা টেনে পুকুরের তলায় জমে থাকা গ্যাস বের করে দিতে হবে।

সতর্কতা অবলম্বন

বৃষ্টির দিনে অথবা মেঘলা আকাশে সকালের দিকে বা দিনের অন্যান্য সময় যদি মাছ পানির উপর ভেসে খাবি ক্ষেতে থাকে তাহলে বুঝতে হবে পুকুরে অক্সিজেনের অভাব হয়েছে। বাহির থেকে পরিষ্কার পানি সরবরাহ করতে হবে। পানিতে অক্সিজেনের অভাব হলে এরেশন ব্যবস্থা করতে হবে। মাঝে মাঝে রাত্রের বেলায় এরেটর দিয়ে পানিতে অক্সিজেন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে হয়।

রোগ প্রতিরোধ

আমাদের দেশে ক্ষত রোগের প্রাদুর্ভাবই বেশী লক্ষ্যণীয়। তাই এ রোগ প্রতিকারের জন্য সাধারণতঃ প্রতি শতাংশে ১ কেজি হারে চুন ও ১ কেজি হারে লবণ প্রয়োগ করলে সুফল পাওয়া যায়। অন্যান্য রোগের ক্ষেত্রে নিকটস্থ মৎস্য বিভাগীয় কর্মকর্তাদের পরামর্শ গ্রহণ করে ব্যবস্থা নেওয়াই ভাল। মাছের রোগ ও প্রতিকার দশম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

মাছ আহরণ ঃ ১০-১১ মাস চাষের পর সমস্ত মাছ আহরণ করে বাজারজাত করতে হবে।

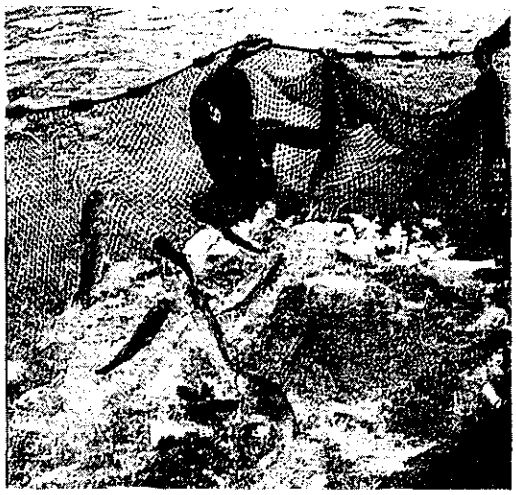

চিত্র ঃ ৮১ মাছ আহরণ

সম্ভাব্য আয়-ব্যয়

এক হেক্টর জলায়তনে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কার্পের মিশ্র চাষের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয়ের বিবরণ

সম্ভাব্য ব্যয়

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ	দর	মূল্য (টাকা)
১।	পুকুর প্রস্তুতি (পুকুর শুকানো/রোটেনন, চুন, সার ইত্যাদি)	১ হেক্টর	-	১৫,০০০.০০
২।	পোনা	১৫০০০টি (১০-১৫ সে.মি.)	১/-	১৫,০০০.০০
৩।	খাদ্য (সুষম দানাদার খাদ্য)	১৬০০০ কেজি	১৩/-	২,০৮,০০০.০০
৪।	রাসায়নিক সার ও জৈব সার	-	-	১০,০০০.০০
৫।	বিবিধ খরচ (শ্রমিক, জালটানা, বিদ্যুৎ, এরেশন ইত্যাদি)	-	-	৩০,০০০.০০
৬।	রাসায়নিক দ্রব্য	-	-	২,০০০.০০
৭।	প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়	-	-	২০,০০০.০০
সর্বমোট ব্যয়				**৩,০০,০০০.০০**

সম্ভাব্য আয়

এক বছরে চাষাবাদের পর ১১ মেঃ টন মাছ উৎপাদন হবে বলে আশা করা যায় এবং প্রতি টন ৪৫,০০০/- টাকা দরে বিক্রি করলে ১১ মেঃ টন মাছের বিক্রয় মূল্য দাঁড়ায়

১১ মেঃ টন × ৪৫,০০০/- =৪,৯৫,০০০/- টাকা
মুনাফা = (৪,৯৫,০০০ − ৩,০০,০০০)= ১,৯৫,০০০/- টাকা
প্রায় ২,০০,০০০/- টাকা

থাই পাংগাস চাষ

আমাদের দেশের ২০ লক্ষ পুকুর দীঘি আছে যেখানে থাই পাংগাস মাছ নিবিড়ভাবে চাষ করা যেতে পারে। বর্তমানে ব্যাপকভাবে এই মাছ পুকুরে চাষ করে ভাল ফল পাওয়া গেছে। বাণিজ্যিক চাষের জন্য এটি একটি উত্তম মাছ।

১৯৯০ সালে থাইল্যান্ড থেকে প্রথম থাই পাংগাসের পোনা সরকারী পর্যায়ে আমাদের দেশে আনা হয় এবং ১৯৯৩ সালে প্রথম কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদন শুরু হয়। বর্তমানে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী হ্যাচারিতে প্রচুর পরিমাণে পাংগাসের পোনা উৎপাদন হয়। ফলে পোনা সংগ্রহ সহজ হওয়ায় চাষীরা পাংগাস চাষে আগ্রহী হয়ে এগিয়ে আসছেন। আমাদের দেশের মৎস্য চাষীরা যে প্রজাতির পাংগাস চাষ আগ্রহী তাকে পাংগাসিয়ান সূচী বা থাই পাংগাস বলা হয়। বাংলাদেশের আবহাওয়া মাটি ও পানি থাই পাংগাস চাষের সম্পূর্ণ উপযোগী। বছরে এ মাছটি ১-১.৫ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে।

পাংগাস চাষের সম্ভাবনা

থাই পাংগাস চাষ বদ্ধ জলাশয়ে বিশেষ করে পুকুরে খুবই উপযোগী। শুধু পুকুরই নয়। থাই পাংগাস খাঁচায় চাষের জন্যও উপযোগী, কার্প জাতীয় মাছের তুলনায় কয়েকগুণ বেশী উৎপাদন ক্ষমতার কারনে পাংগাসই পারে দেশের প্রাণীজ আমিষের সম্পূর্ণ চাহিদা পূরণ করতে। আর এজন্য প্রয়োজন উন্নত পদ্ধতিতে নিবিড় পাংগাস চাষ সম্প্রসারণের জন্য ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা।

বর্তমানে অপরিকল্পিত ভাবে বহু বেসরকারী হ্যাচারিতে অজ্ঞতার কারনে ব্যাপক ছোট ব্রুড ও অন্তঃপ্রজনন (ভাই বোনের মধ্যে প্রজনন) সমস্যার কারনে উৎপাদিত পোনা পুকুরে চাষ করে সুষম দানাদার খাবার প্রয়োগ করেও ভাল ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে না বলে অনেক চাষী অভিযোগ করছেন। এ সমস্যাগুলি জরুরী ভিত্তিতে এখনই সমাধান করা উচিৎ এবং হ্যাচারি ব্যবস্থাপনার জন্য কিছু নীতিমালা তৈরী করে সুস্থ সবল উন্নত মানের পোনা তৈরীর জন্য এগিয়ে আসা উচিৎ।

মৎস্য বিশেজ্ঞদের অভিমত যে, চিংড়ির রোগ প্রতিরোধের জন্য চিংড়ির খামারগুলিতে ২/৩ বছর চিংড়ি চাষের পর ১/২ বছর অন্য মাছের চাষ করা উচিত। সেক্ষেত্রে পাংগাস চাষ অধিক লাভজনক কারন এ মাছটি মৃদু লবনাক্ততা সহ্য করতে পারে।

যে সব জলাশয়ে বা নিম্নাঞ্চলে ৪/৫ মাস পানি থাকে, সেখানেও পাংগাস চাষ করা সম্ভব। ১০-১৫ সেঃ মিঃ সুস্থ সবল পোনা ছেড়ে সুষম দানাদার খাদ্য প্রয়োগ করলে ৪/৫ মাসেই পাংগাস ৫০০-৬০০ গ্রাম হয়ে থাকে যা বাজারজাতের উপযোগী।

নিবিড় চাষ পদ্ধতির মাধ্যমে চাষ করে ১ বছরে সুষম দানাদার খাবারের প্রয়োগে হেক্টর প্রতি ২৪-২৫ মেঃ টন মাছ উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। সুষম আমিষযুক্ত দানাদার খাবার পানি পরিবর্তনের সুবিধা ও এ্যরিয়শন সুবিধাসহ আধুনিক প্রযুক্তিতে চাষ করলে একর প্রতি ৩০-৩৫ টনে উন্নীত করা সম্ভব।

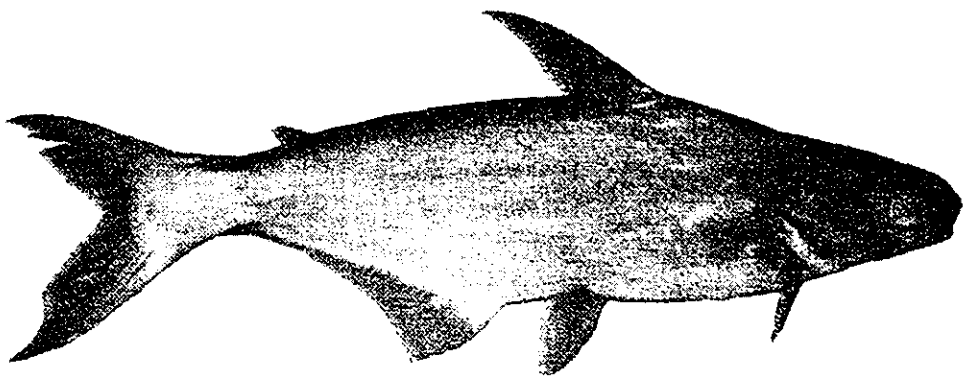

চিত্র ঃ ৮২ থাই পাঙ্গাস মাছ

বাণিজ্যিক ভাবে নির্মিত পাংগাসের খামারে নিম্নে বর্ণিত বৈশিষ্টগুলো বিবেচনায় আনতে হবে

- চাষের জন্য আয়তকার বন্যামুক্ত পুকুর হতে হবে। পুকুরের আয়তন ০.৫-১.০ হেক্টর হলে ভাল হয়।
- পানি গভীরতা ২-২.৫ মিটার হতে হবে।
- নিবিড় চাষের জন্য পুকুরের কাছাকাছি অগভীর বা গভীর নলকূপ থাকলে প্রয়োজনে পানি সরবরাহ করা যেতে পারে এবং বর্ষায় অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের সুবিধা থাকা প্রয়োজন।
- বানিজ্যিক ভাবে চাষের জন্য খামারের নিজস্ব আতুর ও প্রতিপালন পুকুরে ১০-১৫ সেঃমিঃ বা অধিক বড় আকারের পোনা তৈরী করে চাষের জন্য প্রস্তুত রাখতে হবে।

পুকুর প্রস্তুতি

আগাছা দমন

পুকুরে ভাসমান লতাপতা নিমজ্জিত ও নির্গমনশীল জলজ আগাছা কায়িক শ্রমের মাধ্যমে পরিস্কার করাই উত্তম আবার কতিপয় কার্যকর রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার করেও এ কাজটি করা যায়।

রাক্ষুসে ও অচাষযোগ্য মাছ দূরীকরণ

কোন কারণে বাণিজ্যি খামারের পুকুরেও রাক্ষুসে ও অচাষযোগ্য মাছ ঢুকতে পারে। পুকুরে রাক্ষুসে ও অচাষযোগ্য মাছ থাকলে মাছ চাষের সফলতা বিঘ্নিত হতে পারে। তাই পুকুর থেকে রাক্ষুসে ও আমাছা দুর করতে হবে। পুকুর সেচা সম্ভব না হলে ঘন ফাঁসের জাল টেনে ও এ কাজটি করা যায়। আবার কতিপয় কার্যকর রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করেও এ কাজটি করা যেতে পারে। তবে রোটেনন ব্যবহারই উত্তম।

প্রতি শতাংশ পুকুরে ৩০ সেঃ মিঃ পানির জন্য বিভিন্ন রাসায়নিক বিষ প্রয়োগের মাত্রা।

দ্রব্যের নাম	প্রয়োগ মাত্রা (প্রতি শতাংশে) ৩০ সেঃ মিঃ বা ১ ফুট পানির জন্য	বিষক্রিয়ার মেয়াদ
রোটেনন	৩০ গ্রাম	৭ দিন
টি সীড কেক	৩০০-৩৫০ গ্রাম	১০-১২ দিন
ব্লিচিং পাউডার	৫০০-৬০০ গ্রাম	৭-৮ দিন

পাড় ও তলা মেরামত

কয়েক বছর ব্যবহারে ফলে পুকুরের তলায় অতিরিক্ত কাঁদা জমে থাকলে তা তুলে ফেলতে হবে। পুকুর শুকানোর পর ভাঙ্গা পাড় ও অসমতল তলা মেরামত করতে হবে। পাড়ের জঙ্গল, ঝোপ ঝাড়, পরিস্কার করতে হবে। গাছের অপ্রয়োজনীয় ডালপালা কেটে ফেলতে হবে।

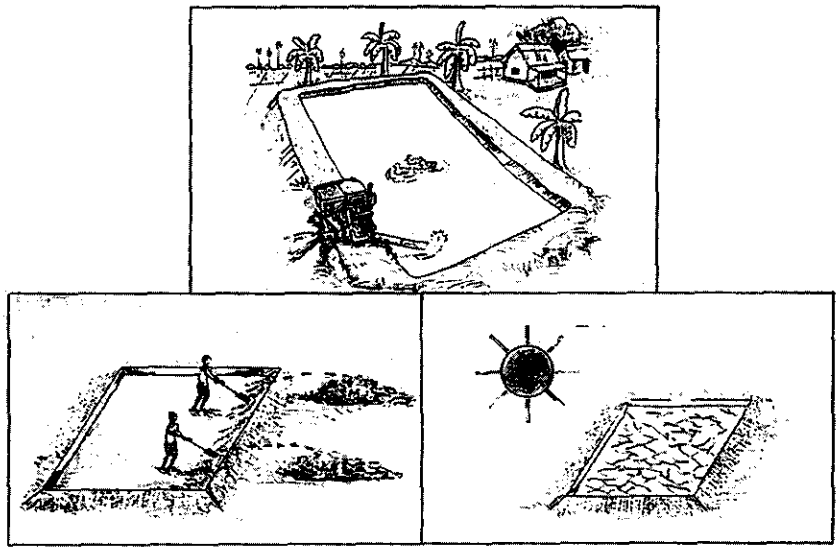

চিত্র ঃ ৮৩ পুকুর শুকনো এবং পাড় ও তলদেশ উন্নয়ন

চুন প্রয়োগ

মাটি ও পানির অবস্থা ভেদে চুন প্রয়োগের মাত্রার তারতম্য ঘটতে পারে। উর্বর দো-আঁশ মাটিতে শতাংশে ১ কেজি চুন এবং অনুর্বর লাল মাটিতে ২ কেজি চুন প্রয়োগ করতে হয়। চুন প্রয়োগে মাটি ও পানির অম্লত নিরপেক্ষ থাকে। বাজে গ্যাস ও রোগ বালাই নিয়ন্ত্রণ হয়।

সার প্রয়োগ

চুন প্রয়োগের ৭/৮ দিন পর সার হিসাবে জৈব ও অজৈব সার ব্যবহার করা হয়। জৈব সার হিসাবে গোবর, মুরগির বিষ্ঠা এবং অজৈব সার হিসাবে ইউরিয়া, টি.এস.পি, এম.পি ব্যবহৃত হয়।

পুকুর প্রস্তুতির সময় প্রতি শতাংশে জৈব ও অজৈব সার প্রয়োগের মাত্রা নিম্নে দেখানো হলো

সারের নাম		প্রয়োগ মাত্রা (শতাংশ)
জৈব সার	গোবর অথবা	৮-১০ কেজি
	মুরগির বিষ্ঠা বা	৪ -৫কেজি
	কম্পোষ্ট	১২-১৫ কেজি
অজৈব সার	ইউরিয়া	২০০-২৫০ গ্রাম
	টি,এস,পি	১০০-১২৫ গ্রাম
	এম,পি	৩০-৩৫ গ্রাম

সার প্রয়োগের ৫/৬ দিন পর পুকুরের পানিতে প্রাকৃতিক খাবার তৈরী হয়। প্রাকৃতিক খাবার তৈরী হলে পুকুরে পোনা ছাড়তে হবে।

পোনা মজুদ

পোনা মজুদের পূর্বে পানির বিষাক্ততা পরিষ্কারের জন্য পুকুরের পানিতে একটি হাপা টাঙ্গিয়ে তার মধ্যে ১৫-২০টি পোনা ছেড়ে ২৪ ঘন্টা পর্যন্ত পর্যবেক্ষন করতে হবে। এ সময়ের মধ্যে পোনা যদি সুস্থ্য থাকে ও মারা না যায় তা হলে বুঝতে হবে পানির বিষাক্ততা নেই। তখন পোনা ছাড়া যাবে, নতুবা আরো ৪/৫ দিন অপেক্ষা করতে হবে। প্রতি শতাংশে ১০-১৫ সেঃ মিঃ আকারের ১২৫টি পাংগাস ও ১০টি সিলভার কার্পের পোনা মজুদ করা যায়।

পাংগাস চাষের জন্য পোনা মজুদ বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অন্তঃপ্রজনন মুক্ত, সুস্থ সবল বড় সাইজের পোনা সঠিক মাত্রায় মজুদ করতে হবে। পোনা পরিবহন অত্যন্ত সতর্কতার সহিত করতে হয়।

খাদ্য প্রয়োগ

পাংগাস চাষে সারের ব্যবহার নাই বললেই চলে। নিবিড় চাষ পদ্ধতিতে চাষ করলে সুষম দানাদার খাদ্য যাতে ২৮-৩০% প্রাণীজ আমিষ থাকে তেমন খাদ্য দিতে হবে। পশুর রক্ত ও হাঁস-মুরগির নারীভূড়িতে পর্যাপ্ত পরিমান আমিষ আছে। তাছাড়া মাঝে মাঝে আংশিক পানি পরিবর্তনসহ এ্যরেশনের ব্যবস্থা করলে উৎপাদন হেক্টর প্রতি ৩০-৩৫ টন পর্যন্ত হতে পারে।

নিম্নের তালিকা অনুযায়ী খাদ্য উপাদান দিয়ে সুষম খাদ্য তৈরী করা যেতে পারে

খাদ্য উপাদান	পরিমান (%)	প্রোটিনের শতকরা হার (%)	তৈরী খাদ্যের প্রোটিনের পরিমান (%)	খাদ্যের মুল্য
মৎস্য চুর্ন	২৫	৫৬	১৪.০	৬.০০
সরিষার খৈল	৩০	৩০	৯.০	২.০০
গমের ভূষি	২০	১৫	৩.০	১.৫০
চাউলের কুড়া	২০	১২	২.৪	১.৫০
আটা	৫	১৮	০.৯	০.৭৫
ভিটামিন	০.৫			১.০০
	১০০		২৯.৩	১২.৭৫

উল্লেখিত ফর্মূলায় প্রতি কেজি খাদ্যের মূল্য ১২-১৩ টাকা এবং আমিষের পরিমান ২৯-৩০% খাদ্য রূপান্তর হার ১.৮ ঃ ১

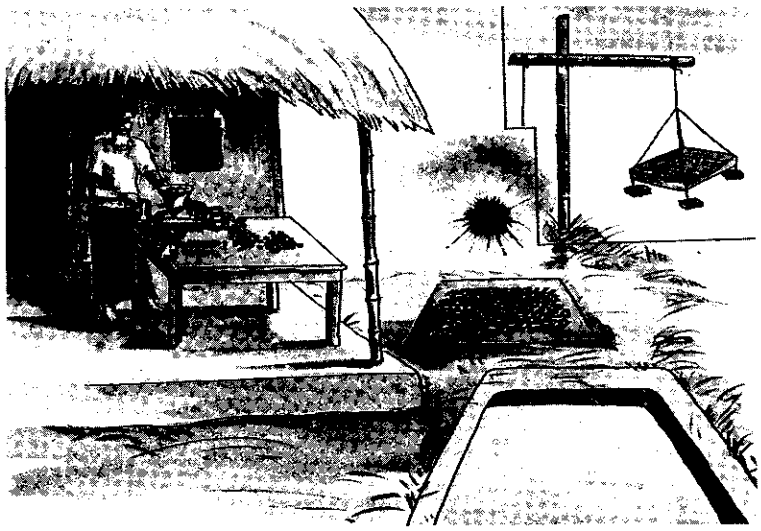

চিত্র ঃ ৮৪ পিলেট খাবার তৈরী

খাদ্যের পরিমাণ

খাদ্যের পরিমাণ নির্ভর করে মাছের দেহের মোট ওজনের উপর। প্রতি ১৫ দিন অন্তর নমূনায়নের মাধ্যমে পুকুরে মাছের গড় ওজন বের করে খাদ্যের পরিমান নির্ধারন করা যেতে পারে। পানির তাপমাত্রার উপর খাদ্য কম বেশী হতে পারে। পানির তাপমাত্রা ১১° সেলসিয়াস এর নীচে নেমে গেলে খাবার গ্রহণ বন্ধ করে দেয় এবং তাপমাত্রা ৩৫° সেলসিয়াস এর বেশী হলে খাদ্য গ্রহণ ৫০% কমে যায়।

ভাল ফলাফল লাভের জন্য পাংগাস মাছকে নিম্নের ছক অনুযায়ী খাদ্য দেয়া যেতে পারে

মাছের অবস্থা	প্রতিটি মাছের গড় ওজন	খাদ্য প্রয়োগের হার
পোনা বা চারা পোনা	৫০ গ্রাম পর্যন্ত	৮-১০%
বড় পোনা	৫১-১০০ গ্রাম পর্যন্ত	৬-৭%
ছোট মাছ	১০১-২০০ গ্রাম পর্যন্ত	৫-৬%
বড় মাছ	২০১-উর্ধ্বে গ্রাম	৩-৫%

পাংগাস মাছের গড় ওজনের সাথে খাদ্য প্রয়োগ হারের সম্পর্ক।

প্রতিদিন দু'দফা সকালে ও বিকালে নির্দিষ্ট সময়ে দৈনিক খাদ্য প্রয়োগের পরিমানকে দুইভাগে ভাগ করে সকালে ৫০% এবং বিকালে ৫০% নির্দিষ্ট স্থানে দিতে হবে।

চুন প্রয়োগ

নিবিড় চাষ পদ্ধতিতে পানির গুনাগুন ঠিক রাখা, রোগ প্রতিরোধ ও প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন তরান্বিত করার জন্য পুকুরে মাসিক ১৫০-২০০ গ্রাম চুন প্রতি শতাংশে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

পরিচর্যা

- মাঝে মাঝে হররা টেনে পুকুরের তলার বাজে গ্যাস সরিয়ে ফেলতে হবে।
- বাণিজ্যিক ভাবে চাষকৃত পুকুরে পানির গভীরতা ২-২.৫ মিটার রাখতে হবে।
- বর্ষায় অতিরিক্ত পানি নির্গমনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- প্রতি মাসে পুকুরের পানি ২০ ভাগ ফেলে নূতন পানি দিয়ে পুকুর ভরাট করতে হবে।
- পানিতে অক্সিজেনের মাত্রা সঠিক রাখার জন্য এ্যরেশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

রোগবালাই

পাংগাসের রোগ বালাই প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশী। তবু রোগ বালাই দেখা দিলে নিকটস্থ মৎস্য কর্মকর্তার পরামর্শ মত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।বিস্তারিত দশম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মাছ আহরণ ও বাজারজাতকরণ

পাংগাস মাছের চাষ করে আশানুরূপ ফলন ও মুনাফা লাভের ক্ষেত্রে যথাসময়ে মাছ আহরণ ও বাজারজাকরণের গুরুত্ব অপরিসীম। যেহেতু পাংগাস নিবিড় চাষ পদ্ধতিতে অধিক ঘনত্ব চাষ করা হয় সেহেতু ৫/৬ মাস পর যখন পাংগাসের গড় ওজন গড়ে ৫০০ গ্রাম হবে, তখনই ৪০% মজুদকৃত মাছ বাজারে বিক্রি করে দিতে হবে। এতে একদিকে যেমন পুকুরের অবশিষ্ট মাছ তাড়াতাড়ি বড় হওয়ার সুযোগ পাবে। তেমনি খরচ মিটানোর জন্যও বেশ কিছু টাকা হাতে আসবে। বছর শেষে যখন বাজারে মাছের দাম বেশী থাকে, তখন অবশিষ্ট সব মাছ বিক্রি করে নিতে হবে। পুকুরটি পুণরায় প্রস্তুত করে মাছ চাষের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

চিত্র ঃ ৮৫ মাছ আহরণ

সম্ভাব্য আয়-ব্যয়

এক হেক্টর জলায়তনে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পাংগাস চাষের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয়ের হিসাব

সম্ভাব্য ব্যয়

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ	দর	মূল্য (টাকা)
১।	পুকুর প্রস্তুতি (পুকুর শুকানো/রোটেনন, চুন, সার ইত্যাদি)	১ হেক্টর	-	১৫,০০০.০০
২।	পোনা-পাংগাস সিলভার কার্প	৩২,০০০টি ৩,০০০টি (১২-১৫ সে.মি.)	২.০০ ১.০০	৬৪,০০০.০০ ৩,০০০.০০
৩।	খাদ্য (সুষম দানাদার খাবার)	৪০,০০০ কেজি	প্রতি কেজি ১৪/-	৫,৬০,০০০.০০
৪।	শ্রমিক	১জন	-	১৮,০০০.০০
৫।	বিবিধ (বিদ্যুৎ এরেশন, জ্বালানী ও জালটানা ঔষধপত্র ইত্যাদি)			৪০,০০০.০০
৬।	প্রতিষ্ঠান ব্যয়			২০,০০০.০০
	সর্বমোট			**৭,২০,০০০.০০**

সম্ভাব্য আয়

এক বছর বাণিজ্যিক চাষাবাদে প্রতি হেক্টরে ৩.০ মেঃ টন সিলভার কার্প ও ২২.০ মেঃ টন পাংগাসসহ সর্বমোট ২৫.০ মেঃ টন মাছ উৎপাদন আশা করা যায়। প্রতি টন সিলভার কার্প ৩৫,০০০.০০ টাকা এবং প্রতি টন পাংগাস ৪৫,০০০.০০ টাকা দরে বিক্রয় করলে-

সিলভার কার্প ৩.০ মেঃ টন × ৩৫,০০০.০০	=	১,০৫,০০০.০০ টাকা
পাংগাস ২২.০ মেঃ টন × ৪৫,০০০.০০	=	৯,৯০,০০০.০০ টাকা
সর্বমোট আয় =		**১০,৯৫,০০০.০০ টাকা**

লাভ = (১০,৯৫,০০০.০০-৭,২০,০০০.০০) = ৩,৭৫,০০০.০০ টাকা মাত্র।

গিফ্‌ট জাতের তেলাপিয়ার চাষ

আমাদের দেশে অসংখ্য ছোট অথবা মাঝারি আয়তনের পুকুর রয়েছে। অতি অল্প খরচ ও সহজ ব্যবস্থাপনায় তেলাপিয়া মাছের পোনা উৎপাদন ও চাষ করে তা থেকে প্রত্যেক চাষী পরিবারেরর নিত্যদিনের মাছের চাহিদা ও চলার মতো অর্থের ব্যবস্থা করে নিতে পারেন।

তেলাপিয়া জাতের মোট তিনটি প্রজাতি বাংলাদেশে আমদানি করা হয়েছে। এদের মধ্যে চাষ উপযোগী হলো নাইলোটিকা এবং লাল তেলাপিয়া। সম্প্রতি বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট ফিলিপাইনস্থ ইকলাম থেকে "গিফ্‌ট জাত" আমদানি করে গবেষণার মাধ্যমে আরো উন্নত জাতে রূপান্তর করতে সমর্থ হয়েছে। এ গিফ্‌ট জাতের তেলাপিয়া অন্যান্য তেলাপিয়ার চেয়ে শতকরা ৫০-৬০ ভাগ বেশী উৎপাদনশীল বলে প্রমানিত। বাংলাদেশের যে সব ব্যক্তি মালিকানাধীন বড় বড় মৎস্য খামার রয়েছে, সে সব খামারে বাণিজ্যিকভাবে গিফ্‌ট জাতের তেলাপিয়া চাষ করে হেক্টর প্রতি বছরে ২টি ফসলের মাধ্যমে ১৫.০ মেঃ টন পর্যন্ত মাছ উৎপাদন সম্ভব হবে।

বাণিজ্যিকভাবে গিফ্‌ট জাতের তেলাপিয়া চাষের তিনটি পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে

- পুকুরে আধা নিবিড় বা নিবিড় চাষ পদ্ধতি
- পেনে বা ঘেরে চাষ পদ্ধতি
- খাঁচায় বা কেইজ চাষ পদ্ধতি।

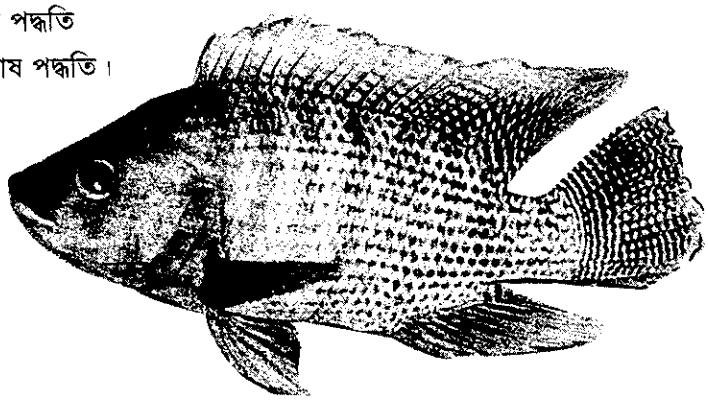

চিত্র ঃ ৮৬ গিফ্‌ট তেলাপিয়া

বাণিজ্যিকভাবে নির্মিত খামারে আধা-নিবিড় ব্যবস্থাপনায় গিফ্‌ট জাতের তেলাপিয়ার চাষ পদ্ধতি

বাণিজ্যিকভাবে চাষের জন্য পুকুর এক একর থেকে এক হেক্টর বা তার চেয়েও বড় হতে পারে। পানির গভীরতা ১ থেকে ১.৫ মিটার হলে ভাল হয়। পানি বদলের সুবিধা থাকতে হবে এবং অক্সিজেন সরবরাহের জন্য পুকুরে এ্যরেশনের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

গিফ্‌ট জাতের তেলাপিয়া চাষের সুবিধা

- উচ্চ ফলনশীল
- ৪-৫ মাসেই বিক্রয়যোগ্য হয়
- যে কোন খাবার খায়
- সহজে রোগাক্রান্ত হয়না
- সহজে পোনা উৎপাদন সম্ভব
- খেতে সুস্বাদু এবং বাজারে খুব চাহিদা।

পুকুর প্রস্তুতি

- সেচের মাধ্যমে পুকুর শুকিয়ে রাক্ষুসে মাছ ও অচাষযোগ্য মাছ সরিয়ে ফেলতে হবে।
- শুকানো সম্ভব না হলে ঘন মেসের জাল বার বার টেনে সব ধরনের রাক্ষুসে মাছ ও আমাছা ধরে ফেলতে হবে।
- রোটেনন প্রয়োগেও রাক্ষুসে মাছ মারা যায়।
- পুকুরের পাড় মেরামত ও তলার অতিরিক্ত কাঁদা সরিয়ে ফেলতে হবে।
- আগাছা ও ঝোঁপ-ঝাড় ও জলজ আগাছা কায়িক শ্রমের মাধ্যমে সরিয়ে ফেলতে হবে।
- প্রতি শতাংশে ১-২ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করতে হবে।
- চুন প্রয়োগের ১ সপ্তাহ পর শতাংশ প্রতি ৫-৭ কেজি গোবর বা ৩-৪ কেজি মুরগির বিষ্ঠার সাথে ১০০ গ্রাম ইউরিয়া, ১৫০ গ্রাম টি.এস.পি ও ৫০ গ্রাম এম.পি সার প্রয়োগ করতে হবে।

পোনা মজুদ

পুকুরে সার প্রয়োগের এক সপ্তাহ পর নিবিড় চাষ পদ্ধতিতে ৪-৫ সেঃ মিঃ আকারের হেক্টর প্রতি ৩৫,০০০-৪০,০০০টি পোনা মজুদ করা যায়।

চাষ ব্যবস্থাপনা

নিবিড় চাষ পদ্ধতিতে অধিক ঘনত্বে পোনা ছাড়া হয় বলে নিয়মিত পরিমান মত আমিষ জাতীয় খাদ্য প্রয়োগ করতে হয়। মাঝে মাঝে পুকুরের পানি আংশিক বদল করতে হয় এবং অক্সিজেন সরবরাহের জন্যএ্যারেশনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। মজুদ পুকুর থেকে মিহি ফাঁসের জাল দিয়ে অতিরিক্ত ক্ষুদে পোনা সরিয়ে ফেলতে হবে।

খাদ্য সরবরাহ

নিবিড় চাষ পদ্ধতিতে মাছের মোট ওজনের ৩-৫ ভাগ হারে সুষম আমিষ জাতীয় খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে। খাবার হিসাবে সরিষার খৈল ৩০%, গমের ভূষি ২৫%, চাউলের কুড়া ২৫% এবং ফিস মিল ২০% হারে মিশ্রন করে পিলেট আকারে দানাদার খাবার তৈরী করতে হবে। প্রতি ১০ দিন পর পর মাছের ওজন পরীক্ষা করে মাছের মোট ওজনের ৩-৫ ভাগ হারে মোট খাবারের পরিমাণ নির্ণয় করে দিনে ২ বার দিতে হবে। ১৫ দিন পর পর প্রতি শতাংশে ২/৩ কেজি পঁচা গোবর বা ১ কেজি হারে মুরগির বিষ্ঠা প্রয়োগ করা যেতে পারে। এভাবে চাষ করলে ৪-৫ মাসে প্রতিটি তেলাপিয়া ২০০-২৫০ গ্রাম হবে এবং বাজারে বিক্রি করা যাবে।

চিত্র ঃ ৮৭ পুকুরে খাদ্য প্রয়োগ

রোগ ও প্রতিকার

সাধারনতঃ তেলাপিয়ার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশী। তবে পানি দুষণ হলে বা পানির পরিবেশ খারাপ হলে রোগ-বালাই দেখা দিতে পারে। রোগ-বালাই দেখা দিলে প্রতি শতাংশে ১ কেজি হারে চুন দেয়া যেতে পারে। সর্বোপরি রোগ প্রতিকার ও ব্যবস্থাপনার জন্য নিকটস্থ মৎস্য কর্মকর্তার পরামর্শ মত ব্যবস্থা নিতে হবে। বিস্তারিত দশম অধ্যায়ে দেয়া আছে।

মাছের ফলন

নিবিড় ব্যবস্থাপনায় চাষ করলে বছরে ২টি ফলন করে হেক্টর প্রতি ২টি ফসলের মাধ্যমে ১৫.০ মেঃ টন পর্যন্ত উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

সম্ভাব্য আয়-ব্যয়

এক হেক্টর জলায়তনে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গিফট জাতের তেলাপিয়া চাষের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয়ের হিসাব

সম্ভাব্য ব্যয়

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ	দর	মূল্য (টাকা)
১।	পুকুর প্রস্তুতি (পুকুর শুকানো/রোটেনন, চুন, সার ইত্যাদি)	১ হেক্টর	-	১৫,০০০.০০
২।	পোনা- ২টি ফলনের জন্য	৭০,০০০ টি	০.৮০	৫৬,০০০.০০
৩।	খাদ্য (সুষম দানাদার খাদ্য)	১৮০০০ কেজি	প্রতি কেজি ১২.০০ টাকা	২,১৬,০০০.০০
৪।	রাসায়নিক সার ও গোবর		-	১৫,০০০.০০
৫।	শ্রমিক	১জন		১৮,০০০.০০
৬।	বিবিধ (বিদ্যুৎ এরেশন, জ্বালানী ও জালটানা ঔষধপত্র ইত্যাদি)			৩০,০০০.০০
৭।	প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়			১০,০০০.০০
সর্বমোট ব্যয়				**৩৬০০০০.০০**

সম্ভাব্য আয়

এক বছর বাণিজ্যিক চাষাবাদে প্রতি হেক্টরে গিফট জাতের তেলাপিয়া ২টি ফসলের মাধ্যমে ১৫.০০ মেঃ টন মাছ উৎপাদন করা সম্ভব। প্রতি মেঃ টন ৪০,০০০.০০ টাকা হিসাবে মোট আয় দাঁড়ায়।

১৫.০ মেঃ টন × ৪৫,০০০.০০ টাকা = ৬,৭৫,০০০.০০ টাকা

লাভ = (৬,৭৫,০০০.০০-৩,৬০,০০০.০০) টাকা = ৩,১৫,০০০.০০ টাকা।

বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের যে সব অঞ্চলে বড় বড় মৎস্য খামার রয়েছে, সে সব খামারে মাছ চাষের সাথে সাথে যদি সমন্বিত পদ্ধতিতে গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি , ফল-মূল, শাক-সবজি ইত্যাদি চাষ করা হয়, তাহলে একই জনশক্তি ব্যবহার করে কম খরচে অধিক উৎপাদন করে বেশী আয় করা সম্ভব।

বাণিজ্যিক মাছ চাষের অনেকগুলি প্রযুক্তির মধ্যে সমন্বিত মুরগি ও মাছ চাষ সমন্ধে নিম্নে আলোচনা করা হলো

সমন্বিত মাছ ও মুরগি চাষ

মাছের সাথে মুরগি চাষ করা যায়। কারণ মুরগি ও মাছ একত্রে চাষ করলে মাছের জন্য কোন সম্পূরক খাদ্য প্রদানের প্রয়োজন হয় না। এ পদ্ধতি লাভজনক। প্রতি হেক্টর আয়তনের পুকুরের জন্য ৫০০টি উন্নত জাতের মুরগি পালন করলে মাছের কোন ক্ষতি হয় না এবং কোন প্রকার খাদ্য ছাড়াই মাছ চাষ করা যায়। তবে বাণিজ্যিক ভাবে নির্মিত খামারে সমন্বিত মুরগি ও মাছ চাষের ক্ষেত্রে মুরগির সাথে সাথে পুকুরে মাছকেও সুষম দানাদার খাবার (মোট ওজনের ২-৩ ভাগ) প্রয়োগ করে অধিক উৎপাদন সম্ভব। নিম্নে সমন্বিত মাছ ও মুরগির চাষ পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো ঃ

চিত্র ঃ ৮৮ সম্মন্বিত মাছ ও মুরগি চাষ

চাষের বৈশিষ্ট্য

- মুরগির বিষ্ঠা একটি উৎকৃষ্ট সার। পুকুরের উপর ঘর তৈরী করে মুরগি পালন করতে হয় বলে কোন প্রকার সার ও মাছের জন্য কোন সম্পূরক খাদ্যের প্রয়োজন হয় না। মুরগির খাদ্য গ্রহনের সময় ছিটকে পড়া খাদ্যদ্রব্য ও উচ্ছিষ্ট সরাসরি পানিতে পড়ে। তবে নিবিড় খামার ব্যবস্থাপনায় মাছের মোট ওজনের ২-৩ ভাগ সুষম খাবার দিতে হবে।

- কিছু কিছু মাছ মুরগির বিষ্ঠা সরাসরি খাদ্য হিসেবে গ্রহন করে থাকে।
- পুকুরের উপর ঘর তৈরী করা হয় বলে মুরগির জন্য আলাদা কোন স্থান প্রয়োজন হয় না।
- পুকুরের পানির উপর মুরগির ঘর তৈরী করা হয় বলে মুরগির সাথে মাটির সংস্পর্শ থাকেনা। ফলে মুরগির রোগ-বালাই কম হয়।
- সমন্বিত মাছ ও মুরগি চাষে একই খামার থেকে মাছ, মাংস ও ডিম পাওয়া যায়। ফলে অধিক খাদ্য উৎপাদন এবং সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত হয়।
- এ পদ্ধতিতে অপেক্ষাকৃত স্বল্প বিনিয়োগে, কম শ্রমে ও অল্প সময়ে বেশী আয় করা যায়।

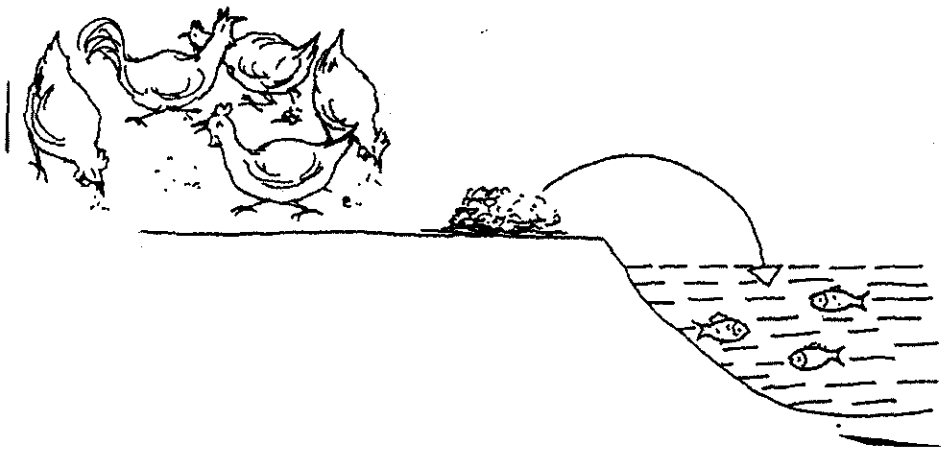

চিত্র ঃ ৮৯ মুরগির বিষ্ঠা কিছু কিছু মাছ সরাসরি খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে

মুরগির ঘর তৈরী

মুরগির ঘর পুকুরের উপর তৈরী করা হলে ঘরটি পাড় থেকে ৪-৫ ফুট ভিতরে করতে হবে। যাতে শুকনো মৌসুমে পানি কমে গেলেও মুরগির বিষ্ঠা ও উচ্ছিষ্ট খাবার সরাসরি পানিতে পরে। গ্রামীন পরিবেশে ঘরের চালা ছন দিয়ে তৈরী করা যেতে পারে। ঘরের মেঝ বাঁশের বাতা দিয়ে তৈরী করা যেতে পারে। এক বাতা থেকে অন্য বাতার দূরত্ব বা ফাঁক হবে ০.৫ ইঞ্চির কিছু কম বা ১ সেঃমিঃ। যাতে মুরগির বিষ্ঠা ও উচ্ছিষ্ট খাবার সরাসরি পানিতে পড়তে পারে। কিন্তু মুরগির পা যেন বাতার ফাঁকে ঢুকে না যায়। ঘরের মেঝে থেকে চালার উচ্চতা হবে ৪ ফুট। মেঝে থেকে ২ ফুট উঁচু করে বাঁশের শক্ত বেড়া দিয়ে ঘিরে দিতে হবে। বেড়ার উপরের ২ ফুট জালের মত কেচি বেড়া বা শক্ত নেট দিয়ে ঘিরে দিতে হবে। এতে ঘরে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস চলাচল করতে পারে। ছনের ঘরে শীত ও গ্রীষ্ম উভয় ঋতুতেই সহজে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

মুরগির জাত নির্বাচন

সমন্বিত মাছ চাষে মুরগির জাত নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাণিজ্যিকভাবে মুরগি পালন করা হয় দুটি উদ্দেশ্যে :

- মাংস উৎপাদনের জন্য।
- ডিম উৎপাদনের জন্য।

মাংস উৎপাদকারী মুরগির ব্রয়লার এবং ডিম পাড়ামুরগিকে লেয়ার বলা হয়।

বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গলদা চিংড়ির চাষ

পৃথিবীর গলদা চিংড়ি রপ্তানিকারক দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম সারিতে। বর্তমানে প্রায় ৯,০০০ হেক্টর জলাশয়ে গলদা চাষের প্রচলন রয়েছে। গলদার একক চাষ ছাড়াও অন্য মাছের সাথে মিশ্র চাষ ক্রমান্বয়ে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

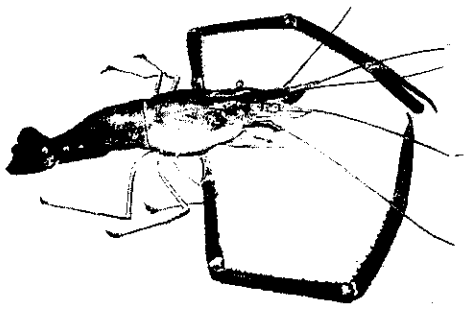

চিত্র ঃ ৯১ গলদা চিংড়ি

বাণিজ্যিক ভাবে গলদা চিংড়ির চাষ

ছোট বড় সব ধরণের পুকুরে গলদা চাষ করা যায়। তবে ১ হেক্টর আকারের পুকুর গলদা চাষের জন্য বেশী সুবিধাজনক। এসমস্ত পুকুরে ১ মিটার থেকে ১.২ মিটার গভীরতায় পানি থাকতে হবে। পুকুরে পৃথক পানি সরবরাহ ও নিস্কাশন ব্যবস্থা রাখতে হবে। পুকুরের বকচর এলাকা বা অন্য স্থানে জলজ ঘাস চিংড়ির আশ্রয়ের জন্য সুবিধা হয়। জলজ ঘাস অবশ্যই নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। এ ছাড়া পুকুরে বাঁশের কঞ্চি, পিভিসি পাইপ, প্লাষ্টিক খাচা, নারিকেলের শুকনা ডাল পালা ইত্যাদি আশ্রয়স্থল হিসাবে ব্যবহার করা যায়। গলদা চিংড়ি বাণিজ্যিক চাষের ক্ষেত্রে এরেটর ব্যবহার করতে হবে। এবং পানি পরিবর্তনের সুযোগ থাকতে হবে।

পুকুর প্রস্তুতি

পুকুর প্রস্তুতি পদ্ধতি রুই জাতীয় মাছের পুকুরের ন্যায়। অর্থাৎ প্রথমে পুকুরে ভালভাবে শুকিয়ে রাক্ষুসে ও অচাষযোগ্য মাছ দুর করতে হবে। অতিরিক্ত কাদা অপসারণসহ পুকুর শুকাতে হবে। প্রতি শতাংশে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করতে হবে। রাক্ষুসে ও অচাষযোগ্য মাছ দমনের জন্য রোটেনন প্রতি শতাংশে প্রতি ৩০ সেঃমিঃ পানির জন্য ৩০ গ্রাম হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। চুন প্রয়োগের ১ সপ্তাহ পরে সার প্রয়োগ করতে হবে। জৈব সার হিসাবে হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা বা গোবর ব্যবহার করা যায়। জৈব সার অবশ্যই পঁচা এবং কিছুটা শুকনা হতে হবে। হেক্টর প্রতি ২-৩ টন জৈব সার ব্যবহারের দুই দিন পর হেক্টর প্রতি ৫০ কেজি ১ : ১ হারে ইউরিয়া ও টি,এসপি সার এবং ৫ কেজি পটাশ সার ব্যবহার করতে হবে। পুকুরের পানিতে পর্যাপ্ত খাদ্য তৈরী হলে এবং পি,এইচ এর মাত্রা সঠিক থাকলে পোনা মজুদ করতে হবে।

পোনা মজুদ

নার্সারীতে প্রতিপালিত ৫-৮ সেঃ মিঃ কিশোর গলদা চিংড়ি পুকুরের পানির সাথে খাপ খাইয়ে সাবধানে পুকুরে ছাড়তে হবে। পুকুরে প্রতি বর্গমিটারে ৬-৭টি কিশোর পোনা মজুদ করা যায়। হ্যাচারি থেকে ১.৫ হইতে ২.০ সেঃ মিঃ আকারের পোনা আতুর পুকুরে প্রতি বর্গমিটারে ২০টি পোষ্ট লার্ভা মজুদ করে কমপক্ষে ১৫ দিন প্রতিপালনের পর মজুদ পুকুরে ছাড়া যায়। পানির উপরিস্তরের

প্লাংকটন নিয়ন্ত্রনে রাখার জন্য কিছু সিরভার কার্প ও কাতলা ছাড়া যেতে পারে। এ থেকে বাড়তি উৎপাদনও পাওয়া যায়। তাছাড়া মধ্যস্তরের রুইও ছাড়া যেতে পারে।

পরিচর্যা

পুকুরে পোনা মজুদের পর নিয়মিত পানির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। দুই-তিন মাস পর পুকুরে পানি বেশী সবুজ হয়ে গেলে অথবা চিংড়ির আচরণে কোন অস্বাভাবিকতা দেখা দিলে পানি পরিবর্তনের ব্যবস্থা নিতে হবে। পুকুরের পানির সর্বস্তরের খাদ্য ব্যবহারের জন্য চিংড়ির সাথে কার্প জাতীয় মাছ যেমন, কাতলা, সিলভার কার্প ও রুই একত্রে চাষ করা অধিক লাভজনক। পানিতে অক্সিজেন মাত্রা সঠিক পর্যায়ে রাখার জন্য এরেশনের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

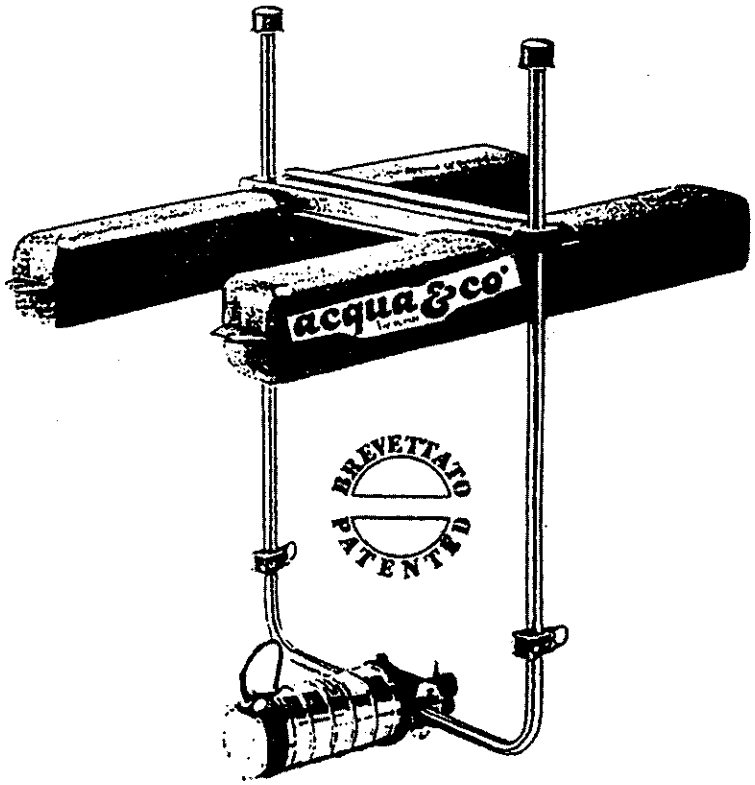

চিত্র ঃ ৯২ পানিতে অক্সিজেনের মাত্রা সঠিক রাখার জন্য এরেটর ব্যবহার জরুরী

খাদ্য প্রয়োগ

পুকুরে নিয়মিত খাদ্য পর্যবেক্ষণ পূর্বক খামারে প্রস্তুত খাদ্য বা বাজার থেকে সুষম পিলেট খাদ্য ক্রয় করে ব্যবহার করা যায়। পুকুরে চিংড়ির মড়কের প্রধান কারণ নিজ প্রজাতি ভক্ষণ, রাক্ষুসে প্রাণী এবং পানির গুণাগুণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাব। সে জন্য অবশ্যই মাঝে মাঝে পানি বদল করতে হবে। অক্সিজেন সরবরাহের জন্য এরেশনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। পোনা মজুদের ছয় মাস থেকেই প্রতি ১৫ দিন পর পর জাল দিয়ে চিংড়ি ধরতে হবে এবং বড় শক্ত চিংড়ি বিক্রি করে দিতে হবে। ছোট, দুর্বল চিংড়ি পুকুরে ছেড়ে দিলে তা পরবর্তীতে বড় হবার সুযোগ পাবে।

মাছের পরিচর্যা ও বৃদ্ধি পরীক্ষা

মাছের বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য ও রোগ-বালাই পরীক্ষার জন্যে প্রতিমাসে একবার জাল টেনে মাছ পর্যবেক্ষণ করা উচিত। সমন্বিত মাছ ও মুরগি চাষে ১০ মাসে নিম্নবর্ণিত হারে মাছের বৃদ্ধি হতে পারে :

ক্রমিক নং	মৎস্য প্রজাতি	সম্ভাব্য ওজন (দশ মাস)
১.	কাতলা	১.০-১.৫ কেজি
২.	সিলভার কার্প	১.০-১.৫ কেজি
৩.	রুই	৮০০-১০০০ গ্রাম
৪.	মৃগেল	৭০০-৮০০ গ্রাম
৫.	কার্পিও/মিরর কার্প	১.৫-২.০ কেজি
৬.	গ্রাস কার্প	২.০-২.৫ কেজি
৭.	রাজপুটি	৩০০-৪০০ গ্রাম

রোগবালাই

মাছের স্বাস্থ খুব খারাপ হলে অথবা মাছে রোগ দেখা দিলে নিকটস্থ মৎস্য বিভাগীয় কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। দশম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

মাছ ধরা ও বিক্রয়

সাধারণতঃ ১০ মাস চাষ করার পর প্রতিটি মাছের ওজন বিক্রির উপযোগী হয়। বছর চাষকৃত মাছ আহরণ করে বিক্রয়ের ব্যবস্থা নিতে হবে।

চিত্র ঃ ৯০ জাল টেনে মাছ ধরা হচ্ছে

সম্ভাব্য আয়-ব্যয়

এক হেক্টর জলায়তনে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সমন্বিত মাছ ও মুরগি চাষের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয়ের হিসাব

সম্ভাব্য ব্যয়

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ	দর	মূল্য (টাকা)
১।	মুরগির ঘর তৈরী	এক বছরের জন্য	-	২০,০০০.০০
২।	মুরগির ১ দিনের বাচ্চা	৫০০টি	২৮.০০	১৪,০০০.০০
৩।	মুরগির খাদ্য	১৫০০০ কেজি	প্রতি কেজি ১২.০০ টাকা	১,৮০,০০০.০০
৪।	মুরগির ঔষধ পানির পাত্র ইত্যাদি			১০,০০০.০০
৫।	পুকুর প্রস্তুতি (পুকুর শুকানো/রোটেনন, চুন, সার ইত্যাদি)	১ হেক্টর	-	১৫,০০০.০০
৬।	মাছের পোনা	১১,০০০টি	১/-	১১,০০০.০০
৭।	শ্রমিক	১জন	-	১৮,০০০.০০
৮।	মাছের খাবার	৪,০০০ কেজি	প্রতি কেজি ১০/-	৪০,০০০.০০
৯।	বিবিধ (বিদ্যুৎ এরেশন, জ্বালানী ও জালটানা ঔষধপত্র ইত্যাদি)			২৪,০০০.০০
১০।	প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়			১৮,০০০.০০
	সর্বমোট ব্যয়			**৩,৫০.০০০.০০**

সম্ভাব্য আয়

ডিম ৮০,০০০টি × ২.২৫ টাকা = ১,৮০,০০০/-

মুরগি ৪৫০টি × ১০০.০০ টাকা = ৪৫,০০০/-

মাছ ৮,০০০ × কেজি ৪৫.০০ টাকা = ৩,৬০,০০০/-

সর্বমোট আয় = ৫,৮৫,০০০.০০ টাকা

লাভ = (৫,৮৫,০০০.০০-৩,৫০,০০০.০০) টাকা = ২,৩৫,০০০.০০ টাকা মাত্র।

ব্রয়লার মুরগির জাত

- সেভার ষ্টারবো-১৫
- হার্বার্ড
- রস ইত্যাদি

লেয়ার মুরগির জাত

- ষ্টার ক্রস
- ইছাব্রাউন
- হাইসেক্স
- হোয়াইট লেগহর্ণ ইত্যাদি।

মুরগির সংখ্যা

মুরগির সংখ্যা নির্ভর করে জলাশয়ের আয়তনের উপর। প্রতি শতকে ২ টি হারে মুরগি পালন কররে মাছ চাষের জন্য কোন সার প্রয়োগ বা খাদ্য প্রয়োজন হয় না। উল্লেখিত হারে হেক্টর প্রতি ৫০০টি মুরগি পালন করা যায়। পুকুরের পাড়ে মুরগি পালন করা হলে ঘরের আকার অনুযায়ী যে কোন সংখ্যক মুরগি পালন করা যায়। তবে সেক্ষেত্রে পুকুরে পরিমানমত মুরগির বিষ্ঠা দিতে হবে। ১ দিনের মুরগির বাচ্চাকে ২৮ দিন পর্যন্ত ৯৫°-৮৫° ফাঃ এবং ১৫ দিন থেকে ২৮ দিন পর্যন্ত ৮৫°-৭৫° ফাঃ তাপমাত্রার প্রয়োজন পড়ে।মুরগিকে সর্বদা বিশুদ্ধ পানি দিতে হবে এবং ঘরটি পরিষ্কার রাখতে হবে। মুরগির ঘরে যাতে আলো-বাতাস প্রবেশ করতে পারে তার দিকে সর্বদা দৃষ্টি রাখতে হবে।

মুরগির সুষম খাবার

মুরগি কে সর্বদা ভাল সুষম খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। নিম্নে মুরগির বয়স অনুসারে একটি সুষম রেশনের তালিকা দেয়া হলো :

ক্রমিক নং	খাদ্য উপকরণের নাম	(০-৮) সপ্তাহ	(৯-১৭) সপ্তাহ	(১৮-২৮) সপ্তাহ
		%	%	%
১.	গম ভাঙ্গা/ভুট্টাভাঙ্গা	৪৮.০	৪৫.০	৪৪.০
২.	অটো কুড়া/ঢেঁকিছাটা চালের কুড়া	২০.০	২৪.৫	২৫.০
৩.	শুটকী মাছের গুড়া	১৬.০	১৫.০	১২.০
৪.	তিলের খৈল	১৪.০	১৩.০	১১.০
৫.	ঝিনুকের গুড়া	১.৫	২.০	৭.৫
৬.	লবন	০.৫	০.৫	০.৫
	সর্বমোট :	**১০০%**	**১০০%**	**১০০%**

১০০ কেজি মিশ্রিত খাদ্যের মধ্যে এমবাভিট জিএস ১৭ সপ্তাহ পর্যন্ত ২৫০ গ্রাম এবং ১৮ সপ্তাহ হতে এমবাভিট 'এল' ২৫০ গ্রাম উত্তমরূপে মিশ্রিত করতে হবে।

মাছ চাষ পদ্ধতি

খুবই ছোট আকারের পুকুর সমন্বিত মাছ ও মুরগি বাণিজ্যিক চাষের ক্ষেত্রে তেমন উপযোগী নয়। এ ক্ষেত্রে পুকুরের আয়তন নূন্যতম ১ হেক্টর হওয়া উচিত। মাছ ও মুরগির সমন্বিত মাছ চাষ পদ্ধতি একই ধরণের। এজনন্যে পুকুর প্রস্তুতি অভিন্ন। তবে মাছের

প্রজাতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে কিছুটা তারতম্য হয়। নিবিড় মাছ চাষ ব্যবস্থাপনায় মাছের মোট ওজনের ২-৩ ভাগ সুষম দানাদার খাবার, পুকুরের পানি আংশিক বদল ও এরেশনের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

পুকুর প্রস্তুতি

- পুকুর প্রস্তুতি বলতে প্রধানতঃ পুকুরে মাছের জন্যে যে সমস্ত ক্ষতিকারক প্রাণী বা বস্তু থাকে সেগুলো অপসারণ বা ধ্বংস করে পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নয়ন, চুন দ্বারা মাটি ও পানি শোধন এবং মাছের জন্যে প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরীকে বুঝায়।
- পুকুরের পানি শুকানোর সুবিধা থাকলে প্রথমেই পুকুরের পানি অপসারণ করে পুকুর হতে রাক্ষুসে মাছ এবং বাজে মাছ সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে ফেলতে হবে।
- পুকুরের পানি শুকানোর সুবিধা না থাকলে জাল টেনে অথবা বিষ প্রয়োগ করে রাক্ষুসে বা বাজে মাছ ধ্বংস করে ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে। রাক্ষুসে বা বাজে মাছ ধ্বংস করার জন্যে প্রতি শতাংশে প্রতি ফুট পানির জন্যে ৩৫ গ্রাম রোটেনন ব্যবহার করা যেতে পারে।
- পুকুর হতে পানি শুকানোর পর বিঘা প্রতি ৩৩ কেজি চুন পুকুরের তলদেশে ছিটিয়ে দিতে হবে। পুকুরের পানি শুকানো সম্ভব না হলে বিঘা প্রতি ৪৫ কেজি চুন পানিতে গুলে সারা পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে।
- চুন দেওয়ার ৭-৮ দিন পর পুকুরে জৈব ও অজৈব সার প্রয়োগ করে প্রাকৃতিক খাবার তৈরী করতে হবে।
- সার প্রয়োগের ৪-৫ দিন পর পুকুরে মাছের পোনা বড় সাইজে ১২-১৫ সে.মি. আকারের ছাড়তে হবে।

বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ছাড়ার হার ও ঘনত্ব

হেক্টর প্রতি ১১,০০০টি ১০-১৫ সেঃমিঃ আকারের পোনা ছাড়া যেতে পারে। নিম্নে বিভিন্ন প্রজাতির পোনা ছাড়ার আনুপাতিক সংখ্যা দেওয়া হলো :

ক্রমিক নং	মাছের জাত	প্রতি শতকের সংখ্যা
১.	কাতলা/বিগহেড	৪ টি
২.	সিলভার কার্প	১৫ টি
৩.	রুই	১০ টি
৪.	কার্পিও/মিরর কার্প	৫ টি
৫.	গ্রাস কার্প	২ টি
৬.	মৃগেল	৮ টি
	মোট	**৪৪ টি**

- এর সাথে অতিরিক্ত রাজপুটি প্রতি শতাংশে ২০ টি পোনা ছাড়া যেতে পারে।
- গ্রাস কার্পকে প্রতিদিন খাদ্যের জন্যে পুকুরে কচি ঘাস বা ক্ষুদে পানা সরবরাহ করতে হবে।

মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা

পোনা ছাড়ার পর পানিতে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা, পানির গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণ, মাছের বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা ইত্যাদি কাজগুলো নিয়মিত করতে হবে। সমন্বিত মাছ-মুরগি চাষে পুকুরের পানির গুণাগুণ যথাযথ মাত্রায় রাখার জন্যে ৩-৪ মাস পর পর প্রতি শতকে ৫০০ গ্রাম হারে চুন প্রয়োগ করতে হবে। বাণিজ্যিক মাছ চাষ পদ্ধতিতে পানি বদলের ও এরেশনের ব্যবস্থা থাকতে হবে। মাছকে মোট ওজনের ২-৩ ভাগ সুষম দানাদার খাবার দিতে হবে।

সম্ভাব্য আয়-ব্যয়

এক হেক্টর জলায়তনে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গলদা চিংড়ি চাষের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয়ের হিসাব

সম্ভাব্য ব্যয়

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ	দর	মূল্য (টাকা)
১।	পুকুর প্রস্তুতি (পুকুর শুকানো/রোটেনন, চুন, সার ইত্যাদি)	১ হেক্টর	-	১৫,০০০.০০
২।	চিংড়ি ও মাছের পোনা	২৪,০০০টি	১.৫০	৩৬,০০০.০০
৩।	খাদ্য (সুষম দানাদার খাবার)	১০০০০ কেজি	প্রতি কেজি ১৫.০০ টাকা	১,৫০,০০০.০০
৪।	জৈব ও অজৈব সার			১২,০০০.০০
৫।	শ্রমিক	১জন	-	১৮,০০০.০০
৬।	চিংড়ি আশ্রয়স্থল তৈরী			৫০০০.০০
৭।	বিবিধ (বিদ্যুৎ এরেশন, জ্বালানী ও জালটানা ঔষধপত্র ইত্যাদি রক্ষণাবেক্ষণ)			৪৪,০০০.০০
৮।	প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়			২০,০০০.০০
সর্বমোট				**৩,০০,০০০.০০**

সম্ভাব্য আয়

এক বছর বাণিজ্যিক চাষাবাদে প্রতি হেক্টরে ১২০০ কেজি চিংড়ি ও ৬০০০ কেজি মাছ উৎপাদন করা সম্ভব।

এ থেকে সম্ভাব্য আয়

চিংড়ি ১২০০ কেজি × ২৫০.০০ = ৩,০০,০০০.০০ টাকা
মাছ ৬০০০ কেজি × ৪৫.০০ = ২,৭০,০০০.০০ টাকা

সর্বমোট আয় = ৫,৭০,০০০.০০ টাকা

লাভ = (৫,৭০,০০০.০০-৩,০০,০০০.০০) টাকা = ২,৭০,০০০.০০ টাকা মাত্র।

উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ

উৎপাদন

পুকুরে মাছ চাষে যেমন যত্নবান হতে হয়, তেমনি মাছ উৎপাদন হওয়ার পর মাছ আহরণ ও বাজারজাতকরণ সমান গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সঠিক ভাবে ও সঠিক সময়ে মাছ আহরণ ও বাজারজাত করতে না পারলে ভাল দাম পাওয়া যায় না, ফলে লাভ ও অনেক কম হয়।

বাণিজ্যিকভাবে মাছ চাষ করলে হেক্টর প্রতি উৎপাদন রুই জাতীয় মিশ্র চাষের বেলায় ১০-১২ মেঃ টন, পাংগাসের ক্ষেত্রে ২৪-২৫ মেঃ টন, চিংড়ি ও মাছ চাষের ক্ষেত্রে চিংড়ি ১২০০- ১৫০০ কেজি ও মাছ ৬.০ মেঃ টন হতে পারে।

বাজারজাতকরণ

ভাল দাম পেতে হলে মাছ আহরণের পর বিক্রি পর্যন্ত যত্নের সাথে মাছ সংরক্ষণ করতে হয়। পরিস্কার ঠান্ডা পানি দিয়ে মাছের পাত্র ও মাছ ভালভাবে ধুয়ে ফেলতে হবে। কাদা বা অপরিস্কার থাকলে সহজেই মাছের রং বিবর্ণ হয়ে যায় এবং ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সহজেই আক্রান্ত হয় বলে মাছে পঁচন ধরে এবং বাজার মূল্য অনেক কমে যায়।

যদি মাছ দুরবর্তী বাজারে বিক্রি করলে লাভ বেশী হয়, সেক্ষেত্রে মাছ ধরার পর পর পরিস্কার পানিতে ধুয়ে পরিস্কার ঝুড়িতে বা বাক্সে বরফ চুর্ণ দিয়ে সম্পূর্ণভাবে আবৃত করে বাক্সের মুখ বন্ধ রাখতে হবে। এভাবে মাছ ২৪-৪৮ ঘন্টা অনায়াসে সংরক্ষণ করে বিক্রি করা যেতে পারে। মাছ বিক্রির জন্য আহরণের পরিমাণ কম হলে স্থানীয়ভাবে বিক্রিই ভাল। এক্ষেত্রে কোন রকম সংরক্ষণ ছাড়াই বিক্রি করা যায় এবং ঝুঁকি কম থাকে, খরচও কম হয়। মাছ পরিবহণের জন্য খামারের নিজস্ব যান থাকলে ভাল হয়।

মাছ বিক্রি বা বাজারজাত করণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ভাল দাম ও আয় প্রাপ্তি। তাই বছরের যে সময়গুলো, ঋতু বা মৌসুমে মাছ বিক্রি করলে ভাল দাম পাওয়া যেতে পারে, সে সম্পর্কে আগে থেকেই ধারণা রাখতে হবে। সাধারণতঃ দেখা যায়, মাসের প্রথম দিকে, শীত কালে, পূজা-পার্বনে ও রমজানে মাছের চাহিদা বেশী ও ভাল দাম পাওয়া যায় এবং আয়ও ভাল হয়।

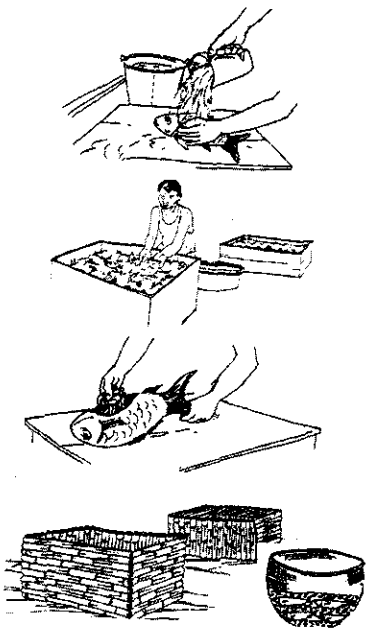

চিত্র ঃ ৯৩ বরফের সাহায্যে মাছ সংরক্ষণ প্রক্রিয়া

মাছের মজুদ হার

- এককচাষে রাঁজপুটি প্রতি শতাংশে ১৫-২০টি
- এককচাষে কমনকার্প প্রতি শতাংশে ১০-১৫টি
- রাঁজপুটি ও কমনকার্পের মিশ্রচাষে প্রতি শতাংশে ১২-১৫টি
- এককচাষে শিংমাছ প্রতি শতাংশে ৩০-৩৫ টি
- এককচাষে মাগুর মাছ প্রতি শতাংশে ২৫-৩০ টি
- শিং ও মাগুর মাছের মিশ্রচাষে প্রতি শতাংশে ২৫-৩০ টি

পোনা মজুদের সময়

ক্ষেতে ধান রোপনের পর পরই পোনা মাছ ছাড়া যাবে না। রোপনের পর ধানের চারা মাটিতে শিকড় মেলে শক্ত হতে ও ধানের কুশী গজাতে ১০/১৫ দিন সময় লাগে। এজন্য, ১০/১৫ দিন পর পোনা মজুদ করতে হবে। তবে, ক্ষেতে গর্ত থাকলে বা করা হলে গর্তে পরিমিত পানি দিয়ে ধান রোপনের পরই পোনা মজুদ করা যায়।

চিত্র ঃ ১০০ ধান ক্ষেতে পোনা মজুদ

মাছের জন্য বাড়তি খাদ্য

ধানের সাথে মাছচাষ করলে মাছের জন্য সাধারণতঃ বাড়তি কোন খাদ্য লাগে না।

ধানের গোড়ায় জন্মানো শেওলা, প্রাকৃতিক খাদ্যকণা, পোকামাকড়ের কীট, কিছু কিছু পোকা, ছোট ছোট আগাছা মাছ খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করবে।

প্রাকৃতিক ঐসব খাদ্যের অভাব হলে সামান্য চালের কুঁড়া, গমের ভূষি খাদ্য হিসেবে দেওয়া যেতে পারে। এসব বাড়তি খাদ্য প্রতিদিনই গর্তে একই সময়ে ছিটিয়ে দিতে হবে।

মাছের রোগ ও চিকিৎসা

ধানের সাথে মাছচাষ করলে মাছের তেমন কোন রোগ হওয়ার ভয় নেই। ধান ও মাছচাষের সময়সূচী মেনে চললে ধান কাটার পরপরই মাছ বড় হয়ে যাবে। এ অবস্থায় রোগ দেখা দিলে মাছ ধরে ফেলতে হবে। ধান কাটার পর সুযোগ অনুযায়ী আরও কিছুদিন মাছচাষ অব্যাহত রাখলে ঐ অবস্থায় যদি মাছের রোগ হয় তাহলে চিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে হবে। ধানের মৌসুমের শেষের দিকে

বিশেষ করে রাজপুটি মাছের ক্ষত রোগ হতে পারে। এ অবস্থায় ক্ষেতের মাছ গর্তে এনে শতাংশে ১ কেজি হারে চুন গুলে ছিটিয়ে দিতে হবে।

ধান কাটা ও মাছ ধরা

ক্ষেতে পানি থাকলে ধান কাটার পর মাছ ধরতে হবে। কোন কারণে ক্ষেতের পানি কমে গেলে ধান থাকা অবস্থায় মাছ ধরে ফেলতে হবে। অথবা, মাছ গর্তে এনে মজুদ করতে হবে।

চিত্র ঃ ১০১ ধান ক্ষেতে মাছ ধরা

ফলন

উপরোক্ত সমন্বিত ব্যবস্থাপনায় ধানের মাছ চাষ করে একজন চাষী হেক্টর প্রতি ২৫০/৩০০ কেজি মাছ অতিরিক্ত উৎপাদন হিসেবে পেতে পারে। এতে একজন চাষী কমপক্ষে ১০০০০-১২০০০ হাজার টাকা মাছ থেকে এবং ৪০০০-৫০০০ টাকা ধান থেকে আয় করতে পারেন।

ধান ক্ষেতে পোনার চাষ

ধান ক্ষেতে কার্পিও, তেলাপিয়া, এমনকি রুই জাতীয় মাছের ধানী পোনা ছেড়েও আঙ্গুলী পোনা উৎপাদন করা যায়। এক্ষেত্রে পোনার জন্য খৈল ও কূড়া নিয়মিত খাবার হিসেবে দিতে হবে। ধানের জমিতে পোনার চাষের ক্ষেত্রে ধানী মজুদের হার শতাংশ প্রতি ৮০০-১০০০টি হতে পারে।

ধানের পর মাছের চাষ

সাধারণতঃ নীচু বা বাঈদ এলাকায় জমিতে একবার ধান চাষ করা হয়। ধান কাটার পর ঐ জমি পতিত থাকে, কিন্তু জমিতে ধানের মৌসুমের পর প্রচুর পানি জমে থাকে যাতে মাছচাষ করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রেও জমিকে ধান ও মাছের চাষের মতো কিছুটা উপযোগী করে তৈরী করে নিতে হবে।

ধান চাষ ও ব্যবস্থাপনা

ধান ও মাছের সমন্বিত চাষে নিয়ম অনুযায়ী ক্ষেতে ধান রোপন করতে হবে। যে জাতের ধান বেশী পানি সহ্য করার ক্ষমতা রাখে, ফলনও বেশী হয় সেই জাত রোপন করতে হবে। আমন মৌসুমের জন্য বিআর ১১, বিআর ৩, বিআর ৩০ এবং বোরো মৌসুমে বিআর ১৪ ও বিআর ১৬ উপযোগী জাত। বোর মৌসুমে ধানের উচচ ফলনশীল জাতের সাথে ও মাছ চাষ করা যাবে।

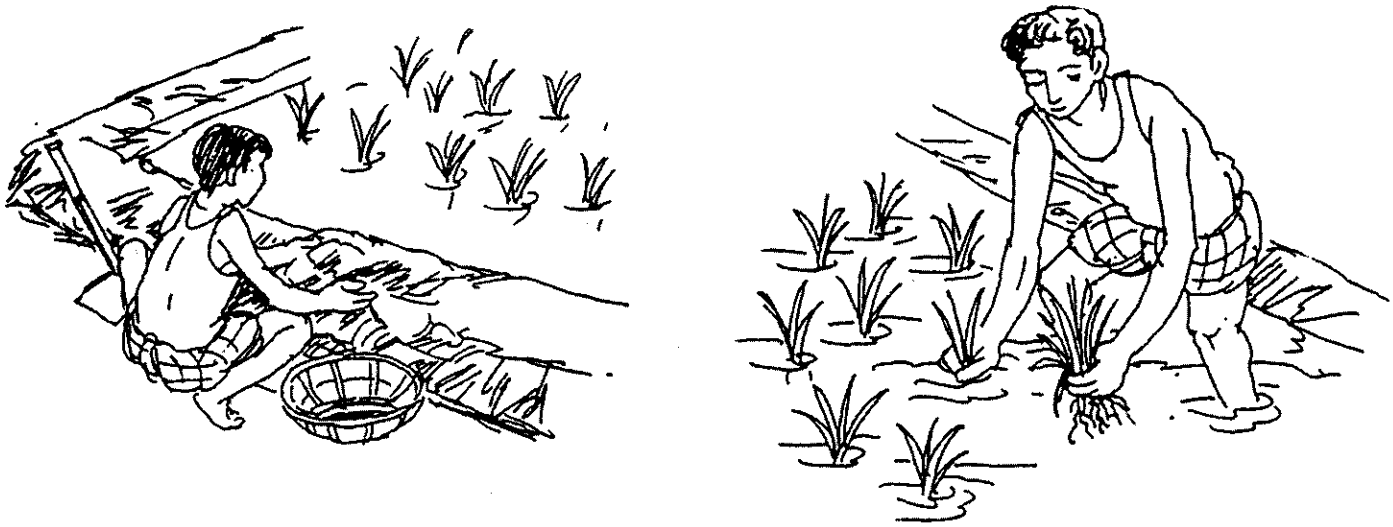

চিত্র ঃ ৯৭ ধান ক্ষেতের পাড় বাঁধাই ও ধান রোপণ

ধানের বেশী ফলন পেতে নিয়মিত ক্ষেতের ও ধানের যত্ন নিতে হবে। আগাছা জন্মালে তা পরিষ্কার করতে হবে। ধানে পোকামাকড় জন্মালে দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে। কীটনাশক ব্যবহার করা সমীচীন হবে না। পোকামাকড় দমনে "সমন্বিত বালাই নাশক" পদ্ধতিতে পোকামাকড় দমন করতে হবে।

কীটনাশক ব্যবহার জরুরী হলে চাষাধীন মাছ রক্ষার ব্যবস্থা নিতে হবে। ক্ষেতের মাছ জলাপথে তাড়িয়ে এনে গর্তে আটকিয়ে রাখতে হবে। পরে ক্ষেত শুকিয়ে কীটনাশক ছিটাতে হবে। এক সপ্তাহ পর কীটনাশকের বিষক্রিয়া কমে গেলে ক্ষেতে পানি দিয়ে পূর্বের ন্যায় স্বাভাবিক চাষাবাদের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

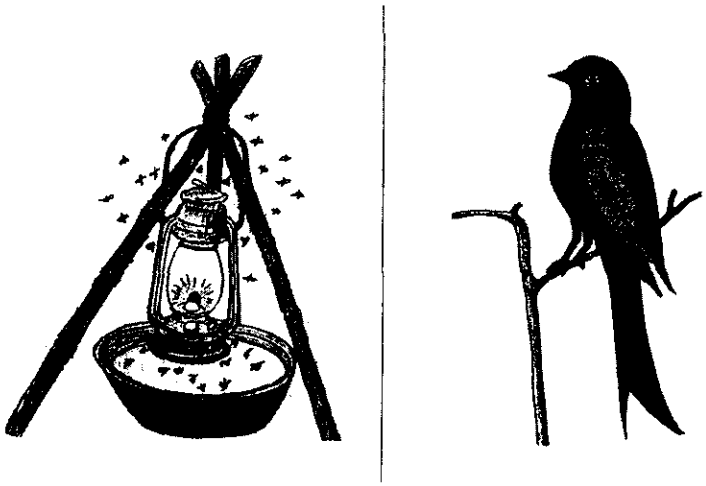

চিত্র ঃ ৯৮ কীটনাশক না দিয়ে পোকা দমনের উপায়

মাছচাষ ও ব্যবস্থাপনা

ধানের সাথে মাছচাষ করার জন্য যে মাছ অল্প সময়ে আশানুরূপ বড় হবে এবং সহজে ব্যবস্থাপনা করা যাবে সেগুলিই ছাড়তে হবে। যেমনঃ রাঁজপুটি, তেলাপিয়া, কমনকার্প, শিং- মাগুর এসব মাছ ধানের সাথে চাষ করা লাভজনক। ঐ মাছের যে কোন একটি এককভাবে, আবার রাঁজপুটি ও কমনকার্প এবং শিং ও মাগুরের মিশ্রচাষ করা যায়।

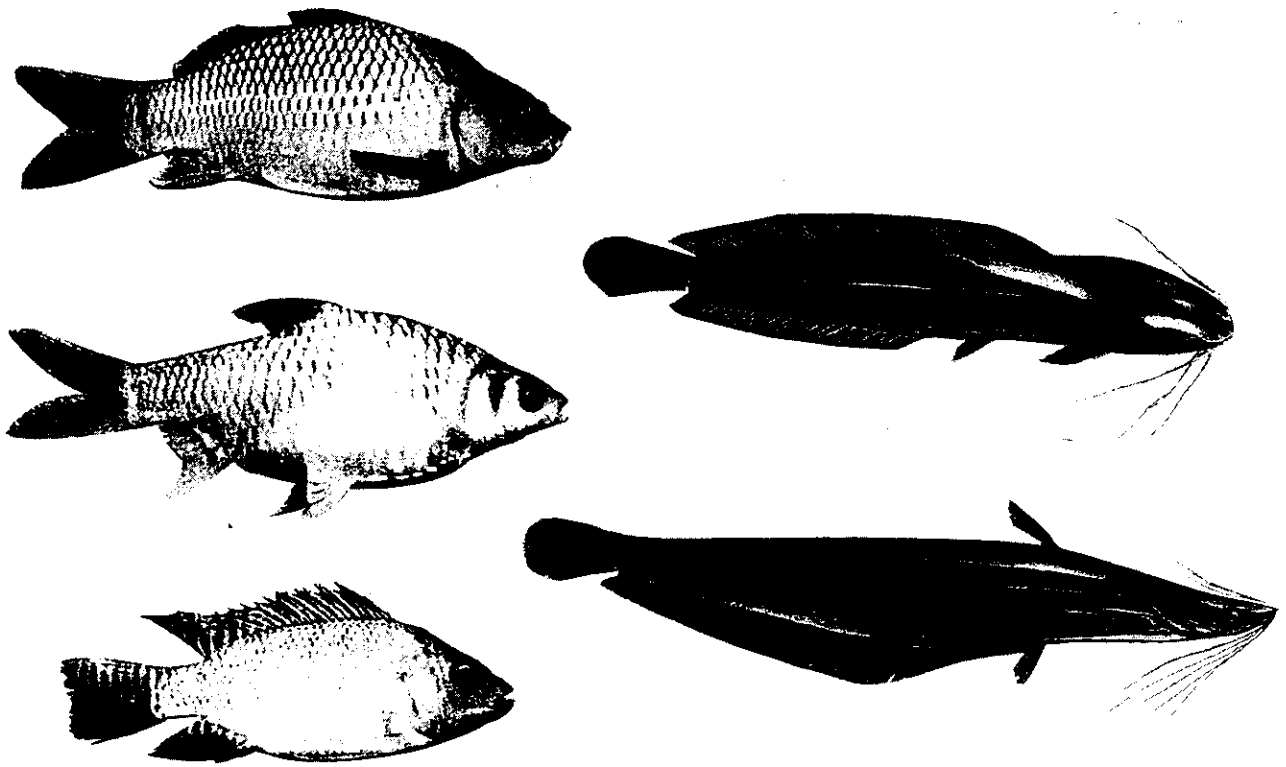

চিত্র ঃ ৯৯ ধান ক্ষেতে মাছ চাষ উপযোগী বিভিন্ন প্রজাতির মাছ

ষষ্ঠ অধ্যায়

ধান ক্ষেতে মাছচাষ

ধানের সাথে মাছচাষ

সমন্বিত চাষাবাদের মধ্যে ধান ও মাছের চাষ সবচেয়ে উপযোগী ও লাভজনক। ধান চাষে আমন ও বোরো, উভয় মৌসুমেই ধান ও মাছের সমন্বিত চাষ করা যায়।

ধান চাষাবস্থায় ধানক্ষেতে ধানের সাথে, আবার ধান কাটার পর পতিত অবস্থায় ধান ক্ষেতে মাছচাষ করা যায়। উভয় ক্ষেত্রে জমি ও উপকরণের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত হয়।

বর্তমানে যে সকল ধানের জাত চাষ করা হয় তাতে জমিতে সবসময় কিছু পানি ধরে রাখতে হয়। আবার ধান চাষের স্বার্থে জমির নীচু স্থানে, অথবা সুবিধামতো জমিতে গর্ত করে পানি সংরক্ষণ করতে হয়। এজন্য, ধানক্ষেতে মাছ চাষে বাড়তি কোন খরচ ছাড়াই করা সম্ভব।

ধানক্ষেতে মাছচাষ করলে ধানের ফলন বাড়াতে সাহায্য করে। ক্ষেতে মাছ যে মল ত্যাগ করে তাতে সারের কাজ হয়। ধান-মাছের সমন্বিত চাষাবাদ পদ্ধতিগতভাবে ব্যবস্থাপনা করা হলে ধানের ফলন ১০-১৫ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে যায়।

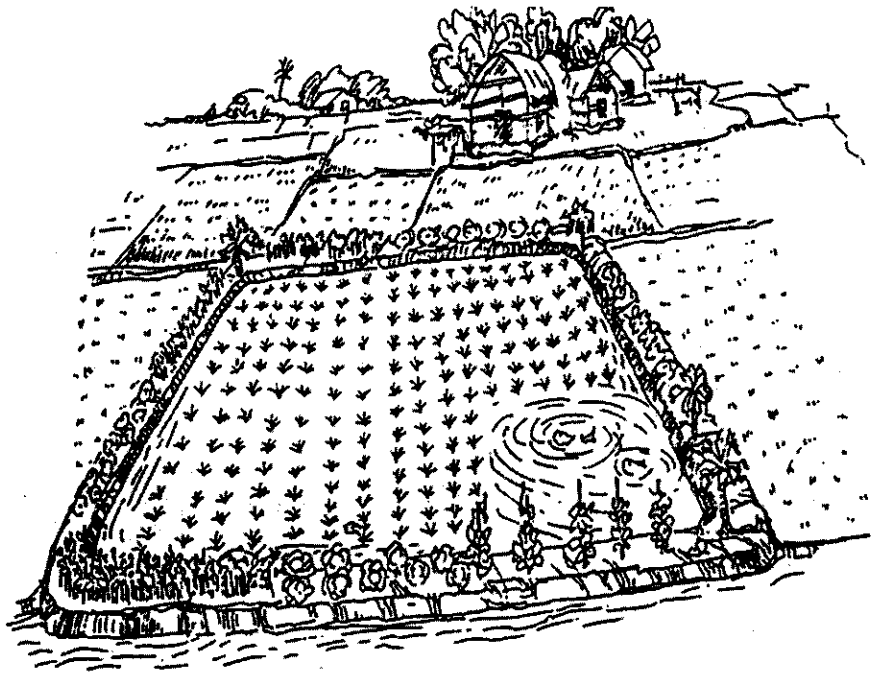

চিত্র ঃ ৯৪ ধান ক্ষেতে মাছ চাষ

উপযোগী জমি

বৃষ্টি, বন্যা বা আকস্মিক ঢলে ডুবে বা ভেসে যায় না এমন জমিতে ধান-মাছের সমন্বিত চাষ করতে হবে। ব্যবস্থাপনার সুবিধার জন্য জমির পরিমাণ ৫০ থেকে ১০০ শতকের মধ্যে হলে ভালো। কমপক্ষে ৩-থেকে ৫ মাস পর্যন্ত ১০ থেকে ২০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত পানি সহজে ধরে রাখা যায় এমন জমি বেশী উপযোগী হবে।

ভৌত কার্যক্রম

ধানের সাথে মাছচাষ করার জন্য জমির আইল উঁচু করা, জমিতে প্রয়োজনে গর্ত বা নালা খনন করার প্রয়োজন হতে পারে।

স্বাভাবিক ধান চাষের জমি থেকে ধানের সাথে মাছচাষ করার জন্য জমির আইল ১৫-২০ ইঞ্চি পর্যন্ত উঁচু ও শক্ত করে বেঁধে নিতে হবে। জমির ঢালু অংশে, মোট জমির শতকরা ৩-৫ ভাগ স্থান জুড়ে ২-৩ ফুট গভীর একটি গর্ত করে নিতে হবে।

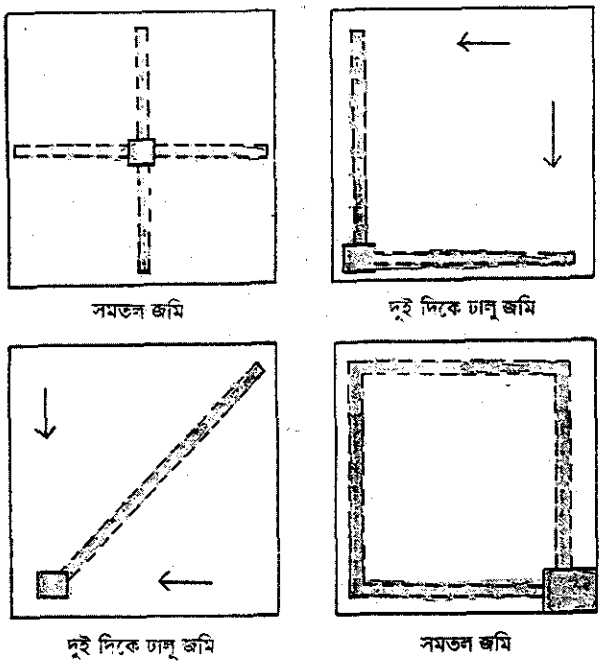

চিত্র ঃ ৯৫ ধান ক্ষেতে গর্ত ও নালা খননের বিভিন্ন প্রকার পদ্ধতি

জমির চারপাশের আইল ঘেসে ১ থেকে দেড় ফুট প্রশস্থ ও গভীর নালা করতে হবে। নালা প্রয়োজনে জমির মাঝ বরাবর অনেকগুলো নালা আড়াআড়ি ভাবেও করা যায়।

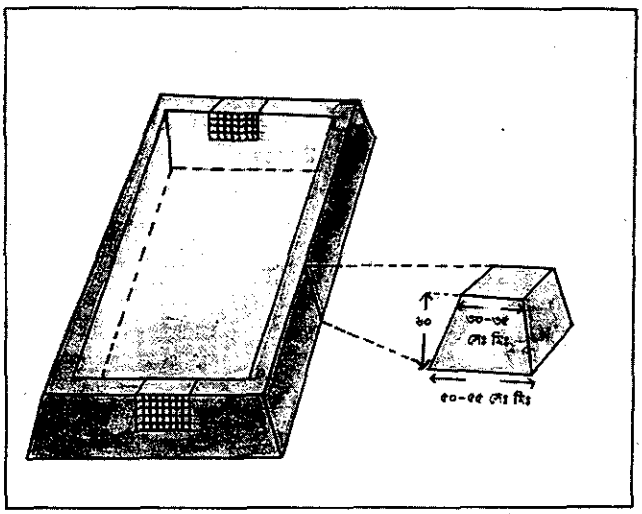

চিত্র ঃ ৯৬ ধান ক্ষেতের আইলের নকশা

বাঁধ নির্মাণ

জমির অবস্থান ও প্লাবনের মাত্রা অনুযায়ী জমিতে পাঁড় উঁচু করে শক্ত বাঁধ নির্মাণ করতে হবে, যাতে পাড় উপচে পানি ভিতরে প্রবেশ না করে অথবা বর্ষাকালে ভিতরের পানি বের না হতে পারে।

বাঈদ এলাকায় ধানি জমি প্রাকৃতিকভাবে ২-৩ দিকে উঁচু জমিতে ঘেরাও করা থাকে। এমন জমিতে একদিকে বাঁধ দিলেই মাছচাষের উপযোগী জলাশয়ে পরিণত হয়। বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, সেচ প্রকল্পের বাঁধ বা পোল্ডার অঞ্চলের অভ্যন্তরে ধানের পর জমি পতিত থাকে। এমন এলাকায় পানি নিয়ন্ত্রণ করে মাছচাষের উপযোগী জলাশয়ে পরিণত করা যায়। দেশে প্রায় ২৬ লক্ষ হেক্টর ধানী জমি আছে। এ থেকে মাছ চাষ উপযোগী জমি চিহ্নিত করে যৌথ উদ্যোগে মাছ চাষ করলে আরও অধিক মাছ উৎপাদন করা সম্ভব।

সংযোগ নালা খনন

নীচু ও বাঈদ এলাকায় মাছচাষের জন্য স্থায়ী বাঁধ করলে পানি চলাচলের জন্য সংযোগ নালা রাখতে হবে। সংযোগ নালা চাষাধীন জলাশয়ের ভিতর ও বাহিরের পানির সমতা রক্ষা করবে। মাছ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নালার মুখে জাল বা বাঁশের বানা এঁটে বন্ধ করে দিতে হবে।

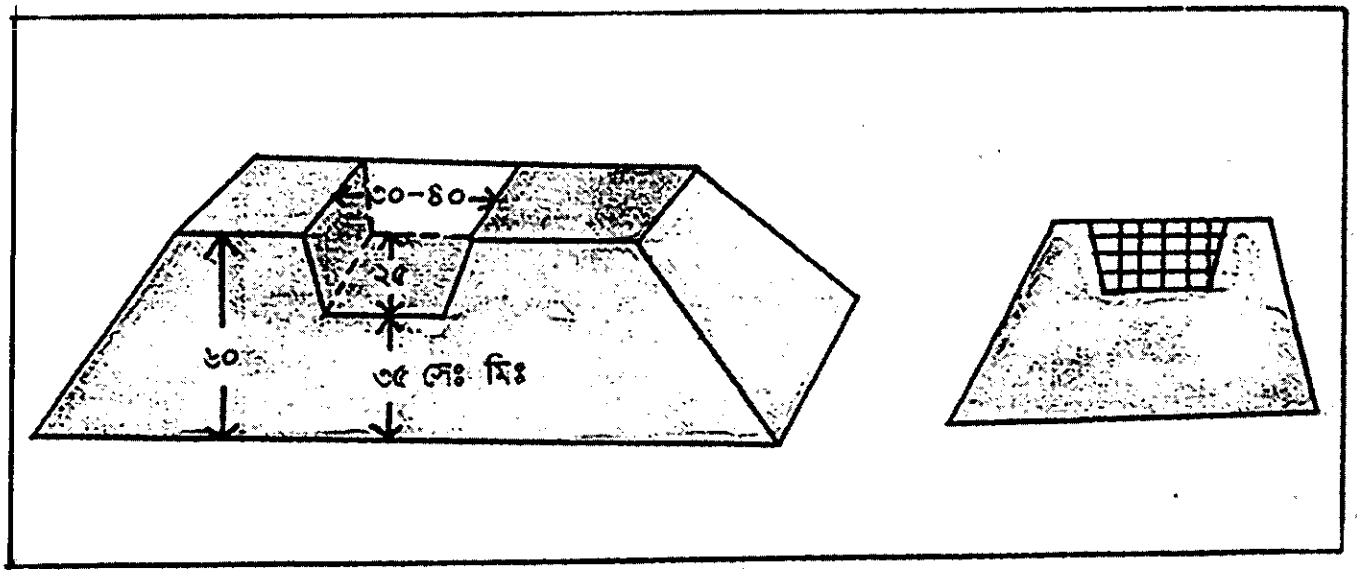

চিত্র ঃ ১০২ পানির নির্গমন ও বহিগমন পথ ও পথে জালের নকশা

মাছচাষ

ধানের পরে মাছচাষ করলে পুরো বর্ষাকালব্যাপী মাছচাষ করা যায়। এ সময়ে ক্ষেতে পুকুরের মতো পানি থাকে। এজন্য, রুইজাতীয় মাছের মিশ্র চাষ করা যাবে। পানির স্থায়ীত্ব কম হলে রাঁজপুটি, তেলাপিয়া, কার্পিও, মিরর কার্পের চাষ করা শ্রেয়।

পোনা মজুদের পর যথাযথ পোনার পরিচর্যা করতে হবে। মজুদের পর ৪-৬ মাস পর্যন্ত চাষের সময় পাওয়া যাবে। এ সময়ের মধ্যেই মাছ বাজারে বিক্রির উপযোগী হবে।

বৃহদাকার ধানের মাঠে সমবায় ভিত্তিতে মাছচাষ

সাংগঠনিক ব্যবস্থা

ধান কাটার পর নিম্নাঞ্চল ও প্লাবন প্রবণ এলাকায় ধান ক্ষেতে প্লাবিত হয়ে বৃহৎ জলাশয়ের আকার ধারণ করে। এমন জলাশয়ে একক প্রচেষ্টায় মাছচাষ করা কষ্টসাধ্য ও ঝুঁকিপূর্ণ। মাছচাষের মাধ্যমে এমন ধানি জমি ব্যবহার করতে সমাজ ভিত্তিক প্রচেষ্টায় মাছচাষ সফল হবে। বিশেষভাবে, বাঁধ ও পোল্ডার এলাকার অভ্যন্তরের ধানি জমিতে মাছচাষের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। সমবায় বা সমাজভিত্তিক মাছচাষ করে জমির মালিকেরা তার নিজ জমির হারাহারে মাছের লভ্যাংশ ভাগ করে নিতে পারেন। তবে, এ ধরণের উদ্যোগ সফল করতে সমবায়ীদের মধ্যে শক্ত ও আস্থাশীল সংগঠন গড়ে তুলতে হবে।

উন্মুক্ত জমি

- বোরো মৌসুমে ধান চাষ হয় কিন্তু এপ্রিল/মে থেকে নভেম্বর পর্যন্ত প্রায় ১ মিটার পানি থাকে।
- পানির উৎসের সাথে সংযুক্ত অর্থাৎ নদী বা খালের সাথে যুক্ত, যাতে পানি সংগ্রহ করা যেতে পারে।
- চারিদিকে গ্রাম বা রাস্তা বা বাঁধ দিয়ে ঘেরা।
- জমির আয়তন কয়েক শত বিঘা।

ধানক্ষেত মাছচাষের উপযুক্ত করা

- যে দিকে পাড় নাই সেদিকে পাড় বাঁধা বা বানা দিয়ে বেড়া দেয়া।
- পানি ধরে রাখার জন্য স্লুইচ গেইট তৈরি।
- জমির সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রায় ২% জমিতে গভীর করে ৫০-৬০ মিটার চওড়া খাল কাটা প্রয়োজন। যেখানে প্রয়োজনে ছোট মাছ ও জীববৈচিত্র রক্ষার জন্য অন্যান্য মাছ জমা থাকতে পারে।
- এ সব কাজ বোরো উঠার পর পরই বর্ষার আগেই সপন্ন করতে হবে।

চুন প্রয়োগ

- আন্যান্য প্রকার মাছচাষের মত এক্ষেত্রেও চুন প্রয়োগ করা প্রয়োজন।
- হেক্টর প্রতি ১৫০-২০০ কেজি চুন প্রয়োজন।

সার প্রয়োগ

- চুন প্রয়োগের ৪-৫ দিন পর ২৫০-৫০০ কেজি/হেঃ হারে মুরগির বিষ্টা সার হিসেবে প্রয়োগ করতে হবে।
- এক্ষেত্রে অজৈব সার প্রয়োগ দরকার নাই।

পোনা মজুদ

- ক্ষেতে প্রায় ১ মিটার পানি হলে পোনা মজুদ করা দরকার। পোনা সাধারণতঃ বিগত বছরের হওয়া উচিত।
- পোনার আকার ১২-১৫ সে.মি. বা তদুর্ধ।
- পোনা মজুদের হার (প্রতি হেক্টর)

প্রজাতি	সংখ্যা
রুই	৪৫০-৫০০
মৃগেল	৩০০-৩২৫
গ্রাসকার্প	১৫০-২০০
কমনকার্প	৩৫০-৩৭৫
সরপুটি(থাই)	৪০০-৪২৫
সিলভার কার্প	১১০০-১২০০
বিগহেড কার্প	২০০-২৫০
কাতলা	৩৫০-৪০০
পাংগাস	১০০-১২৫
	৩৪০০-৩৮০০

- পোনা মজুদের পর অজৈব সার ইউরিয়া ৩০-৩৫ কেজি/হেঃ টিএসপি ২০-৩০ কেজি/হেঃ হারে উৎপাদন সময়কালে ৩-৪ বার প্রয়োগ করা প্রয়োজন।
- এছাড়া জৈব সার ১৫০-২০০ কেজি/হেঃ প্রয়োগ করা হয় ৩-৪ বার।

সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ

- চাউলের কুঁড়া, গমের ভূষি, খৈল একত্রে মিশিয়ে বল আকারে দিতে হবে। জলাশয় অনুসারে অনেক জায়গায় খাবার দিতে হবে। যাতে সবাই খাবার পায়।
- খৈল ৩৫-৪০% এবং কুঁড়া (গমের+চাউলের) ৬০% হারে মিশ্রিত করতে হবে।

আহরণ

মাছ বিক্রীযোগ্য হলেই ক্রমান্বয়ে আহরণ করতে হবে। নতুবা পানি কমে গেলে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

মজুদকৃত প্রজাতি ছাড়াও এ ধরনের ধানক্ষেতে মাছ চাষে বিভিন্ন অচাষকৃত মাছ যেমন পুঁটি, মলা, কৈ, শিং, শোল, ট্যাংরা ইত্যাদি পাওয়া যায়।

উৎপাদন

৬-৮ মাসের চাষ কালে হেক্টর প্রতি ১৫০০-১৮০০ কেজি মাছ উৎপন্ন হতে পারে। এছাড়া বেশ কিছু পরিমাণ অচাষকৃত মাছ উৎপন্ন হয়।

গড়ে প্রতি হেক্টরে প্রয়োগকৃত উপকরণ ও সম্ভাব্য আয়-ব্যয়

উপকরণ	পরিমাণ/সংখ্যা	একক প্রতি মূল্য	মোট ব্যয়
জৈব সার	৮৫০ কেজি	১.০০ টাকা/কেজি	৮৫০.০০ টাকা
ইউরিয়া সার	২৫০ কেজি	৯.০০ টাকা/কেজি	২২৫০.০০ টাকা
টিএসপি সার	১২৫ কেজি	১০.০০ টাকা/কেজি	১২৫০.০০ টাকা
সম্পূরক খাদ্য(খৈল ও কুড়া)	২০০০ কেজি	৭.০০ টাকা/কেজি	১৪০০০.০০ টাকা
পোনা	৩৬৫০টি	১.৫০টাকা/টি	৫৪৭৫.০০ টাকা
চুন৪	২৫০ কেজি	৫.০০টাকা/কেজি	১২৫০.০০ টাকা
আহরণ ও পরিচালনা ব্যয়	থোক	থোক	৬০০০.০০ টাকা
		সর্বমোট ব্যয়	**৩১,০৭৫.০০ টাকা**

উৎপাদন হেক্টর প্রতি ঃ ১৭০০ কেজি মাছ।
আয় ঃ প্রতিকেজি গড়ে ৩৫.০০ টাকা হিসেবে মোট ৫৯,৫০০.০০ টাকা ।
অর্থাৎ লাভ ঃ ২৮৪২৫.০০ টাকা।
ব্যয় ও আয়ের অনুপাত ঃ ১:১.৯১।

সপ্তম অধ্যায়

দেশী ছোট মাছের চাষ

অতীতে এদেশের নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর-ডোবা ও ধান ক্ষেতে প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন প্রজাতির ছোট মাছ পাওয়া যেত। বর্তমানে এ সব মাছের প্রাপ্যতা মনুষ্যসৃষ্ট সমস্যা ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। ছোট মাছে প্রচুর পরিমাণে আমিষ, ভিটামিন, ক্যালসিয়াম, আয়রন রয়েছে । প্রতি বছর আমাদের দেশে ৩০ হাজারের অধিক শিশু ভিটামিন-এ এর অভাবে রাতকানা রোগে আক্রান্ত হয়। ছোট মাছ রাতকানা রোগসহ অপুষ্টিজনিত রোগ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। অধিকন্তু শহর ও গ্রামীণ জণগোষ্ঠির কাছে ছোট মাছের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। আমাদের দেশে প্রায় ১৪৩ প্রজাতির ছোট মাছ আছে যার মধ্যে ইতোমধ্যে কতিপয় প্রজাতি বিপন্ন হওয়ার পর্যায়ে রয়েছে। মাছের জীববৈচিত্র সংরক্ষণে বাংলাদেশ মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুটের ময়মনসিংহস্থ স্বাদুপানি কেন্দ্র ইতোমধ্যে বেশ কিছু ছোট মাছ চাষের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। এ প্রবন্ধে এ সব প্রজাতির চাষ পদ্ধতি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

ছোট মাছ কি?

সাধারণত: যে সমস্ত মাছ পরিপক্ক অবস্থায় ৫-২৫ সে.মি. লম্বা হয়, তাদেরকে আমরা ছোট মাছ হিসাবে বিবেচনা করতে পারি। নিম্নে অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন কিছু ছোট মাছের নাম উল্লেখ করা হলো।

সারনী-১ অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশের কতিপয় ছোট মাছের তালিকা

ক্রমিক নং	স্থানীয় নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
১.	মলা (Mola)	*Amblypharyngodon mola*
২.	চেলা (Chela)	*Chela sp.*
৩.	পুঁটি (Punti)	*Puntius sophore*
৪.	সরপুঁটি (Sharpunti)	*Puntius sarana*
৫.	ঢেলা (Dhela)	*Rohtee cotio*
৬.	চাপিলা (Chapila)	*Gudusia chapra*
৭.	গুলশা (Gulsha)	*Mystus cavasius*
৮.	পাবদা (Pabda)	*Ompok pabda*
৯.	বাটা (Bata)	*Lebeo bata*
১০.	ভাগনা (Bhagna)	*Cirrhinus reba*
১১.	কৈ (Koi)	*Anabas testudineus*

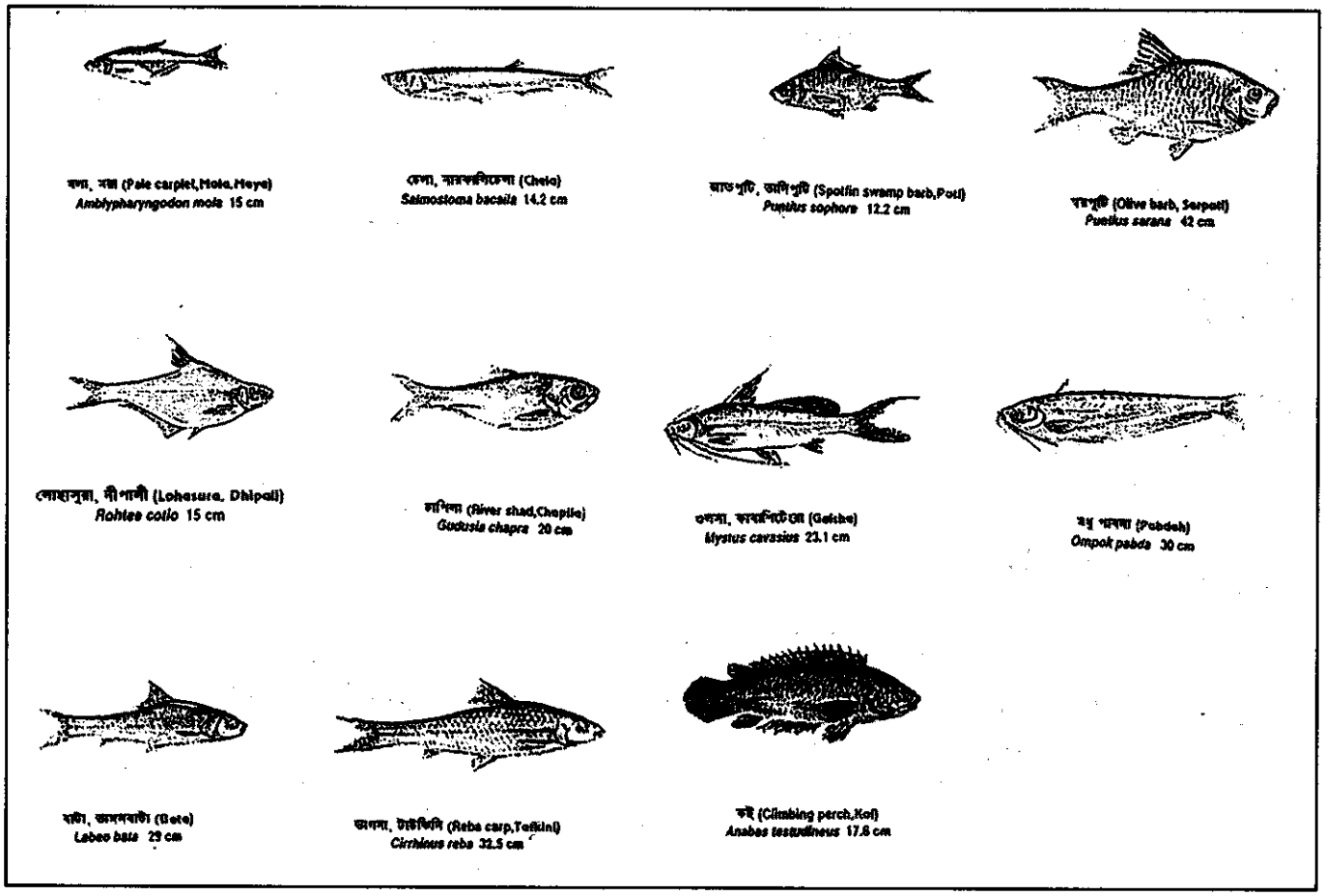

চিত্র ঃ ১০৩ অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশের কতিপয় ছোট মাছ

ছোট মাছের গুরুত্ব

- ছোট মাছ গরীব জনগোষ্ঠির আমিষের যোগান দেয় ও আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে।
- ছোট মাছে প্রচুর পরিমাণে আমিষ ও মাইক্রো-নিউট্রিয়েন্ট (ভিটামিন, ক্যালসিয়াম, আয়রণ ইত্যাদি) বিদ্যমান থাকে।
- গ্রামীণ জনসাধারণ বড় মাছের তুলনায় ছোট মাছ বেশী পছন্দ করে থাকে, কারণ

    - পরিবারের সকল সদস্যদের পুষ্টি চাহিদা পূরণ করে;
    - বাজারে সব সময়ই কম বেশী পাওয়া যায়;
    - ছোট মাছ তুলথামূলকভাবে কম দামে পাওয়া যায়;

- ছোট ছোট ভাগে বিক্রি হয় বিধায় সূলভ মূল্যে ক্রয় করা যায়;
- ছোট বড় সব ধরণের জলাশয়েই সহজ ব্যবস্থাপনায় চাষ উপযোগী।
- ছোট মাছ সব ধরণের জলাশয়েই প্রাকৃতিকভাবে প্রজনন করে বিধায় পোনা ক্রয়ের জন্য বাড়তি পুঁজির প্রায়োজন হয় না।
- ছোট মাছ অপেক্ষাকৃত কম অক্সিজেনে এবং ঘোলা পানিতেও চাষ করা সম্ভব।
- ছোট মাছ দ্রুত বর্ধনশীল এবং কার্প ছাতীয় মাছের সাথেও একত্রে চাষযোগ্য।

চাষ প্রযুক্তি

মলা, চেলা ও পুঁটির চাষ

চিত্র ঃ ১০৪ মলা মাছ, চেলা, জাত পুঁটি

বিশেষ বৈশিষ্ট্য

- একক ও মিশ্র পদ্ধংণতে চাষ করা যায়।
- বছরে ২-৩ বার প্রাকৃতিকভাবে প্রজনন করে থাকে।
- সহজ ব্যবস্থাপনায় এবং বিরূপ পরিবেশে চাষ করা সম্ভব।

উৎপাদন নির্দেশিকা

- পুকুরের পাড় মেরামত ও রাক্ষুসে মাছ দমন করে প্রতি শতাংশে ১ কেজি চুন ও ৪ কেজি পঁচা গোবর প্রয়োগ করতে হয়;
- সার প্রয়োগের ৩-৪ দিন পরে পানির রং হালকা বাদামী হলে প্রাকৃতিক উৎস হতে পরিপক্ক ছোট মাছ ছাড়তে হবে;
- একক চাষের ক্ষেত্রে প্রতি শতাংশে ৪০০-৫০০ টি মলা/চেলা/পুঁটি মজুদ করা যায়;

- রুই জাতীয় মাছের সাথে মিশ্রচাষে প্রতি শতাংশে ২০০-২৫০টি মলা/চেলা/পুঁটি এবং ২৮-৩২টি রুই জাতীয় মাছ (রুই-১ ঃ কাতলা-১ ঃ মৃগেল-১) ছাড়তে হয়;

সম্পূরক খাবার প্রয়োগ

একক চাষে শুধুমাত্র চালের কুড়া মাছের দৈহিক ওজনের ৪-৫% হারে প্রতিদিন প্রয়োগ করতে হবে। মিশ্র চাষের ক্ষেত্রে প্রতিদিন দৈহিক ওজনের ৩% হারে চালের কুঁড়া (৭০%) ও সরিষার খৈল (৩০%) একত্রে মিশিয়ে প্রয়োগ করা যায়;

- সম্পূরক খাদ্যের পাশাপাশি প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনের জন্য প্রতি শতাংশে ৪ কেজি পঁচা গোবর ১৫ দিন অন্তর অন্তর পুকুরে প্রয়োগ করতে হয়;

- প্রতি মাসে মাছের নমুনায়ন করে খাদ্যের পরিমাণ নির্ণয় করা প্রয়োজন ;
- মলা/চেলা/পুঁটি মজুদ করার ৩ মাস পর হতে প্রতি মাসে এক বার জাল টেনে আংশিক আহরণ করা বাঞ্ছনীয়;
- এভাবে মাছ চাষ করে ৬ মাসে একক চাষের ক্ষেত্রে প্রতি শতাংশে ৩-৬ কেজি মলা/চেলা/পুঁটি এবং মিশ্র চাষের ক্ষেত্রে ১২-১৪ কেজি মাছ উৎপাদন করা সম্ভব।

পাবদা মাছের চাষ

চিত্র ঃ ১০৫ পাবদা মাছ

বিশেষ বৈশিষ্ট্য

- কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদন সম্ভব।
- মৌসুমী পুকুর ও অন্যান্য অগভীর জলাশয়ে চাষযোগ্য।
- ৫-৬ মাসে বিপননযোগ্য হয়।

উৎপাদন নির্দেশিকা

- প্রতি শতাংশের পুকুরে ১ কেজি চুন, ৫ কেজি গোবর, ৫০ গ্রাম ইউরিয়া ও ১০০ গ্রাম টিএসপি সার প্রয়োগ করে পুকুর তৈরি করতে হবে;
- পুকুর প্রস্তুতির ৭ দিন পর প্রতি শতাংশে ৫ গ্রাম ওজনের ৭০-৭৫ টি পাবদা, ৪০-৪৫ টি রাজপুঁটি এবং ১৫-২০ টি মিরর কার্প মজুদ করা যায়;
- সম্পূরক খাবার হিসাবে চালের কুড়া (৬০%) ও সরিষার খৈল (৪০%) এর মিশ্রণ মাছের ওজনের ৫-৬% হারে প্রতিদিন প্রয়োগ করা যেতে পারে;
- এছাড়া প্রতি ১৫ দিন অন্তর অন্তর প্রতি শতাংশে ৪ কেজি পঁচা গোবর সরবরাহ করতে হবে;
- নমুনায়ন করে খাবারের পরিমাণ নির্ধারণ করা প্রয়োজন;
- এ পদ্ধতিতে চাষ করে ৬ মাসে প্রতি শতাংশে ১০-১২ কেজি মাছ উৎপাদন পাওয়া সম্ভব।

গুলশা মাছের চাষ

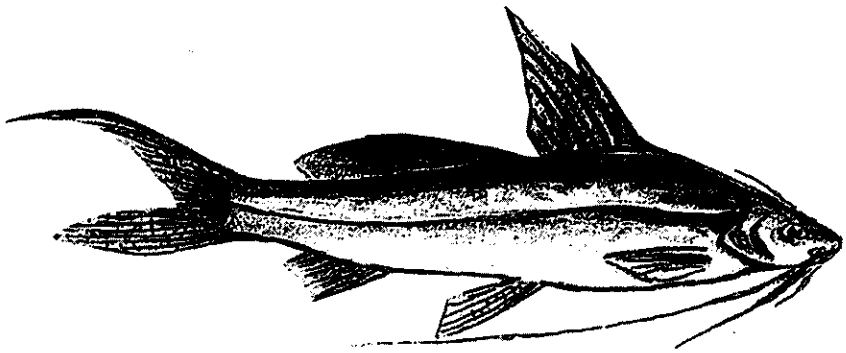

চিত্র ঃ ১০৬ গুলশা মাছ

বিশেষ বৈশিষ্ট্য

- দ্রুত বর্ধনশীল মাছ।
- কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদন সম্ভব।
- মৌসুমী ও অগভীর জলাশয়ে চাষযোগ্য।
- ৫-৬ মাসে বিপননযোগ্য হয়।

উৎপাদন নির্দেশিকা

- পাবদা মাছ চাষের মতই পুকুর প্রস্তুতির সমস্ত কাজগুলো সম্পন্ন করতে হবে;
- পুকুর প্রস্তুতির পর ৫-৮ গ্রাম ওজনের পাবদা, গুলশা ও সিলভার কার্পের পোনা প্রতি শতাংশ যথাক্রমে ৭০-৭৫, ৪০-৪৫ এবং ১৫-২০টি ছাড়া যায়;
- খাবার হিসাবে চালের কুড়া (৬০%) ও সরিষার খৈল (৪০%) এর মিশ্রন মাছের ওজনের ৫% হারে প্রতিদিন দেয়া আবশ্যক;
- সার হিসাবে ৫০ গ্রাম ইউরিয়া, ও ১০০ গ্রাম টিএসপি প্রতি শতাংশে ১৫ দিন পর পর গুলিয়ে প্রয়োগ করতে হবে;
- মাছের নমুনায়ন করে খাদ্যের পরিমাণ বাড়াতে হবে;
- ৬ মাসে প্রতি শতাংশে পুকুর থেকে ১৩-১৫ কেজি মাছ উৎপাদন পাওয়া যায়।

দেশী সরপুঁটির চাষ

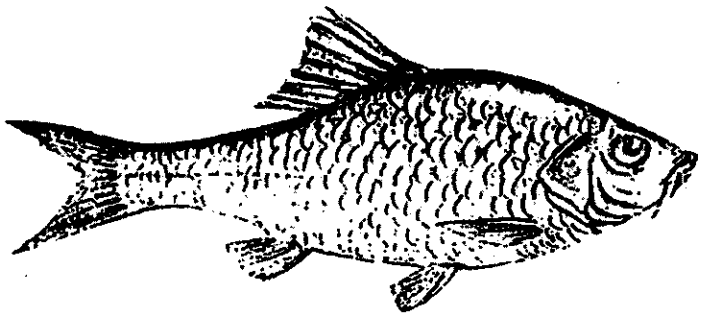

চিত্র ঃ ১০৭ দেশী সরপুঁটি মাছ

বিশেষ বৈশিষ্ট্য

- যে কোন প্রকার পুকুর, ডোবা ও পতিত জলাশয়ে চাষযোগ্য।
- কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদন সম্ভব।
- রুই জাতীয় মাছের সাথে মিশ্র চাষ করা সম্ভব।
- ৪-৬ মাসের মধ্যেই বিক্রির উপযোগী হয়
- সহজ ব্যবস্থাপনায় চাষ করা যায়।
- অপেক্ষাকৃত বিরূপ পরিবেশ চাষ সম্ভব।
- যে কোন ধরণের খাবার খেতে এরা অভ্যস্ত।

উৎপাদন নির্দেশিকা

- পুকুর প্রস্তুতি পাবদা এবং গুলশা মাছ চারের মতই সম্পন্ন করতে হবে;
- পুকুর প্রস্তুতি সম্পন্ন করার পর ৬-৮ গ্রাম ওজনের দেশী সরপুঁটির পোনা প্রতি শতাংশে ৬৫-৭০ টি মজুদ করা যেতে পারে;
- সম্পূরক খাবার হিসাবে মাছের দৈহিক ওজনের ৬% হারে শুধুমাত্র চালের মিহি কুঁড়া প্রতিদিন সরবরাহ করতে হয়;
- প্রতি মাসে মাছের নমুনায়ন করে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও খাবারের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে;
- প্রতি ১৫ দিন অন্তর পুকুরে ৪ কেজি পঁচা গোবর এবং ৫০ গ্রাম ইউরিয়া ও ১০০ গ্রাম টিএসপি সার প্রয়োগ করতে হয়;
- এ পদ্ধতি অবলম্বন করে মাছ চাষ করলে ৬ মাসে প্রতি যণাংশে ৫-৭ কেজি মাছ উৎপাদন করা সম্ভব।

কৈ মাছের চাষ

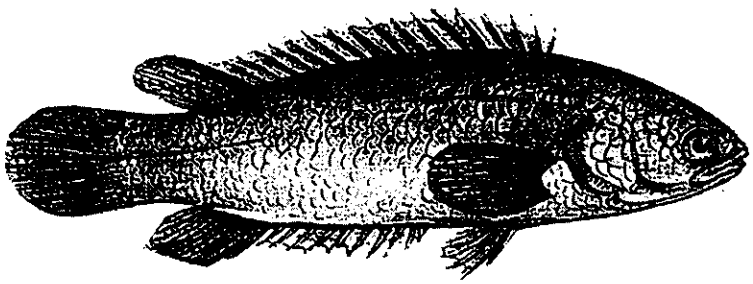

চিত্র ঃ ১০৮ কৈ মাছ

বিশেষ বৈশিষ্ট্য

- কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদন সম্ভব।
- কম অক্সিজেনযুক্ত পানিতে চাষ করা যেতে পারে।
- জলাশয়ে উচ্চ ঘনত্বে চাষ সম্ভব।

উৎপাদন নির্দেশিকা

- পূর্বের মতই পুকুর প্রস্তুতির কাজগুলো সেরে নিতে হবে;
- পুকুরের চার পাশে দুই ফুট উচ্চতার বাঁশের বা পাট শলার বানা স্থাপন করতে হবে;
- ৪-৫ গ্রাম ওজনের কৈ মাছের পোনা শতাংশ প্রতি ৭০-৮০ টি মজুদ করতে হবে;

- মাছ মছঁদের পর চালের কুড়া (৬০%), সরিষার খৈল (২০%) ও ফিস মিল (২০%) এর মিশ্রন মাছের দৈহিক ওজনের ৫-৬% হারে প্রতিদিন প্রয়োগ করা প্রয়োজন;
- এছাড়া জৈব সার হিসাবে ১৫ দিন পর পর প্রতি শতাংশে ৮ কেজি হারে পঁচা গোবর পানিতে গুলে দিতে হবে;
- খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য প্রতি মাসে একবার মাছের নমুনায়ন করা আবশ্যক;
- কৈ মাছের একক চাষ করে ৫ মাসে প্রতি শতাংশে ২-৩ কেজি মাছ পাওয়া যেতে পারে।

প্রাকৃতিক জলাশয় হতে ছোট মাছের প্রাপ্যতা ও আধিক্য দিন দিন ব্যাপকভাবে হ্রাস পাওয়ার কারণে চাহিদা মোতাবেক বাজারে ছোট মাছের সরবরাহ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। গবেষণার মাধ্যমে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে এ সমস্ত মাছের উৎপাদন বাড়ানো ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা সম্ভব। পাশাপাশি এ সব প্রজাতির মাছ, চাষের মাধ্যমে গ্রামীণ দারিদ্র জনগোষ্ঠি তাদের পারিবারিক দৈনন্দিন আমিষের চাহিদা পূরণসহ বাড়তি আয়ের সংস্থান করতে পারে।

কাঁক্‌ড়া চাষ

কাঁক্‌ড়া আর্থোপোড শ্রেণীর শক্ত খোলসবিশিষ্ট জলজ প্রাণী। প্রজাতিভিত্তিক মিঠা ও লোনা পানির উভয় পরিবেশে কাঁকড়া পাওয়া যায়। মিঠা পানিতে চার প্রজাতির এবং লোনা পানিতে এগার প্রজাতির কাঁক্‌ড়া রয়েছে। মিঠা পানির কাঁক্‌ড়া আকারে ছোট এবং লোনা পানির কাঁক্‌ড়া আকারে বেশ বড় হয়। লোনা পানির কাঁক্‌ড়া সমুদ্রে বসবাস করে। মিঠা পানির কাঁক্‌ড়া বিদেশে রপ্তানী হয় না। সামুদ্রিক বড় আকারের কাঁকড়া বিদেশে রপ্তানী হয়। তাছাড়া সামুদ্রিক এগার প্রজাতির কাঁকড়ার মধ্যে একমাত্র "শিলা" কাঁকড়া রপ্তানী হয়। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম সাইলা সিরেটা (Scylla serrata)। অনেক স্থানে ইহা মাডক্র্যাব নামে পরিচিত। বিদেশে শিলা কাঁক্‌ড়ার মাংসই প্রিয় খাদ্য। স্থানীয়ভাবে বৃহত্তর জনগোষ্ঠি খাদ্য হিসাবে কাঁক্‌ড়া গ্রহণ না করলেও বিদেশে রপ্তানী করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। দক্ষিণ-পুর্ব এশিয়ার দেশসহ ইউরোপ মহাদেশেও কাঁক্‌ড়ার চাহিদা রয়েছে। কাঁক্‌ড়া চাষ প্রক্রিয়া আজও প্রাথমিক পর্যায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাধীন আছে। বর্তমান রপ্তানীকৃত কাঁক্‌ড়ার প্রায় সবটাই উপকূলীয় চিংড়ি খামার, সমুদ্রের মোহনা, নদী এবং ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল থেকে আহরণ করা হয়ে থাকে।

চিত্র ঃ ১০৯ শিলা কাকড়া (Scylla serrata)

পরিচিতি ও বিস্তৃতি

কাঁক্‌ড়া বা মাডক্র্যাভ আফ্রিকার পুর্ব উপকূল, ভারত উপকূল এবং ইন্দোপেসিফিক অঞ্চলের ম্যানগ্রোভ এলাকায় দেখা যায়। এই কাঁক্‌ড়ার চক্ষুপুঞ্জের দুই পার্শ্বে Carapace এর উপরে নয়টি দাঁত রয়েছে যা Serrations বলা হয়। এই "সিরাসন" এর সংখ্যা দিয়ে কিশোর কাঁক্‌ড়া চেনা যায়। বাংলাদেশে উপকুলীয় অঞ্চলের প্রায় সর্বত্র কাঁক্‌ড়া পাওয়া যায়। কাঁক্‌ড়ার বয়স সাধারণতঃ ১৬-১৮ মাসের হলেই পূর্ণবয়স্ক বা প্রজননক্ষম হয়। এ সময় একটি কাঁক্‌ড়ার ওজন হয় ৩০০-৫০০ গ্রাম। একটি কাঁক্‌ড়া সর্বোচচ ৫ কেজি পর্যন্ত ওজনের পাওয়া গেছে। সাধারণতঃ এক বছর বয়সের কাঁক্‌ড়ার ওজন ৪০০-৫০০ গ্রাম হয়ে থাকে। বাগদা চিংড়ির ন্যায় স্ত্রী কাঁক্‌ড়া গভীর সমুদ্রে "নউপ্লি" ছেড়ে থাকে যা পরিবর্তে পাঁচটি লার্ভা স্তর (Zoea) পার হয়ে "ম্যাগালোপা" (Megalopa) ও পোষ্ট লার্ভা স্তরে উপনীত হয়। এরা জোয়ার, ঢেউ ও বাতাসে উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ এলাকায় ভেসে আসে এবং কিশোর (Juvenile) স্তরে উপনীত হয়। একটি স্ত্রী কাঁক্‌ড়া ১-৮ মিলিয়ন ডিম দিতে পারে। বাগদা চিংড়ির ন্যায় কাক্‌ড়ার খোলস রয়েছে যা চিংড়ির চেয়ে অপেক্ষাকৃত শক্ত এবং দৈহিক বৃদ্ধির জন্য কাঁকড়া খোলচ পরিবর্তন করে থাকে। এদের নিজ প্রজাতি ভক্ষনের প্রবণতা রয়েছে এবং শক্ত চিমটা দ্বারা সহজে অন্য প্রাণীকে মেরে ফেলতে পারে।

কাঁক্‌ড়া মাটিতে এবং বাঁধে গর্ত করতে পছন্দ করে। ডুবন্ত গাছের শেঁকড় ও ডালপালায় এরা আশ্রয় নেয়। তাই ম্যানগ্রোভ এলাকায় এদেরকে পাওয়া যায়। পানি ছাড়া কাঁকড়া দীর্ঘ সময় বাঁচতে পারে এবং হেঁটে এক স্থান থেকে সহজে অন্য স্থানে চলে যেতে পারে।

কাঁকড়া চাষের প্রধান সুবিধাসমূহ

- বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চলে চাষের পরিবেশ বিদ্যমান।
- আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা থাকায় এর উৎপাদন লাভজনক।
- বর্তমানে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক পোনা (কিশোর) পাওয়া যায়।
- কাঁকড়ার খাবার স্বল্পমূল্যে সংগ্রহ সম্ভব।
- ওজন হিসাবে কাঁকড়ার বৃদ্ধি হার বেশী।
- কাঁকড়া রপ্তানীর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায়।
- কাঁকড়া পানি ব্যতীত অনেকক্ষণ বেঁচে থাকতে পারে এবং প্রতিকূল পরিবেশ সহ্য করতে পারে।
- পঁচা আবর্জনা খেয়ে পরিবেশ বিশুদ্ধ করে।

কাঁকড়া চাষের উপযুক্ত পরিবেশ

বাগদা চিংড়ির ন্যায় কাঁকড়া উপকূলীয় লবণাক্ত পানিতে চাষ করা যায়। কাঁকড়া চাষের মাটি ও পানির গুণাবলী নিম্নরূপ হওয়া বাঞ্চনীয়।

মাটির গুণাবলী

(ক) নরম দোঁয়াশ বা এঁটেল মাটি।
(খ) হাইড্রোজেন সালফাইট ও এ্যামনিয়া গ্যাসমুক্ত মাটি।
(গ) জৈব পদার্থ ৭%-১২%।
(ঘ) এসিড সালফেট মুক্ত মাটি।
(ঙ) হালকা শেওলা ও জলজ আগাছাযুক্ত পরিবেশ।

পানির গুণাবলী

(ক) লবণাক্ততা ঃ ১০-১৫ পিপিটি
(খ) তাপমাত্রা ঃ ২৫-৩২°সেঃ
(গ) পিএইচ ঃ ৭.৫-৮.৫
(ঘ) এ্যালকালিনিটি ঃ >৮০ মিগ্রা/লিঃ
(ঙ) হার্ডনেস্ ঃ ৪০-১০০ পিপিএম
(চ) দ্রবীভূত অক্সিজেন ঃ ৪ পিপিএম এর উর্ধ্বে

কাঁক্‌ড়া চাষের স্থান নির্বাচন

কাঁক্‌ড়া খামার বা পুকুরে প্রতিনিয়ত লবণাক্ত পানি পরিবর্তনের যথেষ্ট সুযোগ থাকতে হবে। বছরে ৮-১০ মাস ৫ পিপিটির উর্ধ্বে লবণাক্ততা থাকে এরূপ স্থান কাঁকড়া চাষের উপযোগী। কাঁক্‌ড়া চাষ এলাকা বন্যপ্রাণী ও পাখিমুক্ত থাকতে হবে।

কাঁকড়া চাষের পুকুর নির্মাণ

কাঁকড়া হেঁটে বেড়াতে অভ্যস্ত। তাছাড়া মাটিতে গর্ত করে লুকিয়ে থাকতে পছন্দ করে। তাই বাঁধের অভ্যন্তরে বেড়া স্থাপন করা আবশ্যক। বেড়ার উচচতা পানির উপরে ০.৫ মিটার রাখতে হবে। পুকুরের অভ্যন্তরে এই বেড়া বাঁশের ঘন পাটা, গাছের ঘন কঞ্চির বুনন, সিমেন্ট দেয়া বা এ্যাসবেসটাস দ্বারা তৈরী করা যায়। এই বেড়া কমপক্ষে ০.৫ মিটার মাটির নিচে বসিয়ে দিতে হবে যেন কাঁকড়া বেড়ার নিচ দিয়ে গর্ত করে পালিয়ে যেতে না পারে। এছাড়া বেড়ার বুনন এমন ঘন হতে হবে যেন কিশোর কাঁকড়া ফাঁক দিয়ে পালিয়ে যেতে না পারে এবং অন্য ক্ষতিকর প্রাণী কাঁকড়ার পুকুরে প্রবেশ করতে না পারে। পুকুর শুকানো এবং পানি সরবরাহের ব্যবস্থা থাকতে হবে। পুকুরের আয়তন ০.২-১.০ হেঃ হলে ব্যবস্থাপনার সুবিধা হয়। পুকুরের গভীরতা ১.০-১.৫ মিটার রাখা ভাল।

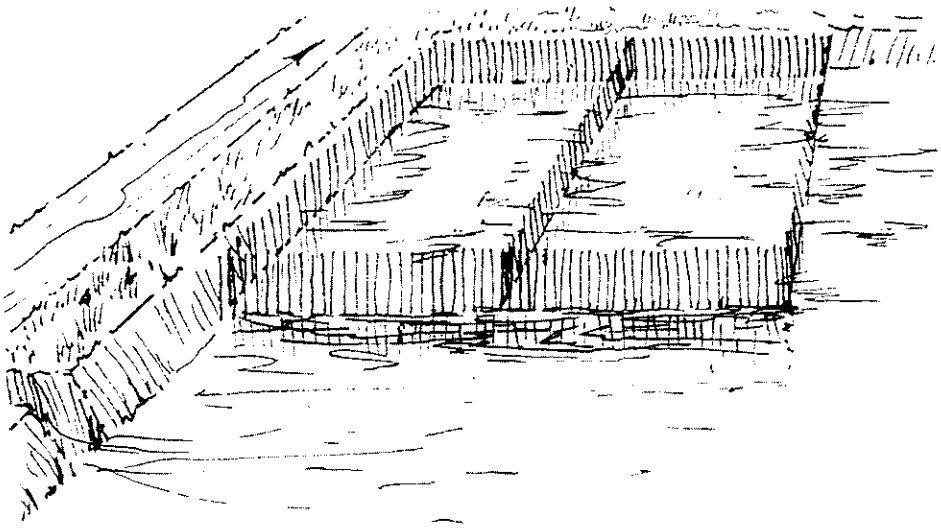

চিত্র ঃ ১১০ কাকড়া চাষের পুকুর

পুকুর শুকানো ও ধৌতকরণ

পুকুরের মাটি শুকাতে হবে। শুকাবার পরে মাটির উপরের স্ল লবন, বিষাক্ত পদার্থ অপসারণের জন্য পুকুরের তলদেশ ধৌত করতে হবে। পানি তুলে পুনরায় একদিন পর পানি ছেড়ে ধৌত প্রক্রিয়া সমাধান করা যায়। পুকুরের তলদেশ চাষ দেয়ার প্রয়োজন হলে চাষ দেয়ার পর একই নিয়মে তা পুনরায় ধৌত করতে হবে।

চুন প্রয়োগ

হেক্টর প্রতি সাধারণতঃ ৩০০-৮০০ কেজি CaO (কলিচুন) চাষ পূর্বক মাটিতে দিতে হবে। মাটির পি,এইচ নির্ধারণ পূর্বক চুন প্রয়োগ করা উচিত। মাটির পি,এইচ এর ভিত্তিতে নিম্নোক্ত হারে চুন দেয়া যায়।

মাটির পি এইচ	চুন প্রয়োগের পরিমাণ(টন/হেক্টর)	
	কৃষি চুন বা ডলোমাইট	কলিচুন
>৬.০	১-২	০৫-১.০
৫.০-৬.০	২-৩	১.০-১.৫
<৫.০	৩.৫	১.৫-২.৫

আশ্রয় স্থল সৃষ্টি

কাঁক্‌ড়া খোলস ছাড়ার সময় জলজ প্রাণীর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য লুকিয়ে থাকতে পছন্দ করে। চাষ পুকুরে বাঁশের কঞ্চি দ্বারা আশ্রয় স্থল তৈরী করা যায়। তাছাড়া সিমেন্টের পাইপ বা পিভিসি পাইপের টুকরাও ব্যবহার করা যায়। সাধারণতঃ ১০-১৫ সেঃ মিঃ ব্যাসের পাইপ ব্যবহার করা যায়। পাইপের ব্যাস বিভিন্ন সাইজের হলে ছোট বড় কাঁক্‌ড়া তাদের পছন্দ মত স্থানে আশ্রয় নিতে পারে। পুকুরের তলদেশে এবং অভ্যন্তরে বেড়ার পার্শ্বে এই আশ্রয় স্থল স্থাপন করা যায়। পচনশীল দ্রব্য আশ্রয়ের জন্য ব্যবহার করা যাবে না।

পুকুরে পানি উত্তোলন ও সার প্রয়োগ

চিংড়ি চাষের ন্যায় কাঁক্‌ড়ার চাষ এলাকায় অন্য প্রাণির অনুপ্রবেশ রোধ করার জন্য সবসময় ০.২৫ মিঃমিঃ ছিদ্রযুক্ত নাইলন জাল দিয়ে পানি ছেকে তুলতে হবে। প্রথমবার ৩০ সেঃ মিঃ পানি পুকুরে উঠিয়ে পানিতে জৈব সার ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা যায়। পানিতে সার একত্রে সব না দিয়ে কয়েক ভাগে ভাগ করে প্রয়োগ করা হলে সারের সুষ্ঠু ব্যবহার করা যায়। যা আর্থিকভাবেও লাভজনক। হেক্টর প্রতি ৫০০ কেজি জৈব সার, ১৫কেজি টিএসপি এবং ১০ কেজি ইউরিয়া সার পানিতে গুলে সর্বত্র ছিটিয়ে দিতে হবে। পানির রং এবং ফাইটোপ্লাংকটনের উৎপাদনের পরিমাণ অনুসারে সার প্রয়োগ করতে হবে। সার প্রয়োগের পাশাপাশি ক্রমান্বয়ে পানির গভীরতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং পানির গভীরতা ১ মিটারের মধ্যে থাকা বাঞ্চনীয়। পানিতে উৎপাদিত ফাইটোপ্লাংকটন কাঁকড়ার খাদ্য উপাদান বৃদ্ধিতে সহায়তার পাশাপাশি পুকুরের তলায় ছায়া দেয়। কাঁকড়া সুর্যের আলো সহ্য করতে পারে না এবং ছায়া পছন্দ করে। এছাড়া প্লাংকটন পানির গুণাগুণ সঠিক মাত্রায় রাখতে সাহায্য করে ও বিষাক্ত পদার্থ অপসারণের সহায়তা করে।

কাঁক্‌ড়া মজুদকরণ

বর্তমানে কাঁকড়া চাষ বলতে কাঁক্‌ড়া মোটা তাজা করাকেই বুঝায়। কিশোর কাঁক্‌ড়া বাঁশের চাই বা ফাঁদ, পাতা জাল, থলে জাল দিয়ে ধরা যায়। ২০-৪০ গ্রাম ওজনের ৮-১০ হাজার কাঁক্‌ড়া প্রতি হেক্টরে মজুদ করা যায়। স্ত্রী কাঁক্‌ড়ার চাষ বেশী লাভজনক। তাই স্ত্রী ও পুরুষের অনুপাত ৯:১ বা ৯০% স্ত্রী ১০% পুরুষ করা হলে ভালো হয়। কিশোর স্ত্রী ও পুরুষ কাঁক্‌ড়া সহজে কাঁক্‌ড়ার চিমটা পা ও বুকের ফ্ল্যাপ দেখে সনাক্ত করা যায়। পুরুষ কাঁক্‌ড়ার চিমটা পা বড়, স্ত্রী কাঁক্‌ড়ার চিমটা পা একই বয়সে পুরুষ কাঁক্‌ড়ার চেয়ে ছোট। স্ত্রী কাঁক্‌ড়ার বুকের ফ্লাপটি অর্ধ গোলাকার অন্য দিকে পুরুষ কাঁক্‌ড়ার ফ্লাপটি অপেক্ষাকৃত সরু ও ইংরেজী ভি আকৃতির। একই বয়সের কাঁক্‌ড়া একত্রে সংগ্রহ করা অত্যন্ত কঠিন। তাই ওজন ভিত্তিতে কাছাকাছি ওজনের কাঁক্‌ড়া মজুদ করা হলে চাষকালীন পরিচর্যায় সুবিধা হয়। কিশোর কাঁক্‌ড়া একস্থান হতে অন্য স্থানে বাঁশের ঝুড়িতে পরিবহন করা যায়। বিক্রীর জন্য গোনাড বিশিষ্ট স্ত্রী কাঁক্‌ড়া গোনাড/ডিম্বাশয়বিহীন অবস্থায় পাওয়া যায় সেগুলো স্থানীভাষায় খোসা কাঁক্‌ড়া বলা হয়। এই খোসা কাঁক্‌ড়া বা নরম খোলস বিশিষ্ট কাঁক্‌ড়া নির্ধারিত পুকুরে ১৫-২০ দিন রেখে উপযুক্ত খাবার দেওয়া হয়। ইহাকে কাঁক্‌ড়া ফেটেনিং বলা হয়। কাঁক্‌ড়া ফেটেনিং পদ্ধতি অনেক স্থানেই প্রচলিত আছে।

খাবার সরবরাহ

কাঁক্‌ড়া সর্বভূক। এরা সাধারণতঃ জীবন্ত খাদ্য খেতে পছন্দ করে। ছোট ছোট মাছ, সামুদ্রিক ক্রিমি, শামুক, ঝিনুক, কীট পতঙ্গ খেয়ে থাকে। তবে ময়লা ও পচা জৈব পদার্থ জাতীয় খাবারও এরা খায়। খাদ্য হিসাবে ছোট মাছ, শামুক, ঝিনুকের মাংস, চিংড়ি ও চিংড়ির মাথা, বিভিন্ন প্রকার দেহাবশেষ ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়। কাঁক্‌ড়ার খোলস তৈরীর জন্য ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাদ্য প্রয়োজন। তাই মাংসের হাড় বা কাটাও কাঁক্‌ড়া খেয়ে থাকে। এছাড়া চালের কুড়া, গমের ভুষি, আটা, ফিস মিল ইত্যাদি মিশ্রণপূর্বক কাঁক্‌ড়ার খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায়। কাঁক্‌ড়ার দেহের বৃদ্ধির সাথে সাথে খাদ্য চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ট্রেতে খাবার দিয়ে খাদ্য গ্রহণের প্রবণতা পর্যবেক্ষণ পূর্বক খাবার সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে। কাঁকড়া বাগদা চিংড়ির ন্যায় নিশাচর প্রাণী। তাই বিকালে বা সন্ধ্যায় ও রাতে প্রত্যহ ২-৩ বার খাবার দিতে হয়।

পানি ব্যবস্থাপনা

অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় জোয়ার-ভাটার প্রভাবে কাঁকড়ার পুকুরের পানি পরিবর্তন করা যায়। পানির গুনাগুন রক্ষার জন্য নিয়মিত চুন ও সার প্রয়োগ করতে হবে। কোন কারণে প্লাংকটন মারা গেলে কিংবা পানি দূষিত হলে সাথে সাথে পানি পরিবর্তনের ব্যবস্থা নিতে হবে। কাঁকড়া উপযুক্ত পরিবেশ না পেলে অন্যত্র বের হয়ে যায়। কাঁকড়া শক্ত প্রাণি বটে কিন্তু পরিবেশের তারতম্যে বা পানি দূষিত হওয়ার কারণে এরা মারা যায় এবং উৎপাদন ব্যাহত হয়।

কাঁকড়া আহরণ ও বাজারজাতকরণ

মজুদের ৩-৪ মাস পর কাঁকড়া আহরণ করা যায়। বাংলাদেশে সবচেয়ে চাষের উপযুক্ত সময় মার্চ থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত। এ সময় পানির গুণাগুণ ও তাপমাত্রা উপযুক্ত পর্যায়ে থাকে। কাঁকড়া ধরার জন্য বাঁশের চাই অথবা জালের তৈরী ফাঁদ সবচেয়ে উপযুক্ত। ধরার সময় কাঁকড়ার পা ভেঙ্গে গেলে বাজারজাত করা যায় না। লিফ্‌ট নেট বা চাই-ফাঁদে খাবার দিয়ে কাঁকড়া পর্যায়ক্রমে ধরা যায়। কাঁকড়া ধরার আগেই পুকুরে খাবার সরবরাহ বন্ধ রাখতে হবে। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় হেক্টর প্রতি ১২০০-১৫০০ কেজি কাঁকড়া উৎপাদন করা যায়।

কাঁকড়া একপাত্র থেকে অন্য পাত্রে নেয়া বা রাখার সময় বাঁশের চিমটা এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যেন পা ভেঙ্গে না যায়। কাঁকড়াকে পিছন থেকে চিমটা বা হাত দিয়ে ধরা যায়। বর্তমানে জীবন্ত কাঁকড়া বিদেশে রপ্তানী হয়ে থাকে। তাই কাঁকড়া চিমটা বা প্লাস্টিকের ফিতা দিয়ে ভালোভাবে বেঁধে ঝুড়িতে ভর্তি করে বাজারজাত করা যায়। পরিবহনের সময় ঝুড়িতে স্যাত স্যাতে ভাব বজায় রাখার জন্য লবণ পানি ছিটিয়ে দিতে হয়। কাঁকড়া ঝুড়ি অন্ধকার/ছায়াযুক্ত ঠান্ডা স্থানে রাখতে হয়। সঠিকভাবে চাষ করা গেলে বর্তমান হিসাবে প্রতি কেজিতে ৬০ টাকারও বেশী নীট লাভ করা যায়। কাঁকড়াও একটি চাষযোগ্য প্রাণি এবং এর উৎপাদন একটি লাভজনক বিনিয়োগ।

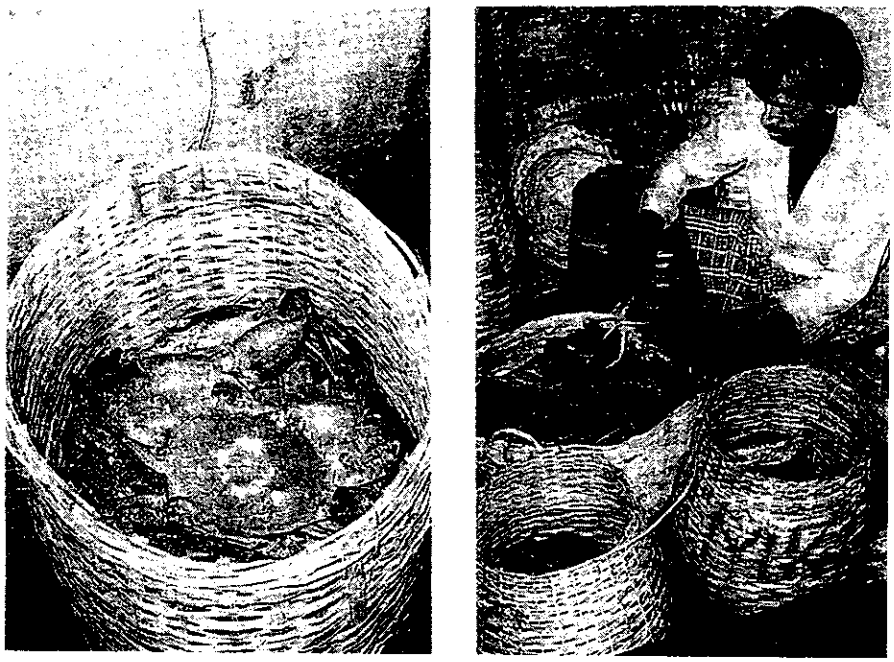

চিত্র ঃ ১১১ ঝুড়ি ভর্তি শিলা কাকড়া

অষ্টম অধ্যায়

অপ্রচলিত জলাভূমিতে মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা

বিল-বাওড়ে মাছ চাষ ও ব্যবস্হাপনা

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয় সমুহের মধ্যে বিল-বাওড় জাতীয় জলাশয় মাছ উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক অনন্য স্থান দখল করে আছে। দেশের হাওড় অঞ্চল বা নদী অববাহিকায় অথবা অন্য কোন স্হানের অপেক্ষাকৃত নীচু জলাভুমিকে সাধারণতঃ বিল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। অপরদিকে প্রবাহমান নদীর গতিপথ পরিবর্তনের ফলে পর্বতন ধারার মৃতপ্রায় নদীর অংশ বা খন্ডকে সাধারণভাবে বাওড় হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। বিলসমূহ সমগ্র দেশব্যাপি বিস্তৃত। বাওড় শুধুমাত্র দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে বিশেষ করে বৃহত্তর যশোর, কুষ্টিয়া ও ফরিদপুর এলাকায় অবস্থিত । বিল ও বাওড় উভয় প্রকার জলাশয় বদ্ধ এবং অর্ধ উন্মুক্ত দুই-ই হতে.পারে। বাংলাদেশে ১.১৪ লক্ষ হেক্টর বিল এবং ৫,৪৮৮ হেক্টর বাওড় রয়েছে।

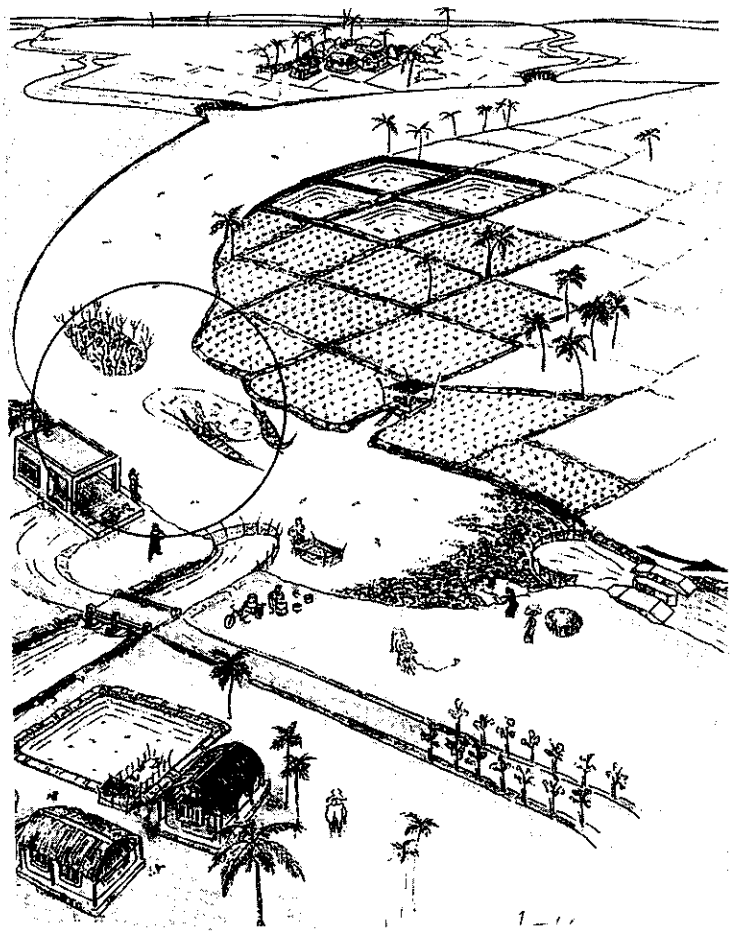

চিত্র ঃ ১১২ বাওড়ে মাছ চাষ ও ব্যবস্থাপনার চিত্র

দেশের বিভিন্ন এলাকায় বিল-বাওড় সমূহের পরিবেশ ও প্রকৃতি ভিন্ন । হাওড় অভ্যন্তরস্থ বিলগুলির পরিবেশ প্লাবনভূমিসহ বিস্তীর্ণ এলাকার শস্য উৎপাদন ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভরশীল। হাওড় অঞ্চলের বিলে ও পার্শ্ববর্তী জমিগুলোতে ধান ও অন্যান্য শস্য আবাদ করা হয় বলে ব্যবহৃত রাসায়নিক সারের ক্রিয়া বিদ্যমান থাকে। নদীর সংগে সংযুক্ত বিল সমূহের পরিবেশ নির্ভর করে নদীর পানির গুণাগুণের উপর। তবে বদ্ধ বিল ও বাওড়ের পরিবেশ এ থেকে ভিন্নতর ও মাছ চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টি ও বন্যার পানি পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে অজৈব সারের ধোয়ানী, ফসফেট ও নাইট্রেট, জৈব পদার্থ ও তলানী বিল ও বাওড়ে বয়ে আনে। এ সকল কারণে বিল ও বাওড়ের পানি ও মাটি উর্বর থাকে ফলে প্রাকৃতিক খাবারও উৎপাদিত হয়। বিদ্যমান প্রাকৃতিক খাবার খেয়ে মাছের সন্তোষজনক বৃদ্ধি ঘটে। সাধারণতঃ বিল-বাওড় জাতীয় জলাশয়ে কোন সার বা খাবার প্রয়োগের প্রয়োজন হয়না। বিল ও বাওড় জলাশয়গুলি সারা বছর স্বাদু পানির সকল প্রজাতির মাছের চারণভূমি ও উৎকৃষ্ট আবাসস্হল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বর্ষা মৌসুমে এ সকল জলাশয় মাগুর, শিং, কৈ, টেংরা, চান্দা, মলা, পাবদা, শোল, গজার, বোয়াল, চিতল ইত্যাদি মাছের প্রজনন ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্লাবনভুমি অভ্যন্তরস্থ বিলগুলোতে বর্ষা মৌসুমে পানি আসার সময় শিং, মাগুর, শোল, পুঁটি, টাকি, টেংরা ইত্যাদি প্রজাতির মাছ প্রজনন করে।

আগাছা দমন

বিল ও বাওড়ের পানি উর্বর থাকায় এতে বিভিন্ন প্রকার আগাছা জন্মে থাকে। কচুরীপানা, শাপলা, পাতা শেওলা ইত্যাদি ক্ষতিকর জলজ আগাছাসমূহ পানির উর্বরতা শক্তি কমিয়ে এর গুণাগুণ নষ্ট করে ফেলে। কচুরীপানা ও অন্যান্য আগাছা পানির সকল সার জাতীয় পদার্থ শোষণ করে বলে প্রাকৃতিক খাবার বিশেষ করে ক্ষুদ্র প্রাণী ও উদ্ভিদ কণা জন্মানো বাধাগ্রস্হ হয়। কচুরীপানা ও অন্যান্য ভাসমান আগাছা পানির উপরিস্তরে ভাসমান অবস্হায় থাকায় বাতাস হতে পানিতে অক্সিজেন মিশ্রণে ও সূর্যের আলো প্রবেশে বাধা দেয়। এতে পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরী না হওয়ায় কার্প বা রুই জাতীয় মাছের উৎপাদন আশানুরুপ হয়না। ভাসমান কচুরীপানা জাতীয় আগাছা মাছ আহরণকালে জাল টানতেও বাধার সৃষ্টি করে। এ সকল কারণে বিল ও বাওড় থেকে কচুরীপানা সরিয়ে ফেলা দরকার । কচুরীপানা সরিয়ে ফেললে পানিতে বিদ্যমান সার জাতীয় পদার্থ বিশেষ করে নাইট্রেট ও ফসফেট সহজলভ্য হয় ফলে বিভিন্ন প্রকার প্রানিকণা ও ক্ষুদে শ্যাওলা সহ অন্যান্য জলজ উদ্ভিদকণার জন্ম হয়, যা মাছ খেয়ে থাকে। এগুলো খেয়ে মাছ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। উপরিস্তরের মাছের নিঃসরিত বর্জ্য পদার্থ সমূহ নীচের স্তরের মাছের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

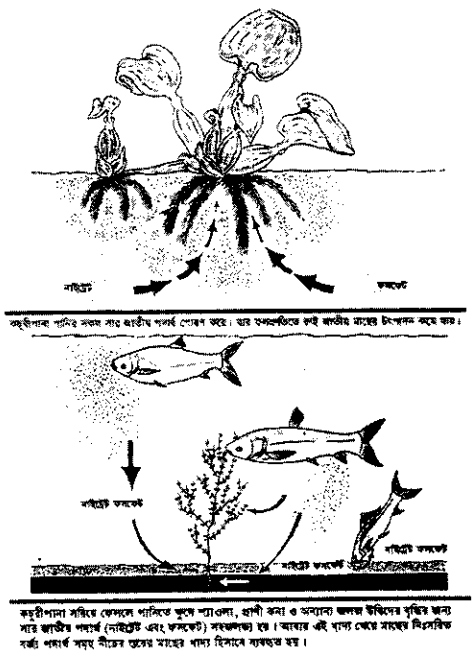

চিত্র ঃ ১১৩ কচুরী পানার ও সার জাতীয় পদার্থের সম্পর্ক

হাওড় এলাকার বিলগুলোতে নল খাগরা, তারা, চাইল্যা, বনতুলশি ইত্যাদি আগাছা জন্মে থাকে যা ক্ষতিকর হিসাবে চিহ্নিত। ক্ষতিকর সকল ধরণের আগাছা বিল ও বাওড় থেকে অবশ্যই সরিয়ে ফেলতে হবে। অপসারিত কচুরীপানা পশুর খাদ্য ও কম্পোষ্ট সার তৈরীতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

কাটা শেওলা, ঝাঝি, কলমী, ক্ষুদিপানা, শিংরা ইত্যাদি আগাছাপূর্ণ স্থানগুলো বিলে প্রজননকারী মাছের নিরাপদ আশ্রয় ও প্রজননস্থল হিসাবে ব্যবহার হয়ে থাকে। এ ধরণের আগাছা জলাশয়কে উর্বরতার আধিক্যজনিত অপকার থেকে রক্ষা করে। তবে জলাশয়ে যাতে এগুলো অধিক বিস্তার লাভ না করে সেজন্যে যথাযথ নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে। হাওড় অঞ্চলের বিলে হিজল, করচ, মান্দাইর, মেরা, বরুন ইত্যাদি জলজ বৃক্ষ জন্মে থাকে যা পরিবেশ সহায়ক বলে গণ্য হয়।

চিত্র ঃ ১১৪ বিল বাওড়ে মাছ চাষের পূর্বে কচুরীপানা সরিয়ে ফেলতে হবে

পোনা মজুদ

বদ্ধ বিল-বাওড়ে মাছের চাষ ও উৎপাদন বাড়াতে হলে পোনা ছাড়া আবশ্যক। হাওড় ও প্লাবনভুমির অভ্যন্তরস্থ এবং নদীর সাথে সংযুক্ত বিলগুলোতে বহিঃ উৎস থেকে রুইজাতীয় ও অন্যান্য মাছের প্রবেশ ঘটে। তৎসত্বেও এ ধরণের জলাশয়েও অধিক উৎপাদনের জন্য পোনা ছাড়া দরকার। বিল-বাওড়ে পোনা ছাড়ার সংখ্যা নির্ভর করে এতে বিদ্যমান মাছের মজুদ ও প্রাকৃতিক খাবারের উপস্থিতির উপর। জাল টেনে বিদ্যমান মাছের মজুদ যাচাই করা যায়। কোন জলাশয়ের প্রাকৃতিক খাবারের উপস্থিতি সেচী-ডিস্ক দ্বারা পরিমাপ করা যেতে পারে । সেচী গভীরতা কম হলে তাতে প্রাকৃতিক খাদ্য বেশী থাকে। সেক্ষেত্রে অধিক পোনা মজুদ করা যেতে পারে। অপরদিকে সেচী গভীরতা বেশী হলে ধরে নিতে হবে জলাশয়ে প্রাকৃতিক খাবার কম এবং সেক্ষেত্রে কম সংখ্যক পোনা মজুদ করতে হবে। বিল-বাওড় জাতীয় জলাশয়ে রাক্ষুসে মাছের (বোয়াল, গজার, শোল, চিতল, ইত্যাদি) উপস্থিতি থাকায় এ ধরনের জলাশয়ে ৫″-৬″ (১২-১৫ সেঃ মিঃ) আকারের পোনা ছাড়তে হবে। এর নীচের আকারের পোনা কোনক্রমেই ছাড়া উচিত নয়।

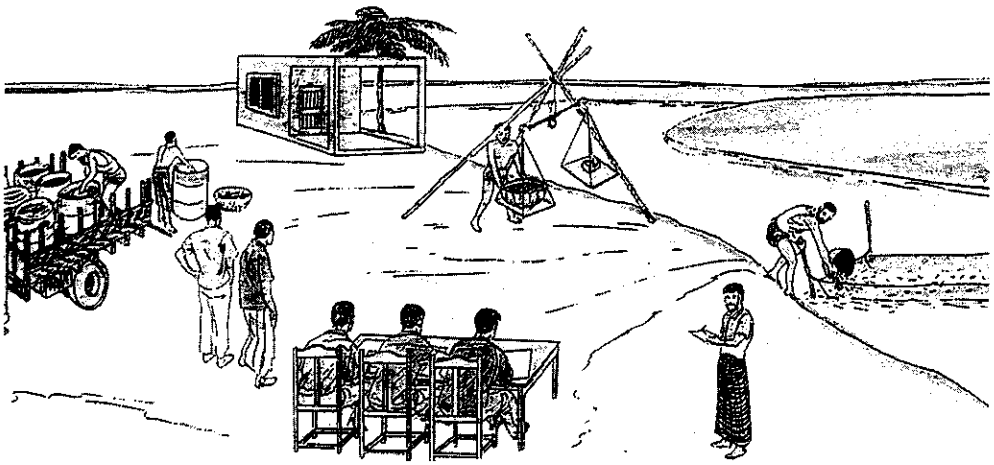

চিত্র ঃ ১১৫ বিল বাওড়ে পোনা মজুদ

খাদ্যের প্রাচুর্য্যতার ভিত্তিতে বিল-বাওড় জাতীয় জলাশয়ে পোনা মজুদেরঘনত্ব এবং বিভিন্ন প্রজাতির মাছের শতকরা হার নিম্নের দু'টি ছকে প্রদর্শন করা হলো ঃ

খাদ্যের প্রাচুর্য্যতা		প্রজাতি	সংখ্যা (প্রতি হেক্টরে)	শতকরা হার
সেচী গভীরতা ১০০ সেঃ মিঃ এর নীচে হলে (অধিক প্রাকৃতিক খাদ্য বিদ্যমান)	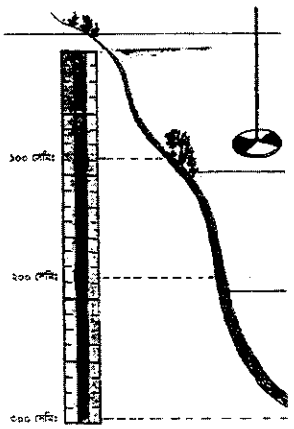	কাতলা	৫০০	১০%
		সিলভার কার্প	১৫০০	৩০%
		গ্রাসকার্প	৫০০	১০%
		রুই	১২৫০	২৫%
		মৃগেল	৫০০	১০%
		কমন কার্প	৭৫০	১৫%
মোট			৫০০০	১০০%

অথবা

খাদ্যের প্রাচুর্য্যতা		প্রজাতি	সংখ্যা (প্রতি হেক্টরে)	শতকরা হার
সেচী গভীরতা ১০০ সেঃ মিঃ এর উপরে হলে প্রাকৃতিকখাদ্যের পরিমাণ কম)	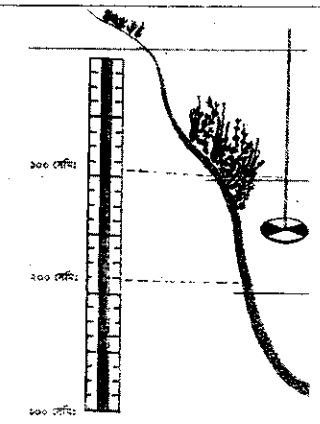	কাতলা	৩০০	১০%
		সিলভার কার্প	৪৫০	১৫%
		গ্রাসকার্প	৪৫০	১৫%
		রুই	৭৫০	২৫%
		মৃগেল	৪৫০	১৫%
		কমন কার্প	৬০০	২০%
মোট		৩০০০	১০০%	

* সুত্র ঃ বিল ও বাওড় মৎস্য উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনা প্রকল্প কর্তৃক প্রকাশিত পোষ্টার পুস্তিকা ।

উপরোক্ত ছকদ্বয়ে বর্নিত পোনার সংখ্যা জলাশয়ের অবস্থাভেদে কমবেশী হতে পারে। কোন জলাশয়ে উদ্ভিদকণা বেশী থাকলে তাতে সিলভারকার্প কিছু বেশী সংখ্যায় মজুদ করা যেতে পারে। জলাশয়ে জলজ আগাছা বেশী হলে গ্রাসকার্প ও কমন কার্পের সংখ্যা বাড়িয়ে দেয়া যেতে পারে। চাপিলা, চান্দা, মলা, ইচা ইত্যাদি প্রজাতির মাছ জলাশয়ে বেশী থাকলে অথবা চাষ করতে হলে সেক্ষেত্রে সিলভারকাপের্র পোনার সংখ্যা কমিয়ে নির্ণয় করতে হবে। জলজ আগাছা কম থাকলে গ্রাসকার্পের পোনার সংখ্যাও কমাতে হবে। গ্রাসকার্প পাশ্ববর্তী ধানক্ষেতের কোন ক্ষতি করে কিনা তৎসম্পর্কে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। এ ধরনের আশংকা থাকলে গ্রাসকার্প মজুদ না করাই ভাল। অবস্হান ও পরিস্হিতি ভেদে বিল-বাওড় প্রকৃতির জলাশয়ে পোনা সাধারনতঃ বছরের দুটি সময়ে ছাড়া হয়। এর একটি সময় হলো মাঘ ও ফাল্গুন মাস (জানুয়ারীর মাঝামাঝি থেকে মার্চ এর মাঝামাঝি পর্যন্ত) এবং অপরটি হলো আষাঢ় থেকে আশ্বিন মাস (জুন এর মাঝামাঝি থেকে সেপ্টেম্বর এর মাঝামাঝি পর্যন্ত)। উন্মুক্ত অথবা বদ্ধ কোন্ প্রকার বিলে বা বাওড়ে কখন কি প্রজাতির মাছ ছাড়তে হবে তা স্থানীয়ভাবে নির্দ্ধারন করে নেয়া যেতে পারে। পোনার আকার নিশ্চিত করতে এবং পরিবহনজনিত মৃত্যুঝুকি ও ব্যয় কমাতে সম্ভব হলে বিলের কিনারায় অথবা পাশ্ববর্তী এলাকায় বিল নার্সারী স্থাপন করা যেতে পারে।

অবকাঠামো উন্নয়ন ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা

হাওড় অভ্যন্তরস্থ বিল সমূহ শুষ্ক মৌসুমে যখন একটি থেকে অপরটি পৃথক হয়ে যায় তখন মাছ মজুদ ও এর সুষ্ঠুভাবে পরিচর্যা করা হলে ঐ সকল বিলে আশানুরুপ উৎপাদন পাওয়া যায়। একই ভাবে নদীর সাথে সংযুক্ত বিল সমূহ শুষ্ক মৌসুমে নদী হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে পোনা মজুদের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। তবে শূষ্ক মৌসুমে নদীর সাথে বিলের সংযোগ বিচ্ছিন্ন না হলে সেক্ষেত্রে সাময়িক ভাবে বাঁশের বানা বা পাটা দিয়ে ঘের তৈরী করে মাছ চাষ করা যেতে পারে। তবে বানা বা পাটার দুই চটার মধ্যবর্তী ফাকের প্রশস্থতা এমন হতে হবে যাতে মাছ বের হয়ে না যেতে পারে। বাওড় সমূহে পাটা স্থাপন করতে হলে বর্ষার সর্বোচচ পানির উচচতার চেয়ে পাটার উচচতা অন্ততঃ ২′- ২.৫′ ফুট (৬০ - ৭৫ সেঃ মিঃ) বেশী করতে হবে। বদ্ধ বিল সমূহের পাড় বর্ষাকালে ডুবে যাওয়ার আশংকা থাকলে তা উঁচু করে নিতে হবে। এর সাথে কোন খাল বা সেচ নালার সংযোগ থাকলে সংযোগস্থলে প্রয়োজন অনুসারে স্ক্রীন দেয়া যেতে পারে অথবা সংযোগ বন্ধ করে মাছ চাষের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। বিল-বাওড়ের অভ্যন্তরভাগে যে স্হানে গভীরতা বেশী সেখানে জলজ বৃক্ষের ডালপালা বা কাঠা দিয়ে মাছের আশ্রয়স্থল ও অভয়াশ্রম স্থাপন করা হলে মাছের উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি পায় এবং জীব-বৈচিত্র সংরক্ষিত হয়। বিল ও বাওড়ে মাছ চাষ ব্যবস্থাপনায় অবশ্যই অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা করা দরকার।

উম্মুক্ত বিল সমূহের পার্শ্ববতী এলাকায় অথবা অভ্যন্তরস্থ ধানী জমিতে কীটনাশক ব্যবহারে সচেতন হতে হবে। মাছের জন্য ক্ষতিকারক নয় এমন কীটনাশকের ব্যবহার এবং প্রয়োগ মাত্রা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। বিলের পাড়ে জলজ বৃক্ষ রোপন করলে তা পরিবেশ উন্নয়নে সহায়ক হবে। বর্জ্য বা অন্য কোন প্রকার দূষিত পানি প্রবেশ করে এবং অত্যাধিক আগাছা জমে যাতে জলাশয়ের পরিবেশ নষ্ট হয়ে মাছের রোগ-বালাই ছড়িয়ে না পড়ে তৎসম্পর্কে দৃষ্টি রাখতে হবে।

মাছ আহরণ ও উৎপাদন

বিল বাওড়ের মাছ বিভিন্ন উপায়ে ও বিভিন্ন প্রকার জাল ব্যবহার করে আহরণ করা যেতে পারে। বিল-বাওড় প্রকৃতির জলাশয়ে সাধারণতঃ গ্রাসকার্প, কমন কার্প ও কাতলা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। মৃগেল ও রুই মাছের বৃদ্ধি তুলনামূলক ভাবে কম হয়। বিল-বাওড় জাতীয় জলাশয়ে ছোট মাছের দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে ও উৎপাদন ভাল হয়। মাঝে মাঝে ছোট মাছ (এলাকাভেদে গুড়া মাছ বা রাণী মাছ হিসেবে পরিচিত) আহরণ করা হলে বড় প্রজাতির মাছের উৎপাদন ভাল হয়। সিলভার কার্প ১ কেজি, কাতলা ১ কেজি, গ্রাসকার্প ১.৫ কেজি, রুই ও মৃগেল ৬০০ গ্রাম এবং কমনকার্প ১.৫ কেজি ওজনের হলে ঐগুলি আহরণ ও বিক্রয়যোগ্য হয়। সাধারনত অগ্রহায়ন মাস থেকে আষাঢ় মাস (নভেম্বরের মাঝামাঝি হতে জুন এর মাঝামাঝি কাল পর্যন্ত) পর্যন্ত বিল-বাওড়ের মাছ ধরার উপযুক্ত সময়। শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে বন্যার সময় মাছ ধরা বন্ধ রাখতে হবে। মাছ কখনই যাতে কারেন্ট জাল বা পানি সেচ করে

আহরন না করা হয় তৎসম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। উন্মুক্ত বিলের ডিমওয়ালা মাছ আহরন করা উচিত নয়। উপরোক্ত ব্যবস্হাপনা ও আহরণ পদ্ধতি অনুসরণ করলে বছরে হেক্টর প্রতি গড়ে ১.২-১.৫ টন মাছ উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

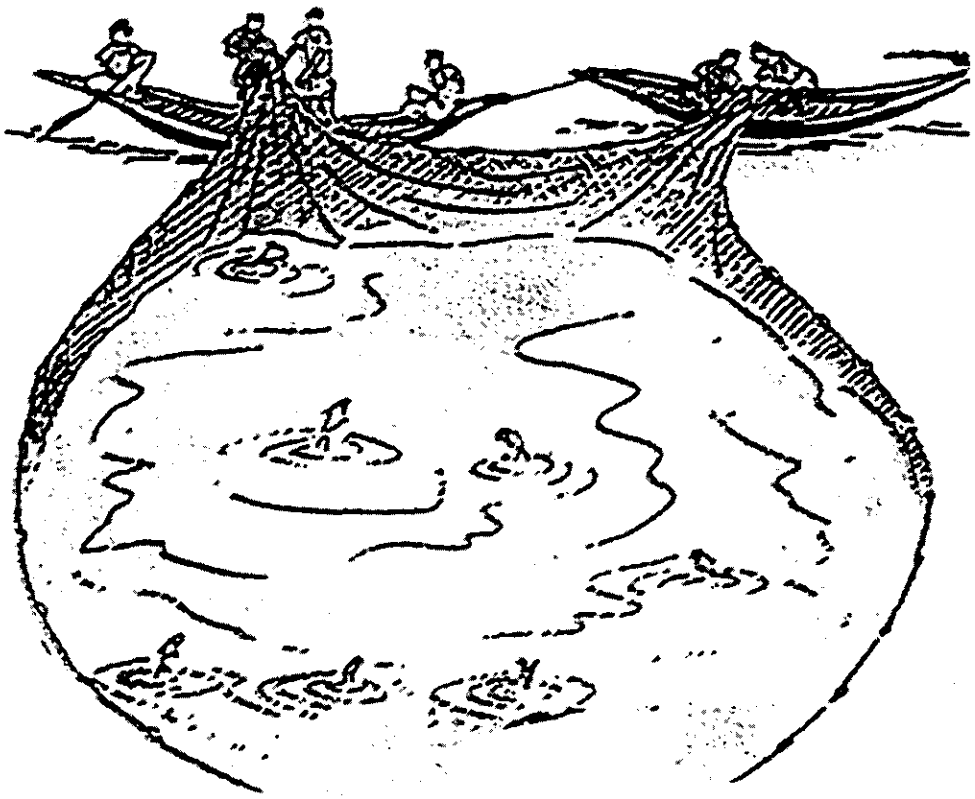

চিত্র ঃ ১১৬ বাওড়ে মাছ আহরণ

প্লাবন-ভূমিতে পেনে মাছ চাষ

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ জলজসম্পদে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। নদী-নালা, খাল, বিল, হাওড়, বন্যা প্লাবিত জলাভূমি ইত্যাদি নিয়ে ৪.৩ মিলিয়ন হেক্টর জলরাশিতে মৎস্য উৎপাদনের সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জ্বল। দেশের ৪৮টি জেলায় রয়েছে সেচ প্রকল্পের খাল। কিন্তু উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বাড়ছে না, অথচ সুষ্ঠু পরিকল্পনা, লাগসই প্রযুক্তি ইত্যাদির মাধ্যমে এই বিরাট জলরাশি থেকে মাছের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়ানো সম্ভব। আপাততঃ দৃষ্টিতে উন্মুক্ত জলাশয়ে নিবিড়/আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে মাছ চাষ উৎপাদন করা যায়। পেন বা ঘের তৈরি করে মরা নদীতে, হাওড়, বাওড়, বন্যা প্লাবিত জলাভূমিতে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে মাছের উৎপাদন বাড়ানোসহ বেকারত্ব দূর করা সম্ভব। এ ছাড়া যৌথ মালিকানার আওতায় দেশের ১৩ লক্ষাধিক পুকুরে সন্তোষজনকভাবে মাছের চাষ করা যাচেছ না। এক্ষেত্রে সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে অধিক মাছ উৎপাদনের লক্ষ্যে এসব জলাশয়ে পেনে মাছ চাষ প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে।

পেনে মাছ চাষ কি

কোন উন্মুক্ত বা আধাবদ্ধ জলাশয়ে এবং প্লাবন ভূমিতে এক বা একাধিক দিক থেকে বাঁশের বানা, বেড়া, জাল বা অন্য কোন উপকরণ দিয়ে ঘিরে উক্ত জলাশয়ের মধ্যে মাছের পোনা মজুদ করে চাষ করাকে পেনে মাছ চাষ বলা হয়।

চিত্র ঃ ১১৭ পেনে মাছ চাষ

পেনে মাছ চাষের গুরুত্ব

- পেনে মাছ চাষ করে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বেকার সমস্যা দুর করা ও অধিক আমিষ উৎপাদন করা যায়।
- অভ্যন্তরীণ পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।

- বহুমালিকানাধীন জলাশয়ের মালিকানা সমস্যা সমাধান করা যায়।

- সরকারী মালিকানাধীন যে সমস্ত জলাশয়ে আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে মাছ চাষ করা সম্ভব নয় সে সমস্ত জলাশয়ে পেন তৈরী করে ছোট ছোট ইউনিটে নিবিড়/আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে মাছ চাষ করে মাছের অধিক উৎপাদন করা সম্ভব।

- জলাশয়ের বহুবিধ ব্যবহার যেমন-কৃষি, সেচ ইত্যাদির কোন অসুবিধা না করেও পেনে মাছ চাষ করা সম্ভব।

- পেনে মাছ চাষ করে দেশের মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ও চাষীর আয় বৃদ্ধি করা যায়।

চাষ পদ্ধতি

- বৎসরে ৬-৮ মাস পানি থাকে এমন মৌসুমী জলাশয় যেমন- সেচ প্রকল্পের খাল, সংযোগ খাল, মরা নদ-নদী, প্লাবন ভূমির অংশ এবং নদ-নদীর খাড়ী অঞ্চলে পেনে মাছ চাষ করা যায়।

- পেনের ঘের বা বেড়া জলাশয়ের তলায় পুঁতে রাখা হয় এবং পেনের ভিতরের পানির সাথে বাহিরের পানির সংযোগ বা প্রবাহ বিদ্যমান থাকে।

- প্রয়োজনবোধে অল্প সময়ে পেন এক স্থান হতে অন্য স্থানে স্থানান্তর ও তৈরি করা যায়।

- যে কোন সময়ে সমান্য শ্রম ও কম খরচে পেনের মাছ ধরা যায়।

পেনে মাছ চাষের অত্যন্ত সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র প্লাবনভূমি। দেশে প্রায় ২৮ লক্ষ হেক্টর প্লাবনভুমি রয়েছে। এর মধ্যে যে সব অঞ্চলে মাছ চাষ যোগ্য গভীরতায় (১ মিটার) ৪-৭ মাস পানি থাকে, প্রাথমিক ভাবে যে সব জলাভুমিতে পর্যায়ক্রমে মাছচাষ শুরু করা যেতে পারে। এ জন্য উপজেলা পর্যায়ে জলাভূমি চিহ্নিত করণের কাজ শুরু করা প্রয়োজন। এই বিশাল সম্পদের আংশিক জলাভুমিতে পেনে মাছচাষের উদ্যোগ নিতে পারলে দেশে মাছের উৎপাদন অনেকাংশে বৃদ্ধি করা সম্ভব।

ব্যবস্থাপনা

- বাঁশের বেড়া অথবা টায়ার কর্ড জাল বা গিটবিহীন নাইলন জাল (জালের ফাঁস ১০ মি.মি. এর কম) দিয়ে পেন তৈরি করা যায়।

- জলাশয়ের মালিকানা, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে ১.০ হেক্টর হতে ১০.০ হেক্টর আয়তনের পেন নির্মাণ করা যেতে পারে।

- যে সমস্ত এলাকায় পানির প্রবাহ বেশী সেসব এলাকায় তলদেশে বাঁশ দ্বারা ৩ মিটার উঁচু বানা তৈরী করে তলদেশের মাটির মধ্যে কিছু অংশ পুঁতে দিতে হবে, যাতে পানির চাপে তলদেশের বালি বা নরম মাটি সরে না যায়।

- পেন তৈরীর পর জাল টেনে যতদুর সম্ভব রাক্ষুসে ও আচাষকৃত মাছ সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে।

- পেনে মাছ চাষের জন্য ১২-১৫ সে.মি. আকারের রুই, কাতলা, মৃগেল, সিলভার কার্প, কমন কার্প, যথাক্রমে ৩০ঃ২০ঃ১০ঃ১০ঃ৩০ হারে হেক্টর প্রতি ৩-৪ হাজার অথবা উপরোক্ত মজুদ ঘনত্বের ৫০ঃ৫০ অনুপাতে রুই জাতীয় মাছ এবং পাঙ্গাস মাছ মজুদ করা যেতে পারে।

- পেনে গিফট জাতীয় তেলাপিয়ার একক চাষও করা যেতে পারে।

- মজুদকৃত মাছের মোট ওজনের ১-৩% হারে সম্পুরক খাবার দিতে হবে।

- ৬-৮ মাস চাষের পরই বিক্রিযোগ্য মাছ পাওয়া যায়। যে সমস্ত জলাশয়ে সারা বৎসর পানি থাকে সে সমস্ত জলাশয় হতে বাৎসরিক ভিত্তিতে মাছ আহরণ করা যেতে পারে।

উৎপাদন

- এভাবে মাছ চাষ করলে পেনে গড়ে হেক্টর প্রতি ১৫০০-২০০০ কেজি মাছ উৎপাদিত হতে পারে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির ফলে শুধুমাত্র পুকুরে মাছ চাষ ও উন্মুক্ত জলাশয় হতে আহরিত মাছ দ্বারা দেশের মাছের চাহিদা পুরণ ও পুষ্টি সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। এ সমস্ত জলাশয়ের উল্লেখযোগ্য অংশে পেনে মাছ চাষ করা সম্ভব। উক্ত জলাশয়ে নিবিড়/আধা-নিবিড়ভাবে পেনে মাছ চাষ করা হলে একদিকে যেমন মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে অন্যদিকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বেকার যুবকের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা সম্ভব হবে।

মহাসড়ক ও রেলওয়ের পাশের জলাশয়ে মাছ চাষ

বেকার যুবকদের জীবনমান উন্নয়ন ও জীবিকা নির্বাহে মাছ চাষ একটি সম্ভাবনাময় ও পরীক্ষিত ক্ষেত্র। দেশের লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত বেকারযুবকদেরকে মাছ চাষে সম্পৃক্ত করে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আমিষের ঘাটতি পূরণসহ মাছ বিক্রির অর্জিত আয় দ্বারা স্বাবলম্বী হয়ে দারিদ্রের অভিশাপ থেকে মুক্ত হওয়া যাবে।

মাছ চাষের প্রচলিত ক্ষেত্রসমূহ হচ্ছে পুকুর দীঘি,বাওড়,ঘের ইত্যাদি। এ সমস্ত জলাশয়ের অধিকাংশই কোন না কোন ভাবে ব্যবহৃত হওয়ায় চাহিদা অনুযায়ী বেকার যুবকদের অধিক হারে সম্পৃক্ত করার সুযোগ কম। এছাড়াও দেশে এমন সব অব্যবহৃত জলাশয় রয়েছে যেগুলো পরিকল্পিত ভাবে ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করলে সহজেই বেকার জনগোষ্ঠীর আত্মকর্মসংস্থানের পথ উন্মোচন করা যাবে। এসব জলাশয়ের অন্যতম হচ্ছে মহাসড়ক ও রেলওয়ের পাশের জলাশয়। বর্তমানে এ সমস্ত জলাশয়গুলোর অধিকাংশই কচুরী পানা ও আবর্জনা দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে পতিত অবস্থায় পড়ে আছে। মশা-মাছির চারণ ও প্রজনন ক্ষেত্র এবং বিভিন্ন রোগের প্রার্দূভাবসহ নানাভাবে পরিবেশের বিপর্যয় ঘটাচ্ছে। দেশে সড়ক ও জনপথের পাশের প্রায় ৮৮৭০ হেঃ এবং রেলওয়ের পাশে প্রায় ৬০০০ হেক্টর জলাভূমি আছে।

জলাশয় প্রাপ্তি, জরিপ ও চিহ্নিত করণ

মহাসড়ক ও রেলওয়ের পাশের জলাশয়গুলোর মালিকানা ন্যস্ত রয়েছে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়াধীন যথাক্রমে সড়ক ও জনপথ বিভাগ এবং রেলওয়ে বিভাগের উপর । উক্ত জলাশয় সমূহ মাছ চাষের কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করতে হলে উপরোক্ত মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সাথে মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় ও মৎস্য অধিদপ্তরের সমঝোতা স্মারক সম্পন্ন করতে হবে। সমঝোতা স্মারক সম্পন্নের পর উপজেলা ও জেলা ভিত্তিক মহাসড়ক ও রেলওয়ের পাশের মাছ চাষ উপযোগী জলাশয় সমূহ জরীপ করে তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। মাছ চাষ ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে মৌসুমী ও মেয়াদী জলাশয় চিহ্নিত করে যে গুলো সংস্কারযোগ্য ও সংস্কার ছাড়াই মাছ চাষ করা যাবে তার অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করা প্রয়োজন।

মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন এফ.সি.ডি.আই প্রকল্পের সাথে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ধীন সড়ক ও জনপথ বিভাগের মধ্যে সম্পন্ন সমঝোতা স্মারকের আলোকে দেশের নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় এসব কার্যক্রম সীমিত ভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

দলগঠন ঃ নীতিমালা ও কার্যক্রম

চাষ উপযোগী মহাসড়ক ও রেলওয়ের পাশের জলাশয় সমূহ মাছ চাষের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য একটি নীতিমালার আলোকে সুফলভোগী দলগঠন করা যায়। দলগঠনের নীতিমালায় থাকবে (ক) দলের প্রতিটি সদস্যকে জলাশয়ের আশে পাশের অধিবাসী হতে হবে। (খ) দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত বেকার যুবক ও যুব মহিলা নিয়ে দলগঠনে অগ্রধিকার প্রাপ্ত হবে। (গ) দলের সদস্য সংখ্যা জলাশয় অনুপাতে হেক্টর প্রতি ৫-৬ পরিবারের মধ্যে হবে। (ঘ) দলের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একটি পরিচালনা কমিটি থাকবে। জলাশয়গুলো দীর্ঘ মেয়াদের ভিত্তিতে সমিতির নিকট ইজারা দেয়া যেতে পারে।

স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে দলগঠন কার্যক্রম অনুমোদন ও সার্বিক কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে। সুগঠিত সুফলভোগী দলের নিকট দীর্ঘ মেয়াদে(১০-১৫ বৎসর) নির্দিষ্ট বুকভ্যালুতে 'বন্দোবস্ত কমিটির মাধ্যমে' ব্যবহার বন্দোবস্ত (ইজারা) প্রদান করতে হবে। এতে সরকারের একদিকে যেমন রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে অন্যদিকে জলাশয়গুলো হতে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে আয়ের পথ সুগম হবে। সরকারের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের স্রোতধারায় সহজেই সম্পৃক্ত হয়ে সুগঠিত সুফলভোগী দলগুলো আর্থসামজিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারবে, ফলে সার্বিকভাবে সমাজ ও দেশ উপকৃত হবে।

জলাশয় উন্নয়ন

সড়ক ও রেলপথের পাশে যে সব পতিত জলাশয় রয়েছে সেগুলো পার্শ্ববর্তী ভূমি মালিকের সাথে যৌথভাবে উন্নয়ন করে তাঁদের মাধ্যমে অথবা সংগঠনের মাধ্যমে উন্নয়ন করে দীর্ঘ মেয়াদী ইজারা দিয়ে মাছচাষ কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে। এই উৎস থেকে দেশে বছরে প্রায় ৪০-৪৫ হাজার মেঃ টন বাড়তি মাছ উৎপাদন সম্ভব।

মাছ চাষ প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা

মহাসড়ক ও রেলওয়ের পাশের জলাশয়গুলোর অবস্থান,প্রকার যথা মৌসুমী ও মেয়াদী,বন্যামুক্ত ও বন্যাকবলিত ভেদে মাছ চাষের প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ করতে হবে। বর্তমানে জলাশয়গুলোর কোনটি খাল,কোনটি পুকুর আবার কোনটি ডোবা বা খাদ আকৃতির। এগুলোর অধিকাংশই বন্যামুক্ত নয়। খাল আকৃতির বন্যাকবলিত জলাশয়ে বন্যাপরবর্তী ব্যবস্থাপনায় 'পেনে মাছ চাষ' পদ্ধতিতে চাষ করতে হবে। অর্থাৎ দীর্ঘতম খাল আকৃতির জলাশয়টিকে পেনের(বাঁশের বানা,বাঁশ ও জাল-দড়ির সমন্বয়ে আড়াআড়ি বাঁধ) মাধ্যমে একাধিক খন্ডে বিভক্ত করে মাছ চাষ করা যাবে। এতে প্রতিটি খন্ডের মধ্যে প্রবাহিত পানি অবাধে চলাচল করতে পারবে। এছাড়াও প্রতিটি খন্ডে বা একাধিক খন্ডে অধিক সংখ্যক সুফলভোগীকে সম্পৃক্ত করা যাবে। প্রযুক্তিটি দেশে নতুন হলেও চাঁদপুর জেলায় এফ সি ডি আই প্রকল্পভুক্ত সি আই পি খালে পেনে মাছ চাষ ব্যপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ভবিষৎতে মৎস্য অধিদপ্তরের উন্নয়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে এ সমস্ত জলাশয়গুলো সংস্কার করে বন্যামুক্ত করা গেলে সারা বৎসরই এ পদ্ধতিতে মাছ চাষ অব্যাহত রাখা যাবে। পেনে কার্পের মিশ্র চাষই লাভজনক। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় পেনে কার্পের মিশ্রচাষ করে বছরে গড়ে হেক্টর প্রতি ৩-৪ মেঃ টন মাছ উৎপাদন করা যাবে।

বন্যামুক্ত মেয়াদি পেনে পুকুর, ডোবায় বা খাদে সারা বৎসরই পরিকল্পিত ভাবে মাছ চাষ করা যাবে। চাহিদা ও সুবিধা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে পোনা প্রতিপালন, কার্পের মিশ্রচাষ করা যাবে। এ সব জলাশয়ে বন্যাপূর্ববতীতে পোনা প্রতিপালন, অল্প সময়ের চাষযোগ্য মাছ যেমন- রাজপুটি, গিফট জাতের তেলাপিয়া চাষ করা যেতে পারে। মেয়াদি জলাশয়ে হেক্টর প্রতি প্রায় ৫মেঃ টন মাছ উৎপাদন করা যায়। পক্ষান্তরে মৌসুমী জলাশয় হতে হেক্টর প্রতি ১-২ টন তেলাপিয়া বা রাজপুঁটি মাছ উৎপাদন করা যাবে।

নবম অধ্যায়

মৎস্য হ্যাচারি ব্যবস্থাপনা ও পোনা উৎপাদন

দেশে মাছের পোনা উৎপাদন ও চাহিদা

ষাটের দশকে এদেশে প্রণোদিত প্রজননের মাধ্যমে হ্যাচারিতে পোনা উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রয়োগের আগ পর্যন্ত রুই জাতীয় মাছের বীজ বা পোনার জন্য পুরোপুরি প্রাকৃতিক উৎস হতে সংগৃহিত পোনার উপর নির্ভর করতে হতো। দেশে মৎস্য চাষ ব্যাপক সম্প্রসারিত হওয়ায় মাছের পোনার চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এ চাহিদার সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে হ্যাচারিতে রেণু পোনা উৎপাদন কার্যক্রম। বাংলাদেশে বর্তমানে সরকারী এবং বেসরকারী হ্যাচারি মিলিয়ে প্রায় সাতশত হ্যাচারি রয়েছে। অধিকন্তু প্রাকৃতিক উৎস হতে সংগৃহিত রেণুর পরিমাণ দিন দিন কমে আসছে। ১৯৮৯ সালে যেখানে প্রাকৃতিক উৎস হতে রেণু সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ১২,২৩৫ কেজি আর হ্যাচারিতে উৎপাদিত রেণুর পরিমাণ ছিল মাত্র ৪,৩১৫ কেজি। অথচ ২০০০ সালে এ দৃশ্যপটের উল্টোচিত্র আমরা দেখতে পাই। এ সময়ে প্রাকৃতিক উৎসের পরিমাণ কমে এসে ২,৬৮৩ কেজিতে দাঁড়ায় এবং হ্যাচারিতে উৎপাদিত রেণুর পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ১,৮৭,৩৪৩ কেজি। প্রাকৃতিক উৎস হতে সংগৃহীত রেণু পোনার সাথে বিভিন্ন প্রজাতির ও রাক্ষুসে মাছের মিশ্রণ থাকে এবং যথাসময়ে একই জাতের একই আকারের এবং একই বয়সের পোনা পাওয়া যায় না। তাছাড়া তিন চার দিন বয়সের এসকল রেণু পোনা কোন্ প্রজাতির তা নিশ্চিতভাবে সনাক্ত করা খুবই কঠিন এবং এদের মৃত্যু হার অত্যন্ত বেশী। এ সকল কারণে হ্যাচারিতে উৎপাদিত পোনার চাহিদা দিনদিন বেড়েই চলেছে।

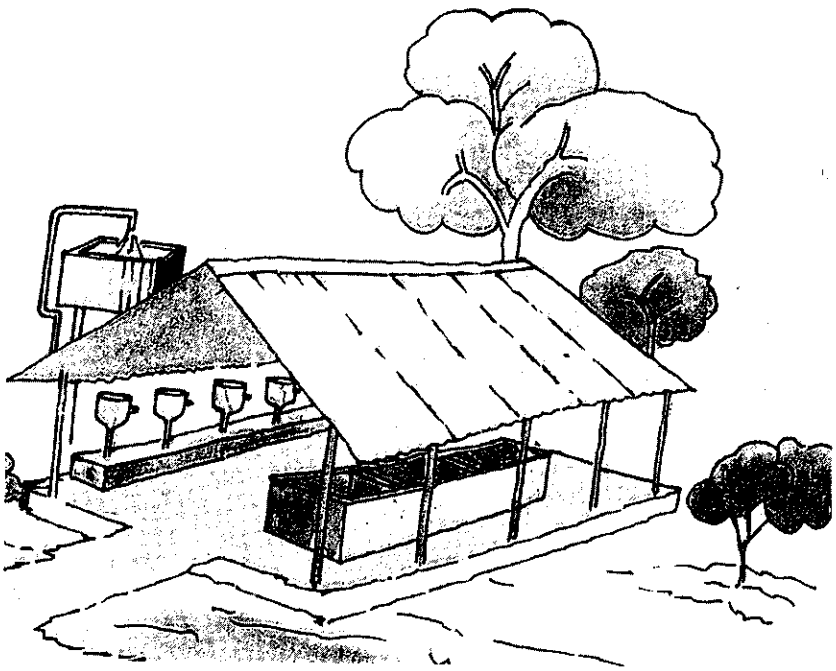

চিত্র ঃ ১১৮ মৎস্য হ্যাচারির নকশা

পোনার গুণাগুণ রক্ষায় কতিপয় সমস্যা

হ্যাচারিতে উৎপাদিত রেণু পোনার উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে এর গুণগত মানের অবনতি একই হারে ঘটে চলেছে। মৎস্য পোনার কাংখিত বৈশিষ্টগুলোর অবনতি হওয়ায় মৎস্য চাষীরা প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। চাষীদের কাছ থেকে প্রায়ই অভিযোগ পাওয়া যায় যে তাদের পুকুরে মাছ আশানুরূপ বৃদ্ধি পায় না, সহজেই মাছ রোগাক্রান্ত হয়, অল্প বয়সে এবং ছোট আকারেই পরিপক্কতা লাভ করে। ফলে সার্বিকভাবে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে এটা নেতিকবাচক প্রভাব ফেলছে। বর্তমানে হ্যাচারিতে উন্নতমানের পোনা উৎপাদন না হওয়ার পিছনে যে সকল কারণ চিহ্নিত করা যায় তা নিম্নরূপঃ

ব্রুডমাছ নির্বাচনে ঋনাত্মক প্রবণতা

অধিকাংশ হ্যাচারিতে ২/৪ জোড়া স্ত্রী-পুরুষ মাছ থেকে উৎপাদিত পোনা নার্সারী পুকুরে লালনের পর দ্রুত বর্ধনশীল পোনাগুলোকে বিক্রি করে অপেক্ষাকৃত কম বর্ধনশীল অবশিষ্ট পোনাকে মজুদ পুকুরে লালন পালন করে পরবর্তীতে ব্রুড হিসাবে ব্যবহার করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এ পদ্ধতিকে ঋনাত্মক নির্বাচন (Negative Selectiom) প্রবণতা বলা হয়। এ ভাবে নির্বাচিত ব্রুড মাছ কাংখিত বৈশিষ্টের দিক থেকে হয় অত্যন্ত নিম্নমানের, ফলে এদের প্রজননের মাধ্যমে উৎপাদিত পোনা বংশগত কারণেই বড় হয় না। তাছাড়া স্বাস্থ্যগত দিক থেকে দূর্বল হবার কারণে এদের মৃত্যুহারও বেশী হয়ে থাকে।

অন্তঃপ্রজনন

বাংলাদেশে বর্তমানে সরকারী/বেসরকারী হ্যাচারি গুলোতে উৎপাদিত পোনার গুণগত মান দিন দিন কমে যাবার পেছনে মৎস্য বিজ্ঞানীরা যে কারণটিকে বিশেষ ভাবে দায়ী করছেন তার মধ্যে অন্তঃপ্রজনন (Inbreeding) হলো অন্যতম। বংশগতভাবে অতি ঘনিষ্ট স্ত্রী পুরুষ মাছের প্রজননকে অন্তঃপ্রজনন বলা হয়ে থাকে। অন্তঃপ্রজননের ফলে কৌলিতাত্বিক সমসত্বতার মাত্রা (Degree of Homozygosity) বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং কৌলিতাত্বিক অসমসত্বতার মাত্রা (Degree of Heterozygosity) কমতে থাকে। কৌলিতত্ত্ববিদরা গবেষণা করে দেখেছেন যে ভাই-বোন সম্পর্কীয় মাছের মধ্যে প্রজননে এক জেনারেশনই কৌলিতাত্বিক অসমসত্বতার শতকরা ২৫ ভাগ হ্রাস পায়। জেনারেশন থেকে জেনারেশনে অবক্ষয়ের এ ধারা চলতে থাকে। অনুরূপভাবে মা ও ছেলে এবং মেয়ে ও পিতা সম্পর্কীয় মাছের মধ্যে প্রজননেও কৌলিতাত্বিক অবক্ষয় দেখা দেয়। অর্থাৎ পিতামাতা বংশগতভাবে যতটা ঘনিষ্ঠ হবে পরবর্তী বংশধরের উপর কৌলিতাত্বিক অবক্ষয়ের প্রভাবের মাত্রা তত বেশী হবে। এর ফলে মাছের উৎপাদনশীলতা হ্রাস, বিকলাংগতা, রোগবালাইয়ের সমস্যা, ডিমের সংখ্যা কমে যাওয়া ইত্যাদি নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয়।

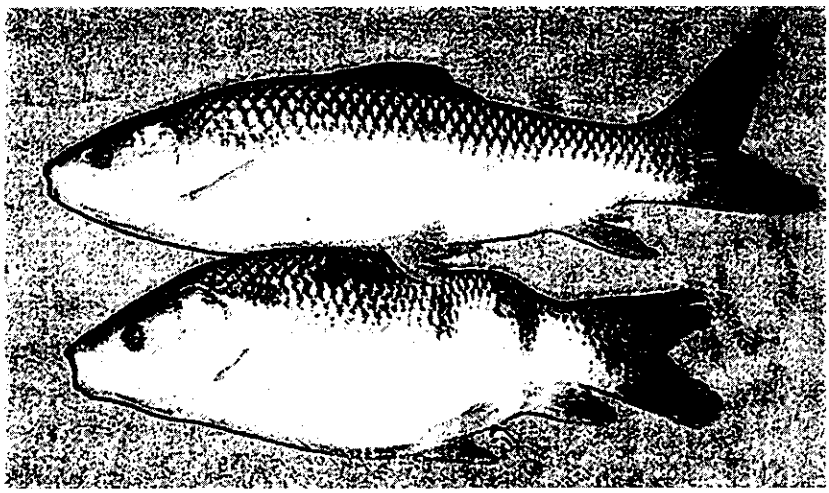

চিত্র ঃ ১১৯ সুস্থ ও সবল এবং অন্তঃপ্রজননজনিত সমস্যায় পতিত রুই মাছের ব্রুড

অপরিকল্পিত সংকরায়ন

সম্প্রতি লক্ষ্য করা গেছে যে কিছু কিছু হ্যাচারি মালিক পদ্ধতিগত অভিজ্ঞতা বা পরিকল্পনা ছাড়াই সংকরায়নের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। এক্ষেত্রে মুনাফা অর্জনই তাদের মূল লক্ষ্য। বিশেষ করে রুই ও কাতলার সংকরায়নের মাধ্যমে উৎপাদিত পোনাকে কাতলা এবং সিলভার কার্প ও বিগহেড কার্পের সংকরায়নের মাধ্যমে উৎপাদিত পোনাকে বিগহেডের পোনা বলে বিক্রির একটা প্রবণতা কোন কোন বেসরকারী হ্যাচারি মালিক/অপরেটরদের মধ্যে রয়েছে। সংকর জাতের পোনা কোন কোন ক্ষেত্রে পরিপক্ক মাছ হয়ে প্রজনন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করলে বর্তমানে আমাদের দেশে চাষযোগ্য বিশুদ্ধ জাতের মাছে অশুদ্ধ জীনের অনুপ্রবেশ (Gene Introgression) ঘটতে পারে।

অপরিণত মাছের প্রজনন

মাছের বয়স ও আকার বৃদ্ধির সাথে দেহের তুলনায় গোনাডের বৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে কমতে থাকে। সে জন্য বড় ওজনের একটি স্ত্রী মাছ থেকে যে পরিমাণ ডিম পাওয়া যায় তার পরিমাণ, কয়েকটি মাছের মিলিত ওজন সেই মাছের সমান হলে সেগুলো থেকে প্রাপ্ত মোট ডিমের পরিমাণ অপেক্ষা কম হয়। তাছাড়া বড় আকারের ব্রুড মাছের বাজার দর অত্যন্ত বেশী। কোন কোন ক্ষেত্রে বেসরকারী হ্যাচারিতে নিরাপত্তা জনিত কারণেও বড় মাছকে পুকুরে লালন পালন করা সম্ভব হয় না। সেই সাথে বৃহদাকার মাছ লালন পালনে খাদ্যসহ অপরাপর উপকরণ বাবদ বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হয়। সে জন্য অধিকাংশ হ্যাচারির মালিক/অপারেটর ছোট আকারের মাছ প্রজননে বেশী আগ্রহী হন। এ সকল ছোট এবং অপরিণত বয়সের মাছ থেকে উৎপাদিত পোনা শারীরিকভাবে দূর্বল হয় এ কারণে পোনা অধিক হারে মৃত্যুবরণ করে এবং কাংখিত ফলন দিতে ব্যর্থ হয়।

পোনার গুণাগুণ রক্ষায় করণীয়

একথা অনস্বীকার্য যে প্রাকৃতিক উৎস হতে সংগৃহিত পোনার গুণগত মান হ্যাচারিতে উৎপাদিত পোনা অপেক্ষা ভাল। প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্রে মাছের অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক পরিবেশের পূর্ণ অনুকুল অবস্থায় প্রজনন ঘটে থাকে। তাই রেণু পোনার গুণগত মান ভাল থাকে। ধারণা করা হয়ে থাকে যে নদীতে প্রথম দিকের প্রজননে উৎপন্ন রেণু পরের দিকে উৎপন্ন রেণু অপেক্ষা অধিকতর ভাল মানের হয়ে থাকে। প্রথম দিকের রেণু পোনাতে অন্যান্য প্রজাতির রেণুর আধিক্য কম থাকে। সম্ভব হলে প্রাকৃতিক উৎসের পোনার সাহায্যে মৎস্য চাষ করতে পারলে ভাল ফলন পাওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে। তবে এক্ষেত্রে অধিকতর সতর্কতার সাথে পোনা সংগ্রহ করতে হবে। ইদানিং এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী নদীতে রেণু উৎপাদন শুরু হলে নদীর উৎসের পোনার সংগে হ্যাচারিতে উৎপাদিত পোনা মিশিয়ে অথবা হ্যাচারির পোনাকে নদীর পোনা বলে রেণু ক্রেতাদের প্রতারিত করে থাকে। অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সূত্রের মাধ্যমে নদী উৎসের রেণু পোনা সংগ্রহ করার চেষ্টা করতে হবে। তাছাড়া হ্যাচারিতে উৎপাদিত পোনার মান উন্নয়নের জন্য নিম্নেবর্ণিত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে ঃ

হ্যাচারিতে নদী উৎসের ব্রুড ব্যবহার করা

আমাদের দেশীয় প্রজাতির যে সকল মাছ হ্যাচারিতে প্রজনন করানো হয় সে সকল ব্রুড মাছ বিভিন্ন নদীর উৎসের হলে খুবই ভাল হয়। নদী থেকে রেণু সংগ্রহ করে নার্সারী পুকুরে লালন পালন করে তা থেকে দ্রুত বর্ধনশীল পোনা আলাদা করে ব্রুড মাছে রূপান্তর করা উত্তম। প্রথমবার নদী থেকে সংগ্রহ করার পর ২/৩ বৎসর অন্তর অন্তর নদী হতে রেণু সংগ্রহ করে ব্রুড যোগানোর এ ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। বিদ্যমান ব্রুড স্টক হতে খুব বেশী বয়স্ক, দূর্বল স্বাস্থ্যের কিংবা রোগাক্রান্ত, কম বৃদ্ধির হার সম্পন্ন ব্রুড বাদ দিয়ে নতুন স্টক দিয়ে তা পুরণ করে নিতে হবে।

হ্যাচারি সমূহের মধ্যে ব্রুড বিনিময়

নদী উৎস হতে ব্রুড মাছ তেরীর জন্য পোনা সংগ্রহ করা সম্ভব না হলে হ্যাচারির মধ্যে ব্রুড বিনিময়ের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে এক হ্যাচারির পুরুষ মাছের সাথে অন্য হ্যাচারির স্ত্রী মাছ বিনিময় খুবই কার্যকর।

দ্রুত বর্ধনশীল পোনা বাছাই করে ব্রুড তৈরী

হ্যাচারিতে উৎপাদিত পোনা হতে ব্রুড তৈরী করতে হলে যতটা সম্ভব প্রজাতি ভেদে বিভিন্ন লটের পোনা হতে অধিক বর্ধনশীল পোনা বাছাই করতে হবে। প্রত্যেক জোড়া উন্নতমানের ব্রুড থেকে উৎপাদিত পোনাকে একটি করে লট বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রত্যেক লট থেকে সমান সংখ্যক সংগ্রহ করা পোনা একসাথে করে আলাদা পুকুরে মজুদ ও পরিচর্যার ব্যবস্থা করে ব্রুডস্টক তৈরী করা যায়।

উন্নত ব্রুডজাত সংগ্রহ

সরকার 'ব্রুড ব্যাংক স্থাপন প্রকল্পের' মাধ্যমে সারাদেশে বেশকিছু সরকারী খামারে উন্নতমানের ব্রুড তৈরী করে তা সরকারী এবং বেসরকারী খামারের নিকট স্বল্পমূল্যে সরবরাহের এক কর্মসূচী ইতোমধ্যে গ্রহণ করেছে। মৎস্য প্রজনন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর গত কয়েক বৎসর যাবৎ বিভিন্ন নদী উৎসের রেণু থেকে ব্রুড তৈরী করার কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বাংলাদেশ মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুটের ময়মনসিংহ স্বাদু পানি কেন্দ্রে কৌলিতাত্বিক ভাবে উন্নীত (Genetically Improved) ব্রুড জাত উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বেসরকারী হ্যাচারি মালিকগণকে এ সকল উৎস হতে ব্রুডজাত সংগ্রহ করে তা দিয়ে রেণু উৎপাদনে উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং সহায়তা দিতে হবে।

চিত্র ঃ ১২০ কাতল মাছের ব্রুড

সংকরায়ন বন্ধকরণ

সংকরায়নের মাধ্যমে বিভিন্ন উদ্ভিদ এবং প্রাণীতে উন্নত প্রজাতি উদ্ভাবন একটি বহুল প্রচলিত পদ্ধতি। সংকরায়ন তখনই গ্রহণযোগ্য হবে যদি তা পিতা-মাতার তুলনায় উন্নত বৈশিষ্টের বংশধর সৃষ্টিতে সক্ষম হয়। পরিকল্পনাহীন সংকরায়নের ফলে শুদ্ধ জাতের বিপর্যয় ঘটাই স্বাভাবিক। সেজন্য তা থেকে বেসরকারী হ্যাচারি মালিক/অপারেটরদেরকে বিরত থাকতে হবে। প্রয়োজনবোধে আইন প্রনয়ন করে নিষিদ্ধ করতে হবে।

প্রজনন কাজে বংশগতভাবে অতি ঘনিষ্ঠ ব্রুড মাছ ব্যবহার না করা

হ্যাচারি পরিচালনায় নিয়োজিত জনশক্তিকে বংশগতভাবে অতি ঘনিষ্ঠ ব্রুডমাছের মধ্যে প্রজনন ঘটানো থেকে বিরত থাকতে হবে। এ ব্যপারে হ্যাচারি অপারেটরদের অবশ্যই ব্রুডের স্টক সনাক্ত করে প্রজনন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

প্রজননের জন্যে উপযুক্ত বয়স ও ওজনের ব্রুডমাছ ব্যবহার করা

প্রজনন কাজে ব্রুডমাছ নির্বাচনের ক্ষেত্রে উপযুক্ত বয়স ও ওজনের বিষয়টিকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে। বয়স অনুপাতে যদি মাছের দৈহিক বৃদ্ধি না ঘটে তাহলে বুঝতে হবে ব্রুডহিসাবে মাছটি উন্নতমানের নাও হতে পারে অথবা ব্রুড ব্যবস্থাপনা যথাযথ হয়নি, যার ফলে তার পরবর্তী বংশধর কাংখিত মানের নাও হতে পারে। আবার বড় আকারের মাছ হলেই ভাল ফলাফল আশা করা যায়না যদি প্রজননে অংশগ্রহণকারী পুরুষ এবং স্ত্রী মাছ বংশগতভাবে সম্পর্কিত হয়।
নিম্নে হ্যাচারিতে অনুসরণের জন্য কার্প জাতীয় বিভিন্ন প্রজাতির প্রজনন উপযোগী বয়স ও ওজনের একটি ছক দেয়া হলো।

প্রজাতির নাম	সর্বনিম্ন বয়স (বছর)	সর্বনিম্ন ওজন (কেজি)
কাতলা	৩	৩+
রুই	২	১+
মৃগেল	২	১+
কালিবাউস	২	১
সিলভার কার্প	২	২+
বিগহেড কার্প	২	২+
গ্রাস কার্প	২	৩
কার্পিও	১	১+
রাজপুঁটি	১	০.২

মৎস্য হ্যাচারি নির্মাণ

যে প্রক্রিয়ায় পরিপক্ক পুরুষ এবং স্ত্রী মাছকে হরমোন প্রয়োগের মাধ্যমে প্রণোদিতকরে ডিম ছাড়ানোর ব্যবস্থা করা হয় এবং সে ডিম ফুটিয়ে রেণু উৎপাদন করা হয় তাকে প্রণোদিত প্রজনন বলা হয় এবং এসব কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যে অবকাঠামো ব্যবহার করা হয় তাকে হ্যাচারি হিসাবে গণ্য করা হয়।

চিত্র ঃ ১২১ মৎস্য হ্যাচারির অংশ

রুই, কাতলা, মৃগেল, কালবাউশ ইত্যাদি মাছ বদ্ধ জলাশয় অর্থাৎ পুকুর বা দিঘীতে ডিম ছাড়েনা যদিও প্রজনন মৌসুমে এসব স্ত্রী মাছের উদর ডিমে পূর্ণ থাকে। পুরুষ মাছেরও শুক্রাণু তৈরী হয়। কিন্তু এ পরিবেশে প্রজনন হয়না। বিদেশী কার্প জাতীয় মাছের মধ্যে কার্পিও মাছ বদ্ধ জলাশয়ে বংশ বিস্তার করতে পারে, কিন্তু সিলভার কার্প, বিগহেড কার্প, গ্রাস কার্পের বংশ বিস্তার বদ্ধ পানিতে ঘটে না। এদের প্রজনন সম্পূর্ণ প্রণোদিত প্রজননের উপর নির্ভরশীল। হরমোন ইনজেকশনের সাহায্যে আমাদের দেশে হ্যাচারিতে এসমস্ত মাছের প্রজনন ঘটানো হয়ে থাকে। হ্যাচারি নির্মাণের ক্ষেত্রে যে সকল বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

স্থান নির্বাচন

হ্যাচারি স্থাপনের জন্য স্থান নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হ্যাচারি নির্মাণ ও পরিচালনার উপকরণ সংগ্রহ, পরিবহণ, উৎপাদিত রেণু পোনা সরবরাহ, পর্যাপ্ত পুকুর, নির্মাণ খরচ ইত্যাদি নানাবিধ কারণে হ্যাচারির স্থান নির্বাচনের বিষয়টিকে বিবেচনায় আনতে হয়। মৎস্য হ্যাচারির স্থান নির্বাচনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে।

- কম খরচে হ্যাচারি ও পুকুর নির্মাণ
- মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা
- সাংবাৎসরিক পানির উৎস
- ভাল গুণাগুণ সম্পন্ন পানি
- উপকরণের সহজলভ্যতা
- বিদ্যুৎ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা
- বাজারজাতকরণের সুব্যবস্থা
- দূষণমুক্ত এলাকা
- বন্যামুক্ত এলাকা

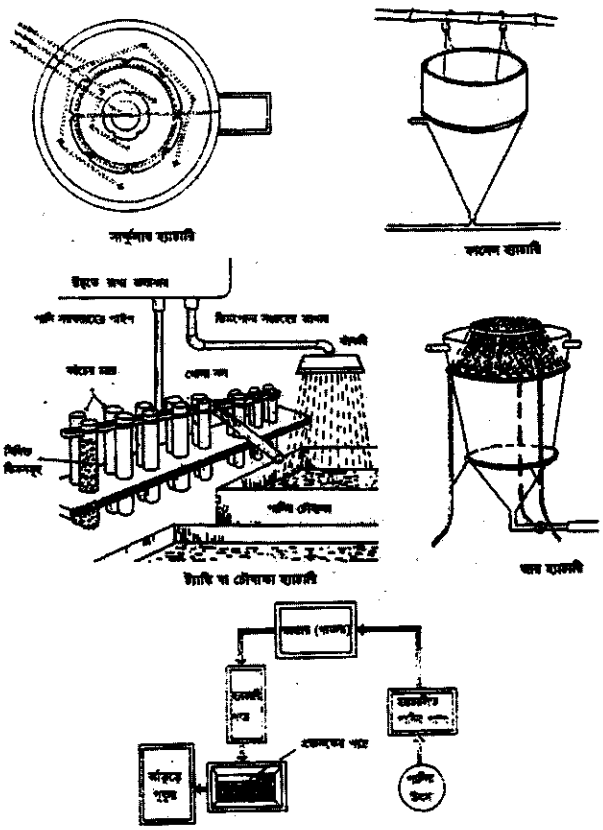

চিত্র ঃ ১২২ বিভিন্ন ধরনের হ্যাচারির নকশা

হ্যাচারির অবকাঠামো নির্মাণ

অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে রেণুর চাহিদা, অবিক্রিত রেণু মজুদের জন্য পর্যাপ্ত নার্সারী পুকুর এবং সর্বোপরি আর্থিক সংগতিকে বিবেচনায় আনতে হবে। গুণগত মান সম্পন্ন রেণু ও পোনা উৎপাদনের স্বার্থে হ্যাচারির নির্মাণ শৈলী এমন হওয়া উচিৎ যাতে ক্রেতা-সাধারণ আকৃষ্ট হয় এবং হ্যাচারি অভ্যন্তরে একটি স্বাস্থ্যকর ও রোগ-জীবাণুমুক্ত পরিবেশ বিরাজমান থাকে। সুষ্ঠু এবং সুন্দরভাবে হ্যাচারি পরিচালনার জন্য হ্যাচারি অবকাঠামোর বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। নিম্নে একটি মৎস্য হ্যাচারির প্রধান অংশগুলো আলোচনা করা হলো।

উচচ জলাধার বা ওভার হেড ট্যাংক

হ্যাচারিতে পানি সরবরাহের পূর্বে পানিকে সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণের জন্য উঁচুতে যে জলাধার নির্মাণ করা হয় তাকে উচচ জলাধার বা ওভারহেড ট্যাংক বলে। এ জলাধারকে ভূমি হতে তিন মিটার উঁচুতে স্থাপন করলে হ্যাচারির বিভিন্ন ট্যাংক বা চৌবাচচায় পানি সরবরাহ সহজতর হয়। হ্যাচারির উৎপাদন ক্ষমতার উপর উচচ জলাধারের পানি ধারণ ক্ষমতা নির্ভর করে। ছোট, মাঝারি এবং বৃহৎ হ্যাচারির ক্ষেত্রে যথাক্রমে ২৫ ঘনমিটার, ৫০ ঘনমিটার ও ১০০ ঘনমিটার পানি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন উচচ জলাধার উপযোগী।

প্রজনন ট্যাংক

কার্প জাতীয় দেশী এবং বিদেশী প্রজাতির প্রজননের জন্য গোলাকার চৌবচচাই বেশী উপযোগী। গোলাকার চৌবাচচা বিভিন্ন আকারের হতে পারে এবং প্রজননের জন্য ট্যাংকের আকার অনুযায়ী মাছ ইনজেকশন দিয়ে তাতে রাখার পরিমাণও
কমবেশী হতে পারে। যার একটি মডেল নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

ক্রমিক নং	ব্যাস (মিটার)	উচচতা (মিটার)	কার্যকর পানির ধারণ ক্ষমতা (লিটার)	ব্রুড মাছের পরিমাণ (কেজি)
১	১.৮	১.০	২,২০০	১৭-২২
২	২.৫	১.০	৪,৪০০	৩৫-৪৪
৩	৩.০	১.০	৬,৩০০	৫০-৬৩
৪	৩.৫	১.০	৮,৫০০	৬৮-৮৫
৫	৪.৫	১.০	১৪,০০০	১১২-১৪০

প্রজনন ট্যাংক নির্মাণের ক্ষেত্রে পানির সরবরাহ ও নির্গমণের বিষয়টি বিশেষ বিবেচনায় আনতে হয়। পানি সরবরাহের লাইন এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যেন পানি সরবরাহের পাশাপাশি বৃত্তাকার স্রোতের সৃষ্টি হয়। রুই জাতীয় মাছের ক্ষেত্রে মাছকে ইনজেকশন দিয়ে গোলাকার চৌবাচচায় রাখার পর ডিম ছাড়লে মাছগুলোকে সরিয়ে ফেলা হয় এবং এরপর নিষিক্ত ডিমগুলোকে হ্যাচিং জার বা ট্যাংকে স্থানান্তর করা হয়। গোলাকার চৌবাচচাকেও ডিম ফুটানোর কাজে ব্যবহার করা যায় এমনকি বিক্রি পর্যন্ত এখানেই রেখে দেয়া যায়।

হ্যাচিং জার বা ট্যাংক

নিষিক্ত ডিমকে প্রজনন ট্যাংক হতে সংগ্রহ করে হ্যাচিং জার বা ট্যাংকে রেখে ডিম ফুটিয়ে রেণু পোনায় পরিণত হবার পরও ৩-৪ দিন পর্যন্ত রাখা যায়। হ্যাচারির মেঝে থেকে ১ মিটার উঁচুতে হ্যাচিং জার একটি প্লাটফরমের উপরে সারিবদ্ধভাবে নির্মাণ করা ভাল। এ ধরণের ২৫০-৩০০ লিটার পানি ধারণক্ষম গোলাকার ফানেল আকৃতির একটি জারে সাধারণত ৩০০-৫০০ গ্রাম নিষিক্ত ডিম ফুটানো যায়।

আয়তকার হোল্ডিং ট্যাংক বা সিসটার্ণ

ব্রুড এবং পোনা কন্ডিশনিং, রেণু রাখার কাজে আয়তকার হোল্ডিং ট্যাংক হ্যাচারির জন্য খুব প্রয়োজন। এ ধরণের ট্যাংক দৈর্ঘ্যে ৫ মিটার, প্রস্থে ১ মিটার ও উচচতায় ১ মিটার হওয়া ভাল। সিসটার্নে একপ্রান্ত দিয়ে পানি ঢুকা এবং অন্য প্রান্ত দিয়ে বের হয়ে যাবার ব্যবস্থা রাখতে হয়।

গভীর/অগভীর নলকূপ স্থাপন

একটি মৎস্য হ্যাচারি পরিচালনার জন্য প্রধান বিবেচ্য বিষয় হচেচ পানি । হ্যাচারির পানি সাধারণতঃ পরিষ্কার ও পর্যাপ্ত অক্সিজেন যুক্ত হতে হয়। হ্যাচারির পানিতে লোহার পরিমাণ বেশী হলে ডিম ফুটানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই হ্যাচারিতে গভীর বা অগভীর নলকূপ স্থাপন খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং নলকূপ স্থাপনের পূর্বেই টেষ্ট বোরিংয়ের সাহায্যে ঐ স্থানের পানি পরীক্ষা করে নেয়া উচিত। হ্যাচারিতে ব্যবহার্য পানিতে নিম্নের গুণাগুণ থাকা বাঞ্ছনীয়।

অক্সিজেন	> ৫.০ মি. গ্রা / লিটার
তাপমাত্রা	২৪-৩০ ডিগ্রী সেলসিয়ার্স
পি এইচ	৭.৫-৮.৫
অ্যামোনিয়া	০.৫ মি. গ্রা / লিটার
কার্বন ডাই অক্সাইড	১০ মি. গ্রা / লিটার

বিভিন্ন ধরণের পুকুর

সাধারণতঃ একটি হ্যাচারিতে আঁতুড় পুকুর, লালন পুকুর ও মজুদ পুকুর থাকা বাঞ্ছনীয়।

হ্যাচারি পরিচালনা

ব্রুড মাছের পরিচর্যা

উন্নতগুণ সম্পন্ন বিভিন্ন প্রজাতির মাছ হ্যাচারি নিয়ন্ত্রণাধীন ও ব্যবস্থাপনাধীন পুকুরে যথাযথভাবে পরিচর্যা করতে হবে।

- প্রতি একরে ৬৫০-৭৫০ কেজি মাছ মজুদ করতে হবে
- মাঝে মাঝে পানি পরিবর্তনের সুব্যবস্থা করতে হবে
- অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত সম্পুরক খাদ্য পরিহার করতে হবে
- রোগ-বালাই প্রতিরোধ ব্যবস্থা আগে থেকেই নিতে হবে
- কোন্ পুকুরে কি প্রজাতির এবং ওজনের মাছ আছে তার রেজিষ্টার রাখতে হবে
- প্রজনন শেষে ব্রুড মাছ পৃথক পুকুরে পরিচর্যা করতে হবে

প্রজননক্ষম মাছ নির্বাচন

প্রজনন কার্যক্রম শুরুর আগে মাছ প্রজনন উপযোগী হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়া দরকার। আমাদের দেশে যে সব প্রজাতির মাছ প্রজননের জন্য হ্যাচারিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তাদের প্রজননকাল সাধারণতঃ মার্চ থেকে আগষ্ট পর্যন্ত বিস্তৃত। সফল প্রণোদিত প্রজননের জন্য সঠিক মাছ বাছাই করা একান্ত প্রয়োজন। প্রজনন মৌসুমে প্রজননে প্রস্তুত মাছের লক্ষণাদি প্রায় সব প্রজাতির মাছের ক্ষেত্রে একই ধরণের হয়। লক্ষণাদি নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

স্ত্রী মাছ

- বক্ষ পাখনার ভিতরের দিক মসৃণ ও পিচ্ছিল হবে
- মাছের পেট গোলাকৃতি, নরম এবং স্থিতিস্থাপকতা বেশী হবে
- পায়ু ফোলা ও ঈষৎ গোলাপী থেকে লাল হবে
- তলপেটে সামান্য চাপ দিলে দু'একটা ডিম বেরিয়ে আসবে

পুরুষ মাছ

- বক্ষ পাখনার ভিতরের দিক খসখসে হবে
- পেট চিকন হবে
- পায়ু স্বাভাবিক আকার ও রং হবে
- তলপেটে সামান্য চাপ দিলে দুধের মত তরল বীর্য (Milt) বেরিয়ে আসবে।

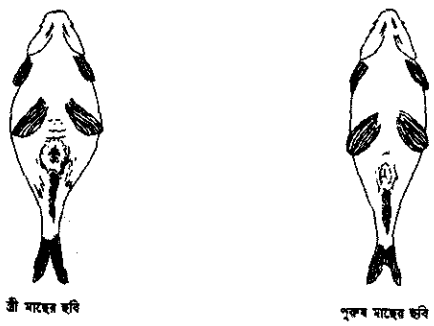

চিত্র ঃ ১২৩ প্রজননক্ষম স্ত্রী ও পুরুষ মাছ

ব্রুড মাছ পরিবহণ

ব্রুড অত্যন্ত সতর্কতার সংগে পরিবহণ করতে হয়। এসব মাছ পরিবহণের সময় যেন আঘাত প্রাপ্ত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। পরিবহণের পূর্বে পুকুরের পানির তাপমাত্রা বাড়ার পূর্বেই ব্রুড বছাইয়ের কাজ সারা ভাল। মাছকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে নাড়াচাড়া করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে মাছ যাতে কোনভাবেই আঘাত প্রাপ্ত না হয়। সাধারণতঃ স্বল্প দুরত্বে পরিবহণের ক্ষেত্রে পলিথিন ব্যাগে পরিমিত পানি নিয়ে বড় মাছ হলে একটি এবং ছোট মাছ হলে দুটি মাছ পরিবহণ করা যায়। পরিবহণকালীন খেয়াল রাখতে হবে যাতে মাছের মাথার অংশ অর্থাৎ ফুলকা পানিতে ডুবানো থাকে। পুকুর থেকে এনে ব্রুডমাছগুলোকে আয়তকার ট্যাংক বা সিসটার্নে প্রবাহমান পানিতে রেখে ৪/৫ ঘন্টা পর হরমোন ইনজেকশন দিতে হয়।

হরমোন ইনজেকশন প্রয়োগ

প্রণোদিত প্রজননে ব্যবহৃত হরমোন বিভিন্ন উৎস হতে পাওয়া যায় এবং এগুলো বাজারে বিভিন্ন নামে প্রচলিত। যেমন-

- মাছের পিটুইটরী গ্রন্থি বা পিজি (Pituitary Gland)
- এইচসিজি (H.C.G)- যেমন সুমাছ (ভারত), কোরোলন (হল্যান্ড)
- ওভাপ্রিম
- এলআরএইচএ (LRHA)

মৎস্য প্রজননে হরমোনের প্রয়োগমাত্রা বিভিন্ন প্রজাতির জন্য বিভিন্ন হয়ে থাকে। কোন কোন মাছে শুধু পিজি আবার কোন কোন মাছে পিজি এবং এইচসিজি দুটোই প্রয়োগ করতে হয়। নীচের ছকে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের হরমোন প্রয়োগ মাত্র ও অভুলেশনের অর্থাৎ ডিম ছাড়ার সময় প্রদত্ত হলোঃ

প্রজাতি	১ম ইনজেকশন (প্রতি কেজির জন্য)	বিরতিকাল (ঘন্টা)	২য় ইনজেকশন (প্রতি কেজির জন্য)	ডিম ছাড়ার সময় (ঘন্টা) (২য় ইনজেকশনের পর)
রুই	পিজি ২ মি,গ্রা	৬	পিজি ৬ মি,গ্রা	৪-৬
মৃগেল	পিজি ১.৫-২ মি,গ্রা	৬	পিজি ৫-৬ মি,গ্রা	৪-৬
কাতলা	পিজি ১-২ মি,গ্রা	৬	পিজি ৫-৬ মি,গ্রা	৫-৬
কালবাউশ	পিজি ১.৫-২ মি,গ্রা	৬	পিজি ৫-৬ মি,গ্রা	৩-৬
গ্রাস কার্প	পিজি ১-২ মি,গ্রা	৭	পিজি ৪-৬ মি,গ্রা	৫-৭
কার্পিও	-	-	পিজি ৩ মি,গ্রা	৭-৮
সিলভার কার্প	এইচসিজি ২০০ আইইউ	১২	এইচসিজি ৫০০ আইইউ + পিজি ৩ মি,গ্রা	৬
বিগহেড কার্প	এইচসিজি ২০০ আইইউ	১২	এইচসিজি ৪০০ আইইউ + পিজি ২ মি,গ্রা	৬-৭
রাজপুঁটি		-	পিজি ৪-৫ মি,গ্রা	৬

বর্তমানে ওভাপ্রিম নামের কৃত্রিম হরমোনটি বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ হরমোন দ্বারা শুধুমাত্র একবার একই সংগে পুরুষ ও স্ত্রী মাছকে ইনজেকশন দেয়া হয়। ফলে মাছকে হাত দিয়ে খুব একটা নাড়াচাড়া করতে হয়না। পিজি বা এইচসিজির পরিবর্তে ওভাপ্রিম ব্যবহার পদ্ধতিতে প্রণোদন, ডিম নিষিক্তকরণ, ডিম ফুটা, রেণু পোনা বেঁচে থাকা ইত্যাদির হার তুলনামূলকভাবে বেশী।

বিভিন্ন মাছে ওভাপ্রিম যে মাত্রায় ব্যবহার করে ভাল ফল পাওয়া যায় তা নিম্নরূপঃ

প্রজাতি	স্ত্রী (মি.লি / কেজি)	পুরুষ (মি.লি / কেজি)
রুই	০.৩-০.৪	০.১-০.২
কাতলা	০.৪-০.৫	০.১-০.২
মৃগেল	০.২-০.৩	০.১-০.২
সিলভার কার্প	০.৪-০.৭	০.১-০.২
বিগহেড কার্প	০.৪-০.৭	০.১-০.২
গ্রাস কার্প	০.৪-০.৮	.১-০.২

উৎস ঃ কামাল সিদ্দিকী ও সমরেন্দ্রনাথ চৌধুরী সম্পাদিত 'মৎস্য' (পুকুরে মাছ চাষ ম্যানুয়েল)।

বিভিন্ন প্রজাতির প্রজনন পদ্ধতি

রুই জাতীয় দেশী মাছের প্রজনন

এ সমস্ত মাছের ক্ষেত্রে স্ত্রী মাছকে নির্দিষ্ট মাত্রায় ১ম ইনজেকশন দেয়ার পর সিসটার্নে রেখে দেয়া হয়। পুরুষ মাছকে এসময়ে কোন ইনজেকশন না দিয়ে অন্য সিসটার্নে রাখা হয়। ৬ ঘন্টা পর স্ত্রী মাছকে নির্দিষ্ট মাত্রায় ২য় ইনজেকশন এবং পুরুষ মাছকে একটিমাত্র ইনজেকশন দিয়ে একই সাথে প্রজনন ট্যাংকে রেখে দেয়া হয় এবং জাল দিয়ে ঢেকে রাখতে হয় যাতে মাছ লাফ দিয়ে পড়ে যেতে না পারে। ২য় ইনজেকশনের ৫-৬ ঘন্টা পর স্ত্রী মাছ ডিম ছাড়ে এবং পুরুষ মাছ বীর্য ছাড়ে, ফলে ডিম নিষিক্ত হয়। পানির বৃত্তাকার প্রবাহের কারণে নিষিক্ত ডিমগুলো পানিতে ডুবন্ত অবস্থায় ঘুরতে থাকে। ডিম ছাড়া শেষ হলে মাছগুলোকে প্রজনন ট্যাংক থেকে সরিয়ে নিতে হয়। তারপর ডিমগুলোকে হ্যাচিং ট্যাংক বা জারে স্থানান্তর করা হয়।

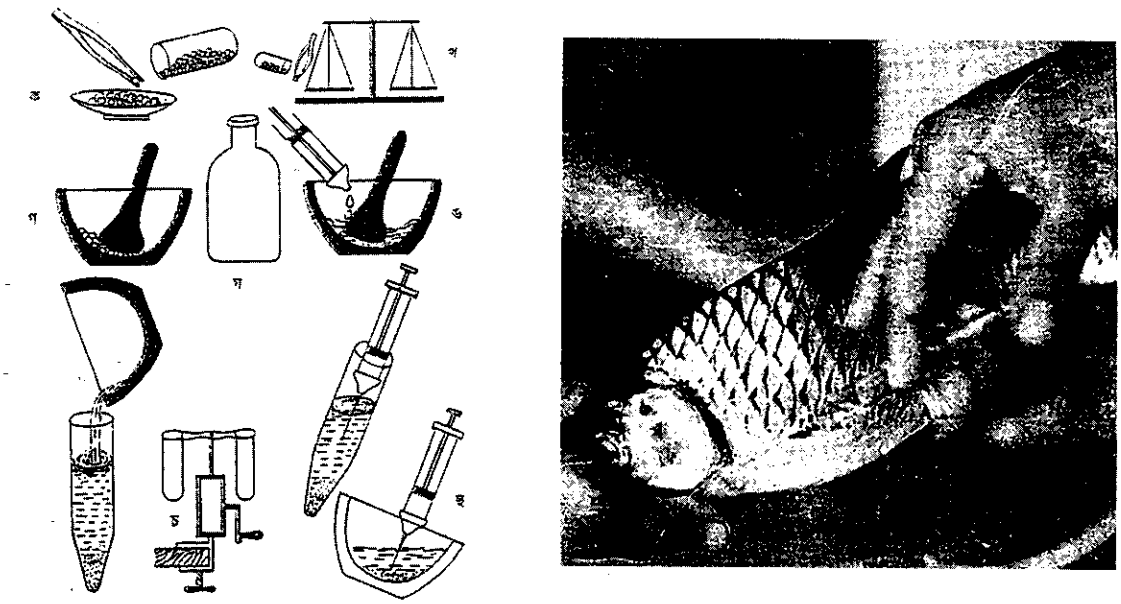

চিত্র ঃ ১২৪ পিটুইটারী গ্রন্থি নির্যাস তৈরী এবং মাছকে হরমোন ইনজেকশন প্রয়োগ

বিদেশী কার্প জাতীয় মাছের প্রজনন

রুই জাতীয় মাছের ন্যায় এসকল মাছের জন্য নির্ধারিত মাত্রায় ইনজেকশনের পর পুরুষ এবং স্ত্রী মাছকে আলাদা ট্যাংকে রাখতে হয়। ২য় ইনজেকশনের ৫ ঘন্টা পর থেকে খেয়াল রাখতে হবে স্ত্রী মাছ ডিমছাড়ে কিনা। যখন ২/৪ টা ডিম পানিতে দেখতে পাওয়া যাবে তখনই স্ত্রী মাছকে প্রথমে আলতোভাবে ধরে নরম তোয়ালে জড়িয়ে গায়ের পানি মুছে নিতে হবে। তারপর স্ত্রী মাছের পেটের উপরের দিক থেকে নীচের দিকে মৃদু চাপ প্রয়োগ করে একটা প্লাস্টিকের শুকনা পাত্রে ডিম বের করে নিতে হবে এবং সাথে সাথে পুরুষ মাছের পেটে চাপ দিয়ে বীর্য বের করে ডিমের উপর ছড়িয়ে দিতে হবে। ডিম এবং বীর্য পাখী কিংবা মুরগির পালক দ্বারা ভালভাবে মিশিয়ে তাতে পরিষ্কার পানি মেশাতে হবে। তারপর আস্তে আস্তে পানি দিয়ে কয়েকবার ধৌত করতে হবে যাতে অতিরিক্ত বীর্য ডিমের গায়ে লেগে থাকতে না পারে। এভাবে পানি সমেত ডিমগুলোকে ২০-২৫ মিনিট নাড়াচাড়া করে তাদেরকে ফুলানোর সুযোগ দিতে হবে এবং পরে হ্যাচিং জার বা ট্যাংকে স্থানান্তর করতে হবে। এ পদ্ধতিকে স্ট্রিপিং বলা হয়।

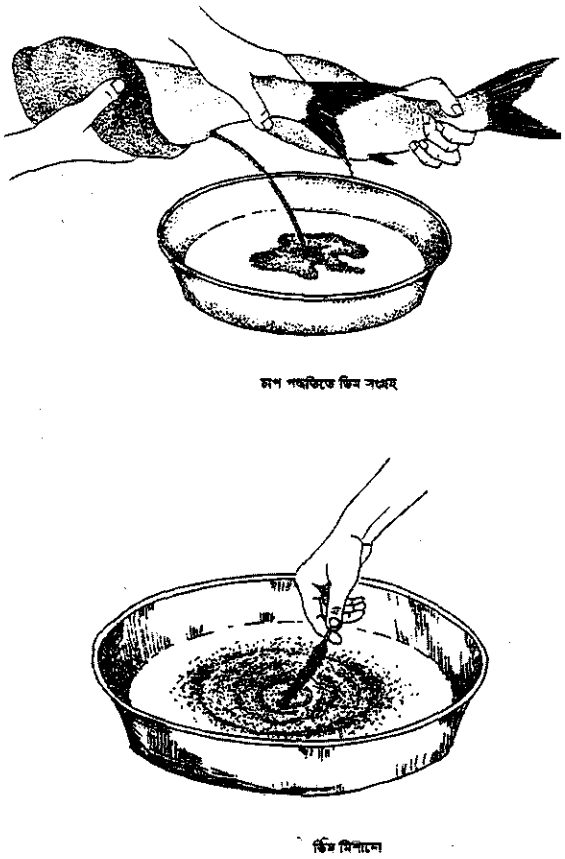

চিত্র ঃ ১২৫ স্ট্রিপিং বা চাপ পদ্ধতিতে মাছের প্রজনন

পাংগাস মাছের প্রজনন

থাই পাংগাস ৩ বৎসরেই প্রজনক্ষম হয়। সাধারতঃ মে হতে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত পাংগাসের প্রণোদিত প্রজনন করানো যায়। স্ত্রী এবং পুরুষ পাংগাস মাছকে আলাদা চৌবাচচায় রেখে স্ত্রী মাছকে প্রথমে প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ২ মিঃ গ্রাঃ হারে পিজি দিয়ে ইনজেকশন দিতে হয়। প্রথম ইনজেকশনের ৮-৯ ঘন্টা পর স্ত্রী মাছকে প্রতি কেজির জন্য ৬-৮ মিঃগ্রাঃ হারে দ্বিতীয়

ইনজেকশন দিতে হয। স্ত্রী মাছের দ্বিতীয় ইনজেকশনের সময় পুরুষ মাছকে প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ২ মিঃ গ্রাঃ হারে একটি ইনজেকশন দিতে হয় এবং পুরুষ ও স্ত্রী মাছকে আলাদা চৌবাচচায় রাখতে হবে। দ্বিতীয় ইনজেকশনের ৮-৯ ঘন্টা পর স্ত্রী মাছ ডিম দেয়। বিদেশী কার্প জাতীয় মাছের ন্যায় ডিম সংগ্রহ এবং পরিস্কার করে নিতে হয়।

ডিম ফুটানো ও রেণুর পরিচর্যা

হ্যাচিং জার বা ট্যাংকে কি পরিমাণ ডিম ফুটানো যাবে তা ঐ জার বা ট্যাংকে পানির ধারণ ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। সাধারণতঃ প্রতি লিটারে ২ গ্রাম হারে শুকনো ডিম ফুটানো যায়। হ্যাচিং জার বা ট্যাংকে অক্সিজেন সমৃদ্ধ পানির নিরবিচ্ছিন্ন প্রবাহ বজায় রাখতে হবে যাতে ডিম তলায় বসে যেতে না পারে। মাছের ডিম স্ফুটন সময়কাল প্রজাতির ভিন্নতা এবং পানির তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল। ১৪-২৪ ঘন্টার মধ্যে ডিমের স্ফুটন শেষ হয়। এ সময়ের মধ্যে রেণু পোনা ডিমের খোল থেকে বেরিয়ে উপর-নীচ সাঁতার কাটা শুরু করে। সুস্থ ও সবল রেণু পোনা ডিমের খোসা ও অনিষিক্ত ডিমের সংগে একসংগে মিশে থাকে ফলে রেণু রোগ জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থেকে যায়। কিছুক্ষনের জন্য পানির প্রবাহ বন্ধ রেখে তলদেশে এসব ময়লা জমিয়ে সাইফনিং পদ্ধতিতে পরিষ্কার করে নিতে হয়। রেণু ফোটার ৩৬-৪৮ ঘন্টা পর্যন্ত রেণুকে কোন খাবার দিতে হয়না। এসময়ের পর তাদেরকে আঁতুড় পুকুরে তৈরী প্রাকৃতিক খাবার সংগ্রহ করে কিংবা হাঁস অথবা মুরগির সেদ্ধ ডিমের কুসুম সুক্ষ্ম ছাকনি (১০০-২০০ মাইক্রন ফাঁসযুক্ত কাপড়ের তৈরী ছাকনি) দ্বারা ছেকে খেতে দিতে হবে। ৬-৮ ঘন্টা পর পর প্রতি কেজি রেণুর জন্য একটি করে ডিমের কুসুম খাবার হিসাবে দিতে হয়। রেণু বিক্রি করার ৩-৪ ঘন্টা পূর্বেই খাবার প্রয়োগ বন্ধ করে দিতে হয়।

চিত্র ঃ ১২৬ হাতের মধ্যে ডিম

পাংগাসের ডিম আঠালো হবার কারণে কার্পের ডিমের ন্যায় গোলাকার চৌবাচচায় কিংবা হ্যাচিং জারে ঘুর্ণায়মান পানির সাহায্যে একে ফোটানো যায় না। সে জন্য ডিমগুলোকে গোলাকার চৌবাচচা কিংবা সিসটার্নের তলায় ১৫-২০ সেঃ মিঃ পানির গভীরতায় ছড়িয়ে দিতে হয় এবং ঝর্ণার সাহায্যে অক্সিজেন সমৃদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা রাখতে হয়। ২৪-৩০ ঘন্টার মধ্যে ডিম ফুটে

পাংগাসের রেণু বের হয়ে আসবে। ডিম ফোটা শেষ হবার সাথে সাথে দ্রুত সাইফনিং পদ্ধতিতে ময়লা পরিস্কার করে নিতে হয়। পাংগাসের রেণু একে অন্যকে খেয়ে ফেলার প্রবণতা (ক্যানাবলিজম) থাকায় এদের খাদ্যে প্রাণীজ আমিষ থাকা জরুরী।

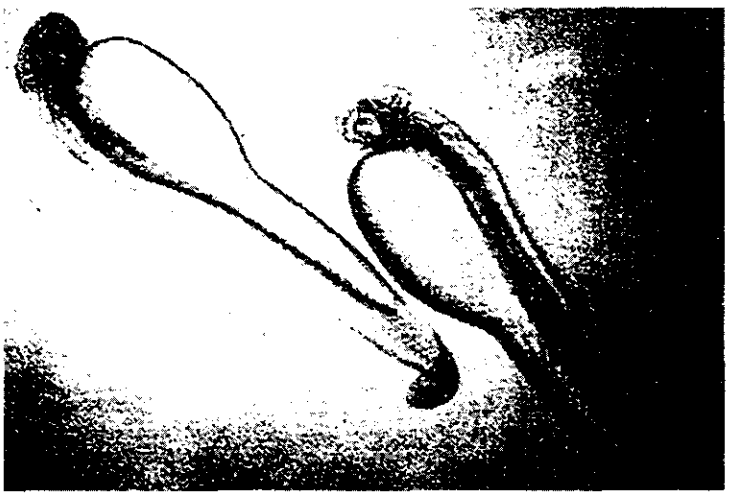

চিত্র ঃ ১২৭ সদ্য স্ফুটিত মাছের রেণু

পোনার চাষ ব্যবস্থা

নদী থেকে সংগৃহীত বা হ্যাচারিতে উৎপাদিত ৩/৪ দিন বয়সের ৫-৭ মিলিলিটার আকারের যে পোনা পাওয়া যায় তাকে রেণু পোনা বলে। এ রেণু পোনা সরাসরি উৎপাদন পুকুরে (Grow out) মজুদ করে বড় মাছে রূপান্তর করা সহজ বা বিজ্ঞান সম্মত নয়। সে জন্য রেণু পোনাকে প্রথমতঃ বিশেষ পুকুরে লালন-পালন করে ৭-৮ সেঃমিঃ আকারের পোনায় পরিণত করা হয় এবং ঐগুলি নির্ধারিত হারে উৎপাদন পুকুরে মজুদ করে খাবার যোগ্য মাছে এবং প্রয়োজনে ব্রুডে রূপান্তর করা হয়।

নিম্নে কার্প জাতীয় পোনা চাষের উপর অত্যন্ত সহজ ভাষায় আলোচনা করা হয়েছে যাতে একজন পোনা চাষী সহজেই এ পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারে।

পুকুর নির্বাচন

সাধারণত ২০-৫০ শতাংশ আয়তনের পুকুর পোনা চাষের জন্য ভাল। তবে সর্বোচ্চ এক একরের চেয়ে বড় আয়তনের পুকুরে পোনা চাষ না করাই ভাল। বেশী গভীর পুকুরে পোনা চাষ করে ভাল ফল পাওয়ার আশা করা যায়না। যে সকল পুকুরে দিনের অধিকাংশ সময় সূর্যের আলো পড়ে এবং বাতাস লাগে সে সকল পুকুর পোনা চাষের জন্য নির্বাচন করতে হয়। তাছাড়া পুকুর এমন স্থানে হওয়া উচিত যেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল যাতে পোনা ক্রেতারা সহজে যাতায়াত ও পোনা পরিবহণ করতে পারে।

পুকুর প্রস্তুতির সময়

পোনা চাষের জন্য মাঘ/ফাল্গুন মাসেই পুকুরের প্রাথমিক প্রস্তুতি পর্ব সম্পন্ন করতে হয়। উল্লেখ্য যে সিলভার কার্প ও বিগহেডের রেণু বৈশাখ মাসেই পাওয়া যায়।

পানি নিষ্কাশন

পোনা মাছ চাষের পুকুর প্রতি বছর একবার করে পানি শুকিয়ে ফেলতে হয়। যাতে তলার মাটি সূর্যলোক ও বাতাসের সংস্পর্শে আসায় পরিশোধিত হয় ও উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া প্রধানতঃ রাক্ষুসে মাছ পুকুরে থেকে থাকলে তা অপসারণের জন্য পানি নিষ্কাশন খুবই জরুরী।

রোটেনন দ্বারা রাক্ষুসে মাছ নিধন

পানি নিষ্কাশন করে ফেললে যদি পুনরায় পানি সংগ্রহ করা সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে রাক্ষুসে বা অচাষকৃত মাছ দমনের জন্য রোটেনন নামক এক ধরণের পাউডার ব্যবহার করা হয়। রোটেনন হচ্ছে ডেরিস গাছের মূল থেকে তৈরী এক ধরণের পাউডার যা দেখতে হালকা বাদামী রং এর। রোটেনন প্রয়োগে মাছ মারা যায় তবে চিংড়ি ও অন্যান্য জলজ কীট মরে না। প্রতি ঘনমিটার পানিতে ৩ গ্রাম হারে রোটেনন পাউডার প্রয়োগ করলে সমস্ত রাক্ষুসে মাছ মারা যায়। রোটেনন প্রয়োগের ৭-১০ দিন পর পুকুরে পোনা ছাড়া যায়।

চুন প্রয়োগ

পুকুর শুকিয়ে চুন প্রয়োগ করা যায় আবার পানির মধ্যেও চুন প্রয়োগ করা যায়। প্রত্যেক ক্ষেত্রে শতাংশ প্রতি ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করতে হয়। শুকানো পুকুরে সব স্থানে ভাল করে চুন ছিটিয়ে দিতে হবে আর পানি থাকলে চুন পানিতে গুলে ছিটিয়ে দিতে হবে।

সার প্রয়োগ

পুকুরে পোনার প্রাকৃতিক খাদ্য জন্মানোর জন্য জৈব এবং অজৈব উভয় ধরণের সার ব্যবহার করা যায়। সার প্রয়োগের ফলে পুকুরে অতি ক্ষুদ্র উদ্ভিদ (Phytoplankton) দ্রুত বিস্তার লাভ করে এবং এদেরকে খাবার হিসাবে ব্যবহারকারী প্রাণিজাতীয় অণুজীবও (Zooplankton) দ্রুত তাদের বংশ বৃদ্ধিকরে। এসব ক্ষুদ্র উদ্ভিদ ও প্রাণী জাতীয় অনুজীব গুলোকে প্লাংটন বলা হয় যা রেণুর খাবার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। চুন প্রয়োগের ৭ দিন পর শতাংশে ৫-৭ কেজি গোবর, ১০০-১৫০ গ্রাম ইউরিয়া এবং ৫০-৭৫ গ্রাম টিএসপি পানিতে গুলিয়ে সারা পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হয়।

প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা

রেণু পোনা মজুদের আগেই পুকুরের প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা করে দেখা উচিত এবং সার দেয়ার ৫-৭ দিন পর তা করা উচিত। সাধারণতঃ পুকুরের পানির রং সবুজাভ, লালচে সবুজ, হালকা বাদামী হলে পানি রেণু পোনা ছাড়ার উপযোগী। বিভিন্নভাবে প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা করা যায়।

চিত্র ঃ ১২৮ প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা

সেকী ডিস্ক পরীক্ষা

এটি একটি সাদা কালো লোহার থালা। তিন রংয়ের নাইলনের সূতা দ্বারা ঝুলানো থাকে। প্রথম অংশ লাল, দ্বিতীয় অংশ সবুজ, বাকী অংশ সাদা। পানিতে ভিজানো সাদা-কালো দেখা না গেলে বুঝতে হবে অতিরিক্ত খাদ্য বর্তমান। সবুজ সূতা পানিতে ডুবানোর পর সাদা অংশ দেখা না গেলে বুঝতে হবে পুকুরে পরিমিত খাদ্য আছে। এ অবস্থায় রেণু ছাড়া যাবে। যদি সাদা অংশ দেখা যায় তবে বুঝতে হবে খাদ্য কম আছে। এ সময় পুকুরে আরও সার দিতে হবে। এ পরীক্ষা সকাল ১০-১১ টায় পুকুরের এক স্থানে সূর্যের বিপরীতে দাঁড়িয়ে করতে হয়।

গ্লাস পরীক্ষা

গামছার সাহায্যে পুকুরের পানি সংগ্রহ করে পরিষ্কার সাদা স্বচ্ছ কাঁচের গ্লাসে নিতে হবে। সূর্যের আলোর দিকে ধরে যদি গ্লাসের পানিতে কিছু সবুজ উদ্ভিদ কণা ও ৫-১০ টি ক্ষুদ্র প্রাণিকণা দেখা যায় তবে বুঝতে হবে প্রাকৃতিক খাদ্য আছে।

হাতের সাহায্যে পরীক্ষা

পরিষ্কার দিনের আলোতে পুকুরের পানিতে কনুই পর্যন্ত হাত ডুবিয়ে হাতের তালু বা পাতা দেখতে হবে। পানির মধ্যে হাতের তালু দেখা না গেলে এবং পানির রং সবুজাভ হলে বুঝতে হবে পরিমিত খাদ্য আছে।

পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা

সার প্রয়োগের কয়েকদিন পর পুকুরে পচন ক্রিয়ার ফলে পুকুরের তলদেশে বিষাক্ত গ্যাস সৃষ্টি হতে পারে। এ ছাড়া অন্যান্য কারণে যেমন কীটনাশক ব্যবহারের ফলে পচন ধরে বিষাক্ত গ্যাস সৃষ্টি হয়। বিষক্রিয়া জানার জন্য পুকুরে একটি হাপা খাটিয়ে তার মধ্যে ১০-১৫টি পোনা ছেড়ে ১২ ঘন্টা পর্যন্ত দেখতে হবে। যদি পোনা মারা না যায় তবেই পুকুরে রেণু মজুদ করা যাবে। বালতি বা ডেকচির মধ্যেও এ কাজটি করা যায়। পুকুরে মশারী জাল টেনে মরা পোকা-মাকড় তুলে ফেলতে হয়। হররা টেনে বাজে গ্যাস সহজেই দূর করা যায়। এ ছাড়া রেণু সংগ্রহ করতে যাওয়ার সময় বোতলে করে কিছু পরিমাণ পানি হ্যাচারিতে নিয়ে গিয়ে একটি পাত্রে ঢেলে হ্যাচারির কয়েকটি পোনা এতে দিয়ে ২/৩ ঘন্টা যাবৎ পর্যবেক্ষণ করেও পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা করা যায়। পানি সংগ্রহের সময় পুকুরের কাঁদা নেড়ে ঘোলা পানি সংগ্রহ করতে হবে। অনেক সময় পানিতে বিষাক্ততা না থেকেও কাঁদাতে থাকতে পারে। বিষাক্ততা দূর না হওয়া পর্যন্ত পোনা মজুদ করা যাবে না।

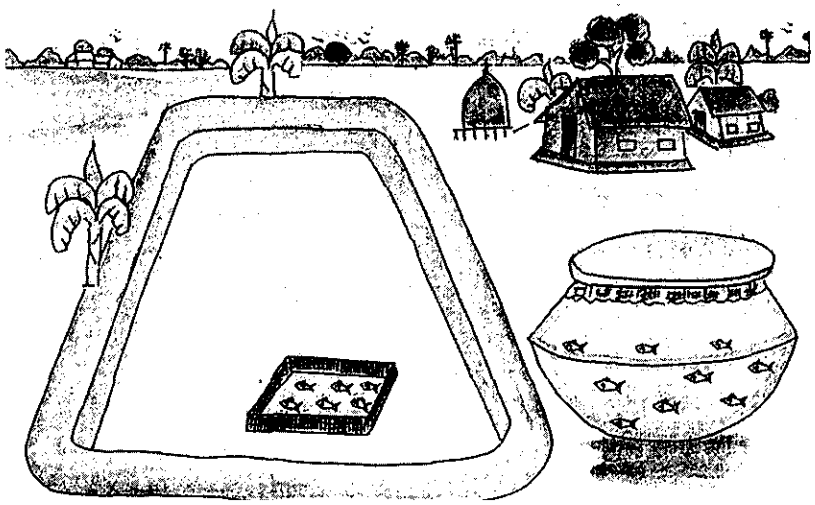

চিত্র ঃ ১২৯ পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা

ক্ষতিকারক পোকা-মাকড় নিধন

রেণু পোনা পুকুরে ছাড়ার ২৪-৪৮ ঘন্টা পূর্বে প্রতি ঘন মিটার পানির জন্য আধা মিলি লিটার হারে সুমিথিয়ন বা এক গ্রাম হারে ডিপটারেক্স প্রয়োগ করে পুকুর থেকে হাঁস পোকা এবং অন্যান্য ক্ষতিকারক পোকা যেমন ঃ কপিপোড, ক্লাডোসিরা ইত্যাদি অপাসারণ বা নিধন করা প্রয়োজন। নতুবা ঐ পোকা মজুদ কৃত পোনা খেয়ে ফেলবে বা মেরে ফেলবে।

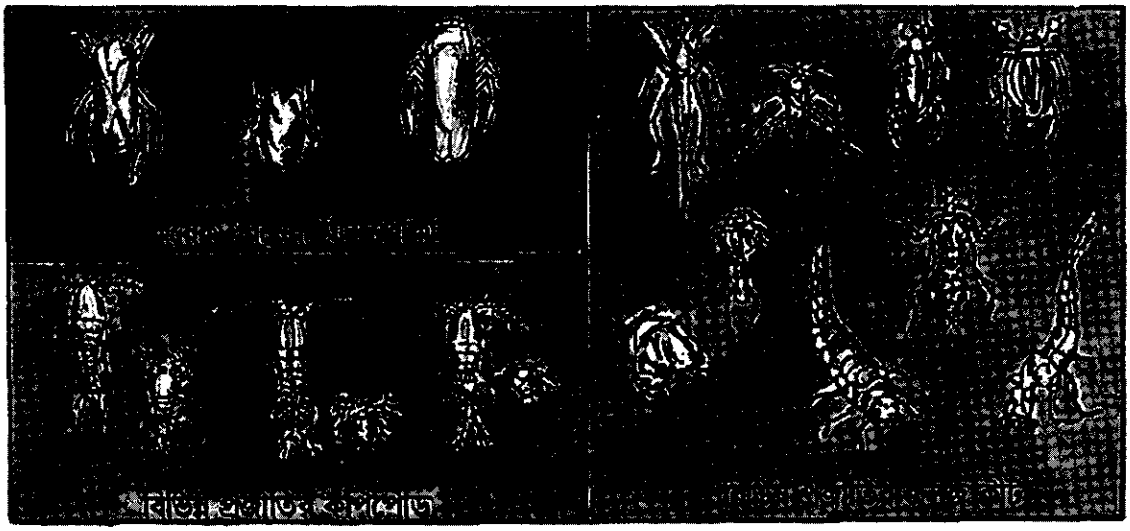

চিত্র ঃ ১৩০ রেণু পোনার জন্য ক্ষতিকর পোকামাকড়

রেণু পরিবহণ এবং নার্সারী পুকুরে মজুদ করা

হ্যাচারি থেকে অক্সিজেন ব্যাগেই রেণু পরিবহণ করা উচিত। ৯০×৫০ সেঃমিঃ পলিথিন ব্যাগে ৮-১০ ঘন্টা দূরত্বে ১২৫ গ্রামের বেশী রেণু পরিবহণ করা উচিত নয়। সাধারণতঃ প্রতিটি প্যাকেটের জন্য ২টি করে পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার করা উচিত। কোন কারণে যদি একটি ছিদ্র হয়ে যায় দ্বিতীয়টি পানি, অক্সিজেন ও পোনা রক্ষা করতে সাহায্য করবে। পরিবহণ কালে ব্যাগে যাতে কোন ধরণের আঘাত না লাগে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। আগুণের উৎস থেকে ব্যাগ সাবধানে রাখতে হবে।

রেণু ছাড়ার পূর্বে পুকুরের পানির তাপমাত্রার সাথে রেণু বহনকারী ব্যাগের বা পাতিলের পানির তাপমাত্রার সমতা আনতে হবে। ব্যাগের পানি ও পুকুরের পানি আস্তে আস্তে বদল করে তাপমাত্রার ব্যবধান ধীরে ধীরে কমাতে হবে। একাজটি ১৫-২০ মিনিট করতে হবে। তাপমাত্রা সমতায় আসলে ব্যাগের বা পাতিলের এক অংশ পানিতে ডুবিয়ে বাহির থেকে আস্তে আস্তে ভিতরের দিকে পানির স্রোত দিলে ধীরে ধীরে রেণু স্রোতের বিপরীতে বেরিয়ে আসবে। সাধারণত পাড়ের কাছাকাছি রেণু ছাড়তে হয়। ঠান্ডা আবহাওয়ায় রেণু ছাড়তে হবে। প্রখর রোদ, বৃষ্টি অথবা নিম্নচাপের দিনে পুকুরে রেণু ছাড়া উচিত নয়। সকালে কিংবা বিকালে রেণু ছাড়া যায়। তবে রাত ১০/১১ টায় রেণু ছাড়তে পারলে সবচেয়ে ভাল হয়। রাত ১০টার পর থেকে সকাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময় পুকুরের পানির পরিবেশ মোটামুটি একই থাকে, ফলে রেণু দীর্ঘক্ষণ সহনীয় পরিবেশ পায় যা তাকে নতুন পরিবেশে খাপ খাওয়াতে সাহায্য করে। তাছাড়া পোনার জন্য ক্ষতিকর পোকামাকড় রাতের বেলায় পোনাকে খুব একটা বিরক্ত করতে পারেনা। পুকুরে ৩-৪ দিন বয়সের

রেণু মজুদ করা ভাল। একটি নার্সারী পুকুরে একই প্রজাতির রেণু মজুদ করা সবচেয়ে ভাল। এক ধাপ পদ্ধতিতে প্রতি শতাংশে ৬-৮ গ্রাম এবং দুই ধাপ পদ্ধতিতে প্রতি শতাংশে ২৫-৩০ গ্রাম রেণু ছাড়া যায়।

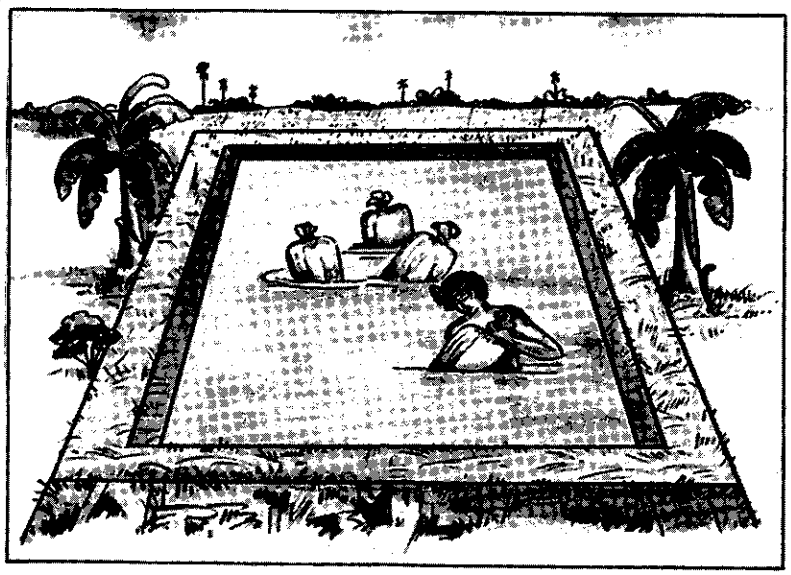

চিত্র ঃ ১৩১ রেনু অভ্যস্থকরণ ও পুকুরে ছাড়া

মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা

এক ধাপ পদ্ধতি

এ পদ্ধতিতে রেণু পোনাকে একই পুকুরে রেণু থেকে বড় মাছ উৎপাদন পুকুরে ছাড়ার উপযোগী অর্থাৎ ৫-১০ সেঃমিঃ আকার পর্যন্ত লালন করা হয়। ব্যবস্থাপনা ভাল হলে এক্ষেত্রে রেণুর বেঁচে থাকার হার ৫০-৬০% হয়ে থাকে।

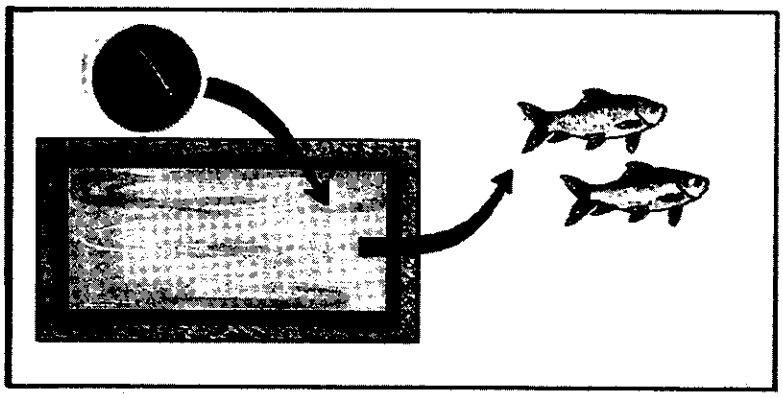

চিত্র ঃ ১৩২ পোনা চাষে একধাপ পদ্ধতি

দুই ধাপ পদ্ধতি

এ পদ্ধতিতে ৩-৪ দিন বয়সের ২৫-৩০ গ্রাম রেণু প্রতি শতাংশ নার্সারী পুকুরে ছেড়ে ধানী আকারের হলে অর্থাৎ ১.৫-২ সেঃ মিঃ আকারের হলে পরবর্তীতে লালন পুকুরে ৭-১২ সেঃ মিঃ চারা পোনায় রূপান্তর করা হয়। নিয়মিত সার ও খাবার দিলে ১০-১২ দিনের মধ্যেই ধানী পোনা কাটাই বা স্থানান্তর করা যায়। এ পদ্ধতি অধিক লাভজনক এবং পোনা টিকে থাকার হারও অত্যন্ত বেশী হয় এবং পোনা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। সঠিক ব্যবস্থাপনায় ধানী পোনার টিকে থাকার হার ৭০-৮০%। প্রতি শতাংশে একই জাতের অথবা বিভিন্ন জাতের ৮০০-১০০০ টি ধানী মজুদ করা যাবে।

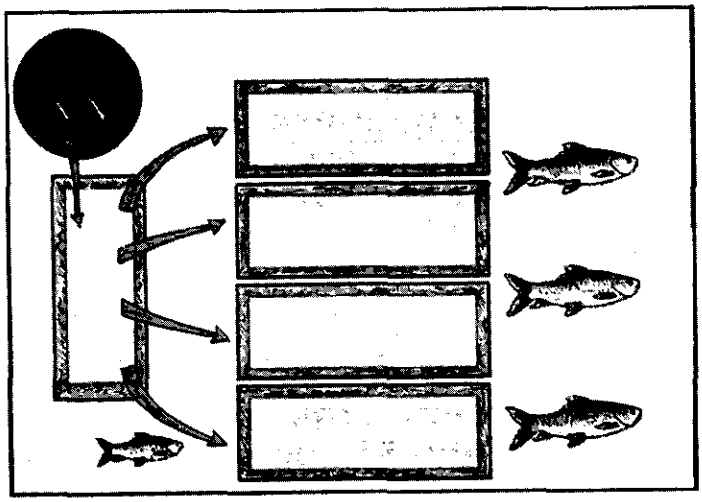

চিত্র ঃ ১৩৩ পোনা চাষের দুই ধাপ পদ্ধতি

লালন পুকুর প্রস্তুত

নার্সারী পুকুরের মতো লালন পুকুরও একই নিয়মে তৈরী করা হয়। তবে ধানী পোনা ছাড়ার পূর্বে সুমিথিয়ন বা ডিপটারেক্স ব্যবহারের দরকার নেই।

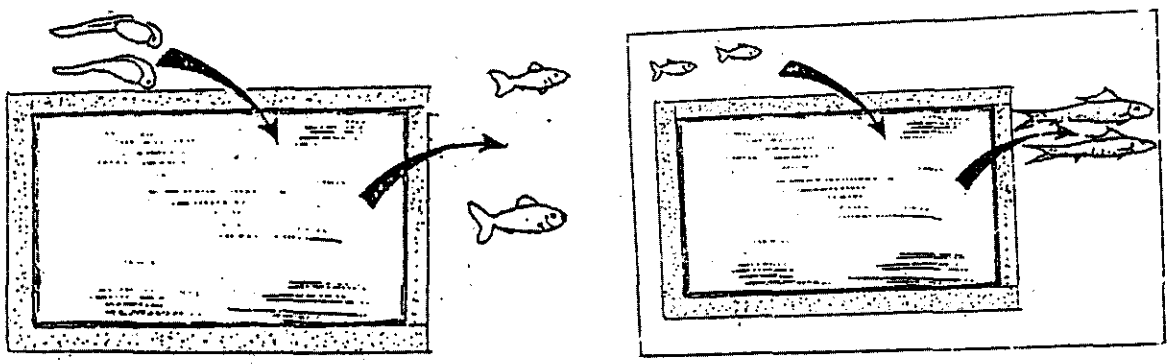

চিত্র ঃ ১৩৪ নার্সারী ও লালন পুকুর

সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ

পোনা মাছের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য এবং দৈহিক বৃদ্ধির জন্য পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্যের সাথে সম্পুরক খাদ্যের প্রয়োজন হয়। আধুনিক পদ্ধতিতে একই পুকুরে বেশী ঘনত্বে পোনার চাষ করলে বাহির হতে বাড়তি খাদ্য সরবরাহ করাকে সম্পুরক খাদ্য বলে। সম্পুরক খাদ্যের উপাদান সমূহ হলঃ সরিষার খৈল, গমের ভূষি, ধানের কুড়া, ফিস মিল, ক্ষুদিপানা, কুটি পানা ইত্যাদি। খাদ্যের পরিমাণ পুকুরের প্রাকৃতিক খাদ্যের অবস্থা, রেণুর মোট ওজন এবং তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে। পুকুরে যদি পর্যাপ্ত খাদ্য থাকে তবে রেণু ছাড়ার প্রথম ২-৩ দিন সম্পুরক খাবার না দিলেও চলবে। তারপর থেকে রেণু মজুদের ওজন অনুপাতে প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে খাবার প্রয়োগ করে যেতে হবে।

নিম্নে প্রতিদিনের সম্পুরক খাদ্যের পরিমাণ প্রদত্ত হলো

রেণু মজুদের পর	খাদ্যের পরিমাণ
১-৫ দিন	মজুদকৃত রেণুর ওজনের ২ গুণ
৬-১০ দিন	মজুদকৃত রেণুর ওজনের ৩ গুণ
১১-১৫ দিন	মজুদকৃত রেণুর ওজনের ৪ গুণ
১৬-২০ দিন	মজুদকৃত রেণুর ওজনের ৫ গুণ

খাদ্য প্রয়োগ পদ্ধতি

রেণু মজুদের প্রথম ৫ দিন শুধুমাত্র খৈল প্রয়োগ সবচেয়ে ভাল। এরপর থেকে প্রয়োজনীয় খাবারের মোট পরিমাণ নির্ধারন করে তার অর্ধেক ওজনের খৈল এবং বাকি অর্ধেক ওজনের চালের মিহি কুড়া অথবা গমের ভূষি একত্রে মিশিয়ে সমস্ত পুকুরে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। সরিষার খৈল অন্তত ২৪ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রেখে এরসাথে কুড়া বা ভূষি মেশাতে হয়। পুকুরে দিনে দুই বার খাবার প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। মোট খাবারের অর্ধেক সকাল ১০-১১ টায় এবং বাকি অর্ধেক বিকেল ৩-৪ টায় প্রয়োগ করতে হয়। খাদ্যের এ মাত্রা ধানী কাটাই না করা পর্যন্ত চলবে। লালন পুকুরে পোনার দেহের ওজনের ৫-১০% হারে খাবার দেয়া উচিৎ। অধিক উৎপাদনের জন্য এর সাথে প্রোটিন সমৃদ্ধ খাদ্য (গবাদি পশুর রক্ত/ফিসমিল) দেয়া যায়। গ্রাসকার্পের ধানী মজুদ করা হয়ে থাকলে নিয়মিত ক্ষুদিপানা বা কুটিপানা প্রয়োগ করতে হয়।

হররা টানা

পোনা মজুদের ২-৩ দিন পর থেকে মাঝে মাঝে হররা টেনে দিলে পুকুরের তলায় বাজে গ্যাস জমতে পারেনা।

পোনা আহরণ ও বিক্রয়

পোনা মাছ বিক্রয়ের পূর্বে পোনা প্রতিপালন বা লালন পুকুরে আংশিক জাল টেনে পোনার আকার, দৈহিক বৃদ্ধি, রোগ বালাই ও শারীরিক সজীবতা পরীক্ষা করে নিতে হবে। পোনা বিক্রয়ের দিন তারিখ ও সময় নির্ধারিত হওয়ার পর পোনা পরিবহণের দূরত্ব ও সময় কালের উপর নির্ভর করে অন্তত ২৪-২৮ ঘন্টা পূর্বে লালন পুকুর থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পোনা আহরণ করে অভ্যন্ত করন বা টেকসই করার ব্যবস্থা নিতে হবে। পোনা ধরার জন্য ছোট ফাঁসযুক্ত নরম জাল ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। লালন পুকুরে জাল টানার পর প্রয়োজনীয় সংখ্যক পোনা জালে রেখে বাকী পোনা পুকুরে ছেড়ে দিতে হবে। বিক্রয়যোগ্য পোনাগুলোকে জালের মধ্যে ১০-১৫ মিনিট পানির ঝাপটা দিয়ে আংশিক পেট খালি করার সুযোগ দিতে হবে। কাল বিলম্ব না করে এ্যালুমিনিয়ামের হাড়ি অথবা পলিথিন ব্যাগের সাহায্যে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি টেকসইকরণ জলাধারে স্থানান্তর করে পানি প্রবাহের ব্যবস্থা নিতে হবে।

পোনা পরিবহণ ব্যবস্থা

পোনা পরিবহণ বিভিন্ন পদ্ধতিতে করা যায়।

সনাতন পদ্ধতি

মাটির হাঁড়িতে বা এ্যালুমিনিয়ামের হাড়িঁতে পোনা পরিবহণ করা যায়। টেকসই করণের পর পোনা পরিবহণের উপযোগী হওয়ার পর হাড়িতে পরিমাণমত নলকূপ বা নদীর পরিষ্কার ঠান্ডা পানি নিতে হয়। এ পদ্ধতিতে ২০-৩০টি/ লিটার ঘনত্বে পোনা পরিবহণ করা যায়। পরিবহণকালীন হাঁড়ির পানি ঝাকিঁয়ে বাতাসের অক্সিজেন পানিতে মিশাতে হয় এবং ৪/৫ ঘন্টা পর পর পানি বদলাতে হয়। পরিবহণকালে হাড়িঁর মুখ ভেজা পাতলা কাপড় বা মশারীর জাল দিয়ে ঢেকে রাখতে হয়। পোনা পরিবহণকালে আবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যেন হাঁড়ির পানি অত্যাধিক গরম না হয়।

চিত্র ঃ ১৩৫ পোনা পরিবহনের সনাতন পদ্ধতি

আধুনিক পদ্ধতি

এ পদ্ধতিতে পলিথিন ব্যাগে পানি ও পোনা রেখে অক্সিজেন সহ প্যাকেট করে পোনা পরিবহণ করা হয়। বাজারে বিভিন্ন পরিমাপে পলিথিন ব্যাগ পাওয়া যায় তন্মধ্যে ৯০ সেঃমিঃ × ৫০সেঃমিঃ আকারের পলিথিন ব্যাগ পোনা ও রেণু পরিবহণের জন্য সর্বোত্তম। প্রতিটি প্যাকেটের জন্য ২টি করে পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার করা উচিত। কোন কারণে যদি একটি ছিদ্র হয়ে যায় দ্বিতীয়টি পানি, অক্সিজেন ও পোনা রক্ষা করতে সাহায্য করবে। এজন্য সমান আকারের দুইটি পলিথিন ব্যাগ নিয়ে একটি আর একটির ভিতর ঢুকিয়ে তার তিনভাগের এক অংশ পানি দ্বারা ভর্তি করতে হবে এবং ব্যাগের উপরের অংশ একহাত দিয়ে আটকিয়ে এবং অন্য হাত দিয়ে ব্যাগটিকে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দেখতে হবে কোন ছিদ্রপথে পানি বেরিয়ে যায় কিনা। ছিদ্র যুক্ত পলিথিন ব্যাগ পাওয়া গেলে তা পরিবর্তন করতে হবে। প্রতিটি পলিথিন ব্যাগে ৪-৬ লিটার পানির মধ্যে আকার ভেদে ৫০-১০০টি/লিটার ঘনত্বে রেখে পলিথিনের বাকী অংশ অক্সিজেন গ্যাস দ্বারা পূর্ন করে সুতলী দিয়ে বেঁধে নিতে হয় যাতে অক্সিজেন বেরিয়ে যেতে না পারে। পোনা পরিবহণের জন্য পানির তাপমাত্রা ২২- ২৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস এর মধ্যে রাখা উচিৎ। পানির তাপমাত্রা বেশী হলে অক্সিজেন ধারণ ক্ষমতা কমে যায়। পরিবহণকালে পলিথিন ব্যাগ যাতে ছিদ্র হতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে সম্ভব হলে পলিথিন ব্যাগ চটের ব্যাগ বা

বস্তায় ঢুকিয়ে নিতে হবে। অধিক তাপমাত্রা শোষনের জন্য চটের ব্যাগ বা বস্তা ভিজিয়ে নেয়া যেতে পারে। এ ছাড়া ইনসুলেটেড ট্যাংকে এরেটরের সাহায্যে অক্সিজেন সরবরাহের মাধ্যমে পোনা পরিবহণ করা যায়।

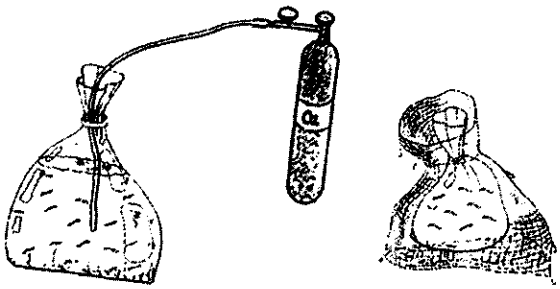

চিত্র ঃ ১৩৬ পোনা পরিবহনের আধুনিক পদ্ধতি

পোনা পরিবহণে লক্ষণীয় বিষয়

- একটি ব্যাগে, পাতিলে বা ট্যাংকে একই আকারের ও একই প্রজাতির পোনা দিতে হবে।
- পোনা ব্যাগে, পাতিলে বা ট্যাংকে নেয়ার আগে পেট খালি করে কনডিশনিং করে নিতে হবে।
- দূর্বল পোনা পরিবহণ করা উচিত নয়।
- পরিবহণ কালে সরাসরি নলকূপের পানি ব্যাগে, পাতিলে বা ট্যাংকে দেয়া উচিত নয়। এতে পোনা মারা যেতে পারে।
- প্রয়োজন হলে একই তাপমাত্রার ভাল পানি দিয়ে ব্যাগের বা পাত্রের পানি বদলানো যেতে পারে।

মাঠ পর্যায়ে পোনা সরবরাহ নিশ্চিতকরণ

বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় সাতশত হ্যাচারি থাকলেও তা সারাদেশে সমভাবে বিস্তৃত নয়। ফলে কোথাও কোথাও প্রয়োজনের তুলনায় বেশী রেণু পোনা উৎপাদিত হয় যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ অবিক্রিত থেকে যায়। আবার দেশের কোন কোন এলাকায় রেণুর অভাবে মৎস্য চাষ ব্যাহত হচ্ছে। পোনা যেহেতু জীবন্ত অবস্থায় পরিবহণ করতে হয় সে জন্য দুর দুরান্ত থেকে পোনা সংগ্রহ করা গ্রামীণ পর্যায়ে চাষীদের জন্য খুবই ব্যয়বহুল এবং কষ্টসাধ্য ব্যাপার। অনেক চাষী মৎস্য চাষে আগ্রহী হলেও তাদেরকে সুলভ মূল্যে সঠিক আকারের চাষ উপযোগী প্রজাতিসমূহের পোনা সরবরাহ নিশ্চিত করতে না পারায় মৎস্য চাষে ব্যাপকভাবে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে এখনও সম্পৃক্ত করা সম্ভব হয়নি। এ জন্য সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থার মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে নার্সারী পুকুর ব্যবস্থাপনার জন্য উদ্যোক্তা তৈরি করতে হবে যাতে গ্রামীণ পর্যায়েও মৎস্য চাষীগণ সহজেই বিভিন্ন প্রজাতির, বিভিন্ন আকারের পোনা সারা বছর ব্যাপী সংগ্রহ করার সুযোগ পায়। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় যেখানে প্রয়োজন সেখানে নতুন হ্যাচারি স্থাপন করে নার্সারী মালিকদের নিকট রেণু পোনা সরবরাহের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

দশম অধ্যায়

মাছের রোগ ও প্রতিকার

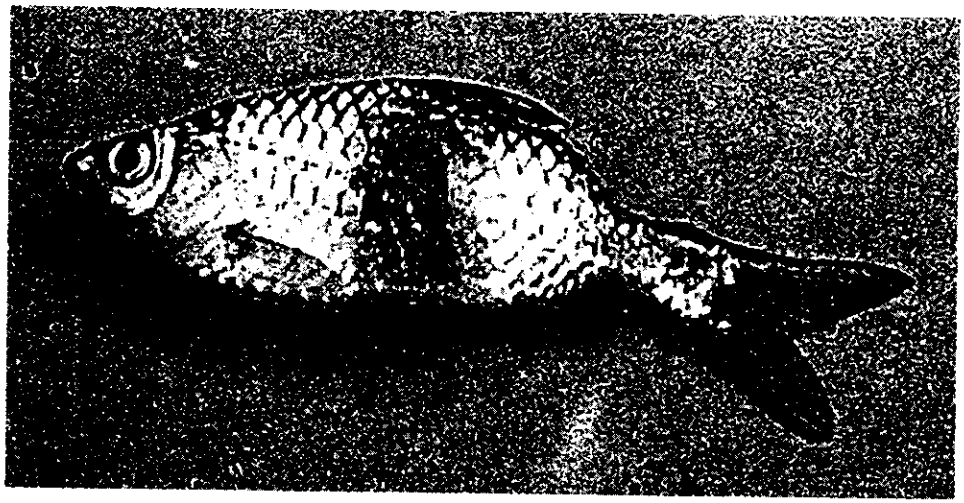

চিত্র ঃ ১৩৭ ক্ষতরোগে আক্রান্ত পুঁটি মাছ

বাংলাদেশে আদিকাল থেকেই বসত বাড়ীর পুকুর দিঘীতে সনাতন পদ্ধতিতে মাছ চাষ প্রচলিত ছিল। স্বাভাবিক ভাবেই তখন বিজ্ঞান ভিত্তিক কোন প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ ছিল না। সত্তর দশকের গোড়ার দিকে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে মাছের কৃত্রিম প্রজননের কৌশল উদ্ভাবিত হওয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশেও মাছের পোনা উৎপাদনের জন্য হ্যাচারি স্থাপন এবং পরবর্তীতে ব্যাপক হারে তা প্রসারিত হওয়ায় বদ্ধ জলাশয়ে মাছ চাষের ব্যাপকতা বেড়েই চলেছে। ইতোমধ্যে গবেষণা ও প্রদর্শণীর মাধ্যমে মাছ চাষ ও ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও উন্নয়নের ফলে দেশে শত শত উদ্যোক্তা ও মৎস্য চাষী এই কর্মকান্ডকে একটি সফল ব্যবসা হিসাবে গ্রহণ করেছে। ফলে দেশে বর্তমানে শুধু মাছ চাষ থেকেই মোট মৎস্য উৎপাদনের শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ বদ্ধ জলাশয় সমূহের মাধ্যমেই যোগান দেয়া সম্ভব হচ্ছে।

এক দিকে মাছ চাষের পদ্ধতিগত দিক যত নিবিড় হচ্ছে এবং অন্যদিকে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্যহীনতার কারণে মাছের রোগ বালাই এর প্রবণতা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। মৎস্য চাষীরা সংক্রামক রোগ বালাই এর কারণে প্রতি বৎসর চিংড়িসহ অন্যান্য মাছ চাষে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। তাদের কথা বিবেচনা করেই এই গ্রন্থে আলোচিত বিবিধ প্রযুক্তির প্রেক্ষিতে এ অধ্যায়ে ছক আকারে মাছের সম্ভাব্য রোগ যেমনঃ ক্ষতরোগ, ছত্রাক রোগ, পাখনা ও লেজ পচাঁ রোগ, ফুলকা পচাঁ রোগ, পেট ফোলা রোগ, সাদা ও কাল দাগ রোগ, বিভিন্ন প্যারাসাইটিক সংক্রামণসহ ভিটামিন অভাব জনিত রোগ ইত্যাদির বর্ণনা ও প্রতিকার নিম্নে প্রদত্ত হল।

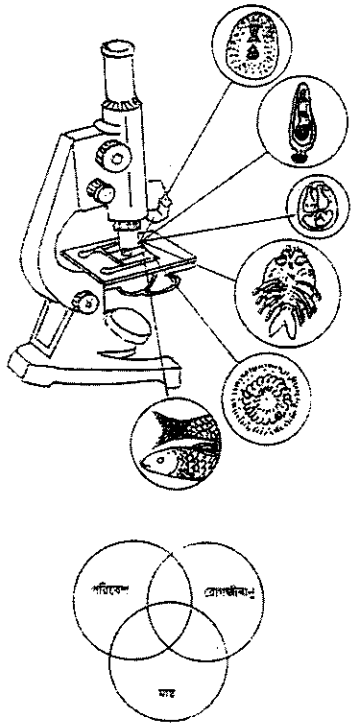

চিত্র ঃ ১৩৮ পরিবেশ ও মাছের রোগ বালাই

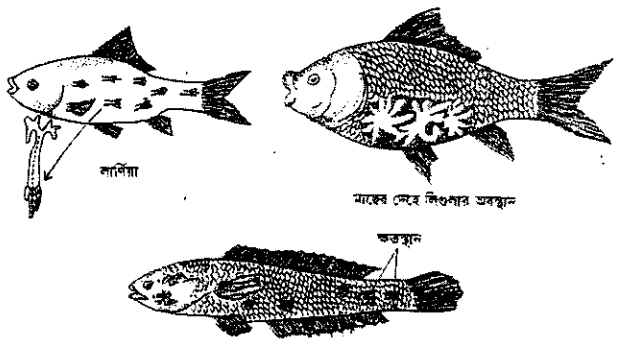

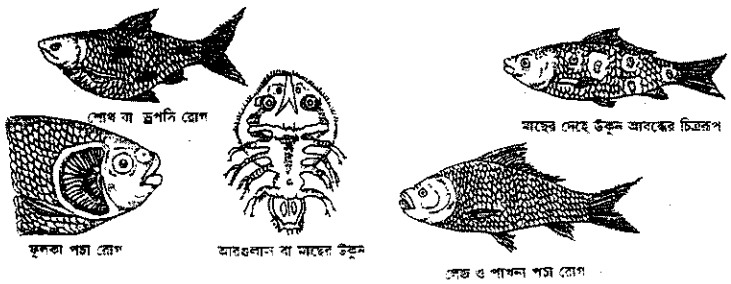

চিত্র ঃ ১৩৯ মাছের বিভিন্ন রোগ

মাছের দেহের স্বাভাবিক বিকশিত অবস্থার অস্বাভাবিক রূপ ও নিষ্ক্রিয়তা কিংবা বিভিন্ন প্রকার রোগের চিহ্নিত লক্ষণসমূহের বহিঃপ্রকাশ ঘটলেই মাছের রোগ হয়েছে বলা যায়।

বাংলাদেশে মাছের এ যাবত সনাক্তকৃত বিভিন্ন প্রকার রোগ বালাই এর লক্ষণ, কারণ ও সম্ভাব্য প্রতিষেধক/প্রতিকার

ক্রমিক	রোগের নাম	আক্রান্ত মাছের প্রজাতি	রোগের লক্ষণ ও কারণ	চিকিৎসা ও ঔষধ প্রয়োগ	প্রতিষেধক/প্রতিকার
১	ছত্রাক রোগ (সেপ্রোলেগনিয়াসিস)	রুই জাতীয় ও অন্যান্য চাষ যোগ্য মাছ।	ক. আক্রান্ত মাছের ক্ষতস্থানে তুলার ন্যায় ছত্রাক দেখা দেয় এবং পানির স্রোত যখন স্থির হয়ে যায় কিংবা বদ্ধজলায় অথবা হ্যাচারী ট্যাংকে যেখানে অনিষিক্ত ডিমের ব্যাপক সমাগম ঘটে উহাতে ছত্রাক রোগ দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করে। এমনি ধরনের প্রাকৃতিক জলাশয়ে প্রায় শতকরা ৯৮ ভাগ মাছের ডিম ক্ষতিগ্রস্থ হয়। সেপ্রোলেগনিয়া প্রজাতি এ রোগের কারণ।	ক. হ্যাচারিতে লালনকৃত ডিমগুলোকে ২৫০ পিপিএম ফরমালিন দিয়ে ধৌত করা। খ. খাচা এবং পেনে চাষকৃত আক্রান্ত মাছগুলোকে শতকরা ৩-৫ ভাগ ফরমালিন দিয়ে ২-৩ মিনিটের গোসল দেয়া। গ) বিকল্প হিসেবে শতকরা ৫ভাগ লবন পানিতে ৩ মিনিট গোছল করানো যেতে পারে।	ক. হ্যাচারীর প্রতিটি যন্ত্রপাতি ও ট্যাংক সম্পূর্ণরূপে পরিস্কার করার পর শতকরা ১০ ভাগ ফরমালিন পানি দিয়ে ধৌত করা। খ. অনিষিক্ত ও মৃত ডিমগুলোকে অবিলম্বে হ্যাচারি ট্যাংক থেকে সরিয়ে নেয়া এবং অধিক খাদ্য প্রয়োগ না করা।
২	মাছের ক্ষতরোগ (ইপিজুটিক আলসারেটিভ সিনড্রোম)	শোল, গজার, টাকি, পুটি, বাইম, কৈ, মেনি, মৃগেল, কার্পিও এবং তলায় বসবাসকারী অন্যান্য প্রজাতির মাছ।	ক. এ রোগের মূল কারণ এ্যাফানোমাইসিস ইনভাডেন্স নামক ছত্রাক এর দ্বারা মূলতঃ মাছের মাংসপেশী আক্রান্ত হয়। এ ছাড়া কিছু ব্যাকটিরিয়া, প্রোটেজোয়া সংশ্লিষ্ট আছে বলে জানা যায়। রোগাক্রান্ত হওয়ার পূর্বে পানির গুণাগুণের অবনতি ঘটে, যেমন ঃ i) হঠাৎ তাপমাত্রার কমতি (১৯° সেঃ এর কম)। ii) পি, এইচ-এর কমতি (৪-৬)। iii) এ্যালকালিনিটির কমতি (৪৫-৭৪ পিপিএম)। iv) হার্ডনেস-এর তুলনামূলক বৃদ্ধি। v) ক্লোরাইড এর স্বল্পতা (৩-৬ পিপিএম)।	ক. নিরাময়ের জন্য ০.০১ পিপিএম চুন ও ০.০১ পিপিএম লবণ অথবা ৭-৮ ফুট গভীরতায় প্রতি শতাংশ জলাশয়ে ১ কেজি হারে চুন ও ১ কেজি হারে লবন প্রয়োগ করলে আক্রান্ত মাছগুলো ২ সপ্তাহের মধ্যে আরোগ্য লাভ করে।	ক. আগাম প্রতিকার হিসাবে আশ্বিন কার্তিক মাসে বর্ণিত হারে লবণ ও চুন প্রয়োগ করলে আসন্ন পরবর্তী শীত মৌসুমে মাছের ক্ষত রোগের প্রাদুর্ভাব থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়।
৩	ক্ষতরোগ	সিলভার কার্প	ক. উপকুলীয় অঞ্চলে মাছ চাষের পুকুর বন্যায় প্লাবিত হলে ক্লোরাইডের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির (৩০ পিপিএম এর অধিক) ফলে কেবল মাত্র সিলভার কার্প মাছে দ্রুত ক্ষতরোগ দেখা দেয়।	ক. আক্রান্ত পুকুরের তিন ভাগের দুই ভাগ পানি মিঠা পানির দ্বারা পরিবর্তন করা। খ. প্রতি শতাংশ জলাশয়ে ৩/৪ টি হারে চালতা ছেঁচে সারা পুকুরে ছড়িয়ে দিতে হবে।	ক. বর্ণিতহারে চালতা প্রয়োগের ফলে ক্ষতরোগ আক্রান্ত সিলভার কার্প দ্রুত আরোগ্য লাভ করে। খ. পুকুরকে বন্যামুক্ত রাখুন।
৪	পাখনা অথবা লেজ পচাঁ রোগ	রুই জাতীয় মাছ, শিং, মাগুর ও পাঙ্গাস মাছ।	ক. প্রাথমিকভাবে পিঠের পাখনা এবং ক্রমান্বয়ে অন্যান্য পাখনা আক্রান্ত হয়। এ্যারোমোনাস ও মিক্সোব্যাকটার গ্রুপের ব্যাকটেরিয়া দ্বারা এ রোগের সৃষ্টি হয়। খ. পানির পি-এইচ ও ক্ষরতার স্বল্পতা দেখা দিলে এ রোগ দেখা দিতে পারে।	ক. ০.৫ পিপিএম পটাশযুক্ত পানিতে আক্রান্ত মাছকে ৩-৫ মিনিট গোসল করাতে হবে। খ. পুকুরে সার প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে।	ক. রোগজীবানু ধ্বংসের পর মজুদকৃত মাছের সংখ্যা কমাবেন। খ. প্রতি শতাংশে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করুন।
৫	পেট ফোলা রোগ	রুই জাতীয় মাছ, শিং, মাগুর ও পাঙ্গাস।	ক. মাছের দেহের রং ফ্যাকাশে হয়ে যায় এবং পানি সঞ্চালনের মাধ্যমে পেট ফুলে যায়। খ. মাছ ভারসাম্যহীনভাবে চলাচল করে এবং পানির ওপর ভেসে থাকে। অচিরেই আক্রান্ত মাছের মৃত্যু ঘটে। গ. এ্যারোমোনাস জাতীয় ব্যাকটেরিয়া এরোগের কারণ।	ক. খালী সিরিঞ্জ দিয়ে মাছের পেটের পানিগুলো বের করে নিতে হবে। প্রতি কেজি মাছের জন্য ২৫ মিঃ গ্রাঃ হারে ক্লোরেমফেনিকল ইনজেকশন দিতে হবে অথবা খ. প্রতি কেজি খাবারের সাথে ২০০ মিঃ গ্রাঃ ক্লোরেমফেনিকল পাউডার মিশিয়ে সরবরাহ করা।	ক. প্রতি শতাংশ জলাশয়ে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করুন। খ. মাছের খাবারের সাথে ফিশমিল ব্যবহার করুন। গ. মাছকে সুষম খাদ্য সরবরাহে করবেন। ঘ. প্রাকৃতিক খাবার হিসেবে প্লাংকটনের স্বাভাবিক উৎপাদন নিশ্চিত করুন।

৬	সাদা দাগ রোগ	রুই জাতীয় মাছ	ক. মাছের পাখনা, কান ও দেহের উপর সাদা দাগ দেখা দেয়। খ. মাছের ক্ষুধামন্দা এবং দেহের স্বাভাবিক পিচ্ছিলতা লোপ পেয়ে খসখসে হয়ে যায়। গ. ইকথায়োপথেরিয়াস প্রজাতি এ রোগের কারণ।	ক. আক্রান্ত মাছগুলিকে ৫০ পিপিএম ফরমালিনে গোসল দেয়া অথবা খ. ১ পিপিএম তুঁতে পানিতে গোসল দেয়া অথবা গ. শতকরা ২.৫ ভাগ লবণ পানিতে কয়েক মিনিটের জন্য রাখা অথবা যতক্ষণ পর্যন্ত মাছ লাফিয়ে না উঠবে।	ক. শামুক জাতীয় প্রাণী পুকুর থেকে সরিয়ে ফেলা। খ. শতকরা ২.৫ ভাগ লবণ পানিতে ৫-৭ মিনিট গোসল দিয়ে জীবানুমুক্ত করে পোনা মজুদ করা। গ. রোদে শুকানো জাল পুকুরে ব্যবহার করা। ঘ. স্বাভাবিক সংখ্যা বজায় রেখে অতিরিক্ত মাছ সরিয়ে নেয়া।
৭	সাদা দাগ রোগ	মৃগেল ও রুই মাছের পোনা।	ক. পোনা মাছের আইশ, পাখনাসহ সারা দেহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাদা দাগ দেখা দেয়। খ. প্রায় ২ সপ্তাহকালীন সময় অব্যাহত থাকে। গ. এ রোগ ব্যাকটেরিয়া জনিত	ক. মাছের সংখ্যা কমিয়ে পানির প্রবাহ বৃদ্ধি করা। জীবাণ্ মুক্ত পানিতে দুই সপ্তাহের মধ্যে মাছ স্বাভাবিকভাবেই আরোগ্য লাভ করে। বিশেষ কোন চিকিৎস্যার প্রয়োজন নেই।	ক. চুন প্রয়োগের মাধ্যমে পোনা মাছের লালন পুকুর প্রস্তুত করলে এ রোগের প্রাদুর্ভাব এড়ানো যায়।
৮	মিক্সোবোলিয়াসিস	রুই জাতীয় মাছ	ক. মিক্সোবোলাস প্রজাতির এককোষী প্রাণী রুই জাতীয় মাছের বিশেষ করে কাতলা মাছের ফুলকার উপরে সাদা কিংবা হালকা বাদামী গোলাকার গুটি তৈরী করে বংশ বৃদ্ধি করতে থাকে। ক্রমান্বয়ে ঐ গুটির প্রভাব ফুলকায় ঘা দেখা যায় এবং ফুলকা খসে পড়ে। শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাঘাত সৃষ্টিতে মাছ অস্থিরভাবে ঘোরা ফেরা করে এবং খাবি খায়। শেষ রাতের দিকে ব্যাপক মড়ক দেখা যায়।	ক. অদ্যাবদি এই রোগের সরাসরি কোন চিকিৎসা আবিস্কৃত হয় নাই। খ. তথাপিও প্রতি শতাংশ জলাশয়ে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করলে পানির গুণাগুণ বৃদ্ধি পেয়ে অম্লত্ব দুর হয়। পরজীবিগুলো ক্রমান্বয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় এবং মাছ নিস্কৃতি লাভ করে।	ক. পুকুর প্রস্তুতকালীন প্রতি শতাংশ জলাশয়ে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করে মাটি শোধন করা হলে আসন্ন মৌসুমে এ রোগের প্রকোপ থাকে না।
৯	উকুঁন রোগ (আরগুলোসিস)	রুই মাছ এবং কদাচিত কাতলা মাছ।	ক. গ্রীষ্মকালে এ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। খ. রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেলে মাছের সারা দেহে উকুঁন ছড়িয়ে পড়ে। দেহের রস শোষন করে মাছকে ক্ষতবিক্ষত ও দুর্বল করে দেয়। গ. মাছ স্বাভাবিক খাদ্য গ্রহণ বন্ধ করে পানির উপরিভাগের সামান্য নীচে দলবদ্ধভাবে অস্থিরতার সাথে চলাফেরা করে। ঘ. শক্ত কিছু পেলে গা ঘষে। ক্রমান্বয়ে দেহ ক্ষীণ ও দুর্বল হয়ে মাছ মারা যায়। ঙ. আরগুলাস সিয়ামেনসিস এ রোগের কারণ।	ক. ডিপটারেক্স (ডাইলকস, নেগুভন, টেগুভন) ০.৫ পিপিএম হারে পুকুরে প্রয়োগ করা। সপ্তাহে একবার এবং পরপর ৫ বার অথবা খ. ০.৮ পিপিএম হারে সুমিথিয়ন পুকুরে প্রয়োগ করতে হবে। প্রতি সপ্তাহে ১ বার এবং পরপর ৫ বার। বিকল্প হিসাবে ঃ গ. সকল রুই মাছকে ০.২৫ পিপিএম পটাশ দ্রবনে ৫-৬ মিনিট গোসল করাতে হবে অথবা যতক্ষন পর্যন্ত মাছ লাফিয়ে না উঠবে। আর একটি বিকল্পঃ ঘ. সবকটি রুই মাছকে ২ মাসের জন্য পুকুর থেকে সরিয়ে অথবা বিক্রি করে ফেলতে হবে। অতঃপর উপরে বর্ণিত প্রক্রিয়ায় পটাশ দ্রবণে গোসল দিয়ে পুনরায় পোনা মজুদ করতে হবে।	ক. আক্রান্ত পুকুরকে পাঁচ সপ্তাহ যাবৎ সম্পূর্ণ শুকিয়ে নিয়ে প্রতি শতাংশে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করুন। খ. পুকুরের ভিতর থেকে যাবতীয় শক্ত পদার্থ (এমনকি একটি ইটের টুকরাও) সরিয়ে ফেলুন। পানির নীচে বাঁশের কঞ্চিসহ যে কোন ডুবন্ত শক্ত বস্তু উকুঁনের ডিম পাড়ার উপযুক্ত স্থান) গ. পোনা মজুদের আগে পোনা মাছকে অবশ্যই পটাশ দ্রবনে গোসল দিয়ে উকুনমুক্ত করে নিন। ঘ. আক্রান্ত পুকুর থেকে উকুন রোগ সংক্রমনের সম্ভাব্য সকল প্রক্রিয়া যেমন আক্রান্ত পুকুর হইতে পানি, পোনা মাছ, ঘাস, লতা বা ভেজা জাল অন্য পুকুরে প্রবেশ নিষিদ্ধ করুন। এমনকি আক্রান্ত পুকুরে ব্যবহৃত জেলেদের ভেজা গামছা ও লুঙ্গি অন্য পুকুরে ব্যবহার করবেন না। ঙ. পুকুরে ব্যবহার্য খামারের জালসহ যাবতীয় সরঞ্জামাদি পুকুরে ব্যবহারের পূর্বেই অবশ্যই ভালভাবে রোদে শুকিয়ে নিবেন।

১০	ট্রাইকোডিনিয়াসিস (ফুলকা পঁচা রোগ)	বুই, মৃগেল ও গ্রাসকার্প	ক. মাছের ফুলকার উপর প্রথমে দু-এক জায়গায় হালকা হলুদ রংয়ের ক্ষুদ্রাকার গুটি দেখা দেয় এবং ক্রমান্বয়ে রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেলে বিক্ষিপ্ত রক্তক্ষরণসহ প্রচুর ঝিল্লি আবরণ সারা ফুলকার উপর ছড়িয়ে পড়ে, শ্বাস বুদ্ধ হয়ে মাছ মারা যায়। খ. ট্রাইকোডিনা প্রজাতি এ রোগের কারণ।	ক. আক্রান্ত মাছকে ২৫০ পিপিএম ফরমালিন এ ৩-৫ মিনিটের জন্য গোসল দেয়া।	ক. মাছের সংখ্যা কমিয়ে দেয়া। খ. অতিরিক্ত মিশ্র (কম্পোষ্ট) ও জৈব সার না দেয়া। গ. প্রতি শতাংশ জলাশয়ে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করা।
১১	মাছের জোঁক	বাটামাছ (ল্যাবিও বাটা) ও মাগুর মাছ	ক. স্বল্প পিএইচ এর পানিতে (অম্লপানিতে) তলায় বিচরণ কারী মাছসমূহের গায়ে জোঁকের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। খ. জোকগুলো ত্বক থেকে দেহের রস শোষন করতে গিয়ে ক্ষত সৃষ্টি করে, ক্ষতে পরবর্তীতে ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। গ. পোসথোডিপ্লোটোমাম প্রজাতি এ রোগের কারণ।	ক. প্রতি শতাংশ জলাশয়ে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করুন।	ক. পুকুর প্রস্তুতি লগ্নে একই হারে চুন প্রয়োগ করলে পরবর্তী মৌসুমে জোঁকের প্রাদূর্ভাব থাকে না।
১২	কালো দাগ রোগ	বুই জাতীয় পোনা মাছ	ক. বুই, মৃগেল ও কাতলা মাছের পোনার দেহের উপরে ক্ষুদ্র মুক্স গোলাকার সাময়িক কালো দাগ দেখা দেয়, যাহা পোনা মাছের বিক্রির চাহিদা হ্রাস করে। খ. পোস্থোডিপ্লোসটোমাম প্রজাতি এ রোগের কারণ।	ক. কোন সঠিক চিকিৎসা নেই। মাছগুলোকে অল্প ঘনত্বে বাস করার সুযোগ দিন। খ. দুই সপ্তাহ পর স্বাভাবিক ভাবেই পরজীবিগুলো অদৃশ্য হয়ে যায়।	ক. শামুক ও ঝিনুক মুক্ত করে নার্সারী পুকুরে পোনা মজুদ করতে হবে। অবশ্য পুকুর শুকানোর পর চুন দিয়ে মাসাধিক কাল ফেলে রাখলে শামুক ও ঝিনুক জাতীয় প্রাণী এড়ানো সম্ভব। খ. মাছখেকো পাখি তাড়াবার ব্যবস্থা রাখুন।
১৩	ডেক্টাইলোগাই রোসিস (গিলফ্লুক)	মৃগেল, শোল, টাকি ও মাগুর জাতীয় মাছ।	ক. মনোজেনিয়া ট্রিমাটোডস্ প্রজাতির যাহা খালী চোখে দেখা যায় না এমন ক্ষুদ্র পরজীবিগুলো মাছের ফুলকার উপর বসে থেকে ফুলকার রস চুসে নেয় এবং ক্ষতের সৃষ্টি করে। এগুলো ফুলকার ওপরে স্বচ্ছ ঝিল্লী আবরণ তৈরী করে এবং কখনও কখনও রক্তক্ষরণের কারণ ঘটায়। খ. মাছের শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। মাছ অস্থিরতার সাথে লাফালাফি করে এবং মারা যায়।	ক. ২৫০ পিপিএম ফরমালিন দ্রবনে মাছকে গোসল দেয়া।	ক. এই পরজীবিগুলো সম্পুর্ণ অপসারণ সম্ভব না হলেও অনুকূল ব্যবস্থাপনায় পরজীবির সংখ্যা কমিয়ে আনলে সাময়িক উপশম পাওয়া যেতে পারে।
১৪	গাইরো-ডিক্টাইলোসিস	মৃগেল, শোল, টাকি ও মাগুর জাতীয় মাছ	ক. এই পরজীবিগুলো মাছের দেহের ত্বকের ওপর বসে দেহরস শোষণ করে এবং চামড়ার উপরে ক্ষতের সৃষ্টি করে। মাছ কোন শক্ত বস্তুর সংস্পর্শে এলে গা ঘষে। খ. মাছের দেহে অবসন্নতা দেখা দেয়, এলোমেলো সাতরাতে থাকে এবং লাফালাফি করে। গ. মাছ খাবার খেতে অনীহা প্রকাশ করে।	ক. ২৫০ পিপিএম ফরমালিন দ্রবনে মাছকে গোসল দেয়া।	ক. এই পরজীবিগুলো সম্পুর্ণ অপসারণ সম্ভব না হলেও অনুকূল ব্যবস্থাপনায় পরজীবির সংখ্যা কমিয়ে আনলে সাময়িক উপশম পাওয়া যেতে পারে।
১৫	ভিটামিনের অভাব এবং অপুষ্টি রোগ	চাষযোগ্য যে কোন মাছ	ক. চার্বিতে দ্রবনীয় ভিটামিন 'এ, 'ডি এবং 'কে এর অভাবজনিত কারণে মাছের অন্ধত্ব এবং হাড় বাঁকা রোগ দেখা দেয়। খ. ভিটামিন বি এর অভাবে মাছের ক্ষুধামন্দা, স্নায়ু দুর্বলতা, রক্ত শুন্যতা এবং ত্বক ও ফুলকার ওপর ক্ষতের সৃষ্টি হতে পারে। গ. এছাড়া মাছের খাবারে হজমযোগ্য আমিষের অভাবে মাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যহত করে। এতে মাছ নিপিড়ীত বোধ করে এবং অচিরেই রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে।	ক. পুকুরে উদ্ভিজ ও প্রাণিজ কণাসহ প্রাকৃতিক খাবারের পর্যাপ্ত উৎপাদন নিশ্চিত করুন।	ক. ভিটামিনযুক্ত সুষম খাবার প্রয়োগ করুন।

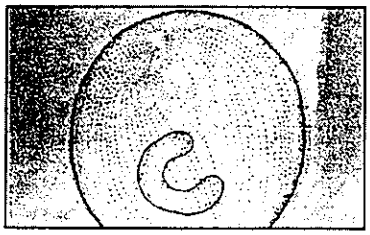

ইকথায়োপথিরিয়াস

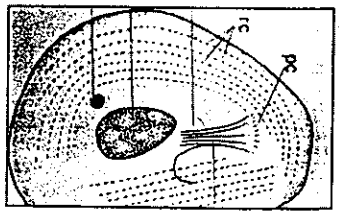

কাইলোডোনেলা

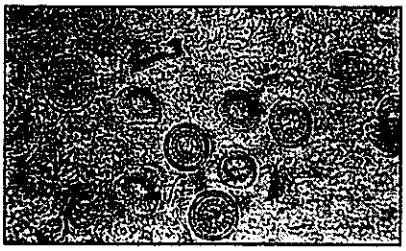

ট্রাইকোডিনিয়া

মিক্সোবোলাস

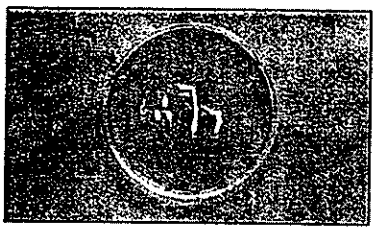

বিভিন্ন ধরনের কৃমি

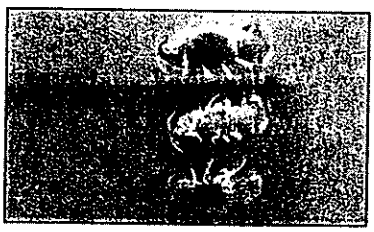

আরগুলাস

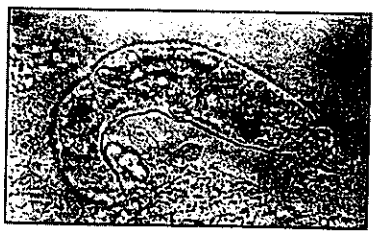

গাইরোড্যাকটাইলাস

ড্যাকটাইলোগাইরাস

চিত্র ঃ ১৪০ মাছের রোগের জন্য দায়ী বিভিন্ন পরজীবি (অনুবিক্ষনিক)

একাদশ অধ্যায়

প্রযুক্তি প্যাকেজ ও হস্তান্তর

দক্ষ জনশক্তির দ্বারা সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে যে কোন সেক্টরের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। উদ্ভাবিত মৎস্য চাষ প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে দেশে বিদ্যমান বিস্তীর্ণ জলাভূমিতে মৎস্য উৎপাদন বাড়ানো যেতে পারে। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন দেশের বেকার যুবক, মৎস্য চাষী ও উদ্যোক্তাদের মাছ চাষে উদ্বুদ্ধকরণ এবং তাদের প্যাকেজ প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত করা।

মৎস্য অধিদপ্তর ও মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট মাঠ পর্যায়ে ব্যবহারিক গবেষণার মাধ্যমে প্রযুক্তি প্যাকেজ উদ্ভাবন করে তা চাষী বা উদ্যোক্তার কাছে হস্তান্তর করছে। যুব অধিদপ্তর বেকার যুবকদের মৎস্য চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। কিছু কিছু বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) এ বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে কাজ করে যাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে মৎস্য চাষীরাও নিজেদের প্রয়োজনে লাগসই এবং উন্নততর প্রযুক্তি উদ্ভাবন করছেন।

মৎস্য অধিদপ্তর প্রযুক্তি প্যাকেজ হস্তান্তরে বিভিন্ন ধরণের পদ্ধতি ব্যবহার করছে, এগুলি হচ্ছে

১। গণমাধ্যম ঃ যেমন - টেলিভিশন, বেতার, খবরের কাগজ, প্যাকেজ প্রযুক্তি পুস্তিকা, পোষ্টার, লিফলেট ইত্যাদি
২। দলীয় সম্প্রসারণ কর্মকান্ড ঃ যেমন - প্রশিক্ষণ, ফলাফল প্রদর্শন, কার্যসম্পাদন প্রক্রিয়া প্রদর্শন ইত্যাদি
৩। একক সম্প্রসারণ কার্য্যক্রম ঃ যেমন - প্রদর্শনী ও খামার পরিদর্শন ইত্যাদি।

হস্তান্তর যোগ্য প্রযুক্তি প্যাকেজ

দেশে বিদ্যমান ও সম্ভাবনাময় জলসম্পদকে ফলপ্রসুভাবে ব্যবহার করে টেকসই ভিত্তিতে উৎপাদন বাড়ানোর জন্য মৎস্য অধিদপ্তর ও মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট ২৩টি প্রযুক্তি প্যাকেজ উদ্ভাবন করেছে। যা ইতোমধ্যে পরীক্ষিত, পরিবেশ বান্ধব লাগসই এবং আর্থিকভাবে লাভজনক হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরের নিয়মিত কর্মসূচী এবং বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে এসব প্যাকেজ প্রযুক্তি হস্তান্তরের কার্যক্রম চলছে। এই প্যাকেজ প্রযুক্তিসমূহ হচ্ছে -

কার্প (রুই) জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ, কার্প হ্যাচারি নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা, কার্প ও গলদা চিংড়ির মিশ্রচাষ, কার্প (রুই) জাতীয় মাছের পোনা প্রতিপালন, রুই জাতীয় মাছের পোনা পরিবহণ, গলদা চিংড়ির হ্যাচারি ব্যবস্থাপনা, গলদা চিংড়ির পোনা প্রতিপালন, গলদা চিংড়ির চাষ ব্যবস্থাপনা, চিংড়ি পোনা পরিবহণ, বাগদা চিংড়ির হ্যাচারি ব্যবস্থাপনা, বাগদা চিংড়ির চাষ ব্যবস্থাপনা, রাজপুঁটি মাছের চাষ, নাইলোটিকার চাষ, হাইব্রিড মাগুর মাছের চাষ, সমন্বিত মাছ চাষ, পাংগাস মাছের চাষ ও হ্যাচারি ব্যবস্থাপনা, খাঁচায় মাছ চাষ, ধানক্ষেতে মাছ চাষ, পেনে মাছ চাষ, ক্ষুদ্র প্লাবনভূমির উন্নয়ন ও চাষ ভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা, বাওড় মৎস্য ব্যবস্থাপনা, মৎস্য খাদ্য উৎপাদন, পিটুইটারী গ্রন্থি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি।

মৎস্য চাষী ও উদ্যোক্তাগণ যাতে তাদের পছন্দমত লাগসই প্রযুক্তি বাছাই করে পুঁজি বিনিয়োগ করতে পারেন, সে উদ্দেশ্যে উদ্ভাবিত প্রতিটি প্রযুক্তি প্যাকেজের সংক্ষিপ্ত বর্ণনাসহ প্রয়োগের উপযুক্ত ক্ষেত্রসমূহ বর্ণনা করা হলো।

প্যাকেজ বিবরণ	প্রয়োগক্ষেত্র
(১) কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ ঃ দেশীয় মাছের মধ্যে রুই, কাতলা, মৃগেল এবং বিদেশী মাছের মধ্যে সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প, কার্পিও, থাই সরপুঁটি ইত্যাদি কার্প জাতীয় মাছ মিশ্রচাষের জন্য সাধারণত নির্বাচন করা হয়। এই ৭টি প্রজাতি এক সাথে অথবা কমিয়ে ৬, ৫, ৪ বা ৩ টি প্রজাতির মাছ মিশ্রচাষের জন্য নির্বাচন করা যায়। নিয়মিত পুকুরে সার প্রয়োগ করে প্রাকৃতিক খাবারের উৎপাদন নিশ্চিত করতে হয়। সেই সাথে বাহির থেকে সম্পূরক খাবার প্রয়োগ করলে উৎপাদন আরও বেড়ে যায়। এ পদ্ধতিতে বছরে হেক্টর প্রতি ৫-৭ টন মাছ উৎপাদন সম্ভব ।	উপকূলীয় আধা-লবণাক্ত পানির এলাকা ব্যতীত দেশের সর্বত্রই কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ করা সম্ভব। তাই দেশে বিদ্যমান পুকুরের মধ্যে যেগুলোর আয়তন ০.১৩ হেক্টর (৩০ শতাংশ) বা তদুর্ধ এবং পানি ধারণ ক্ষমতা ভাল (পানির গভীরতা কমপক্ষে ২ মিটার) সেগুলোই মিশ্রচাষের উপযোগী। বাণিজ্যিকভাবেও এ প্যাকেজ প্রয়োগ করা যায়। 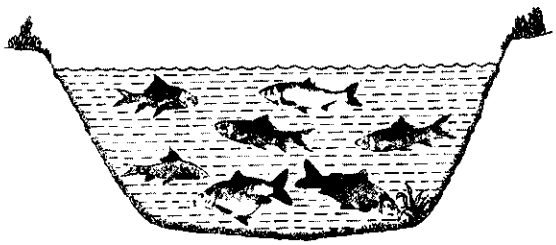 **চিত্র ঃ ১৪১** কার্প জাতীয় মাছ পুকুরের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে থাকে
(২) কার্প হ্যাচারি নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা ঃ মাছ চাষের সফলতা নির্ভর করে রেণু পোনার চাহিদামত সরবরাহের উপর। রুই জাতীয় মাছ পুকুরে বা বদ্ধজলাশয়ে ডিম ছাড়ে না। প্রজননের জন্য প্রস্তুত স্ত্রী ও পুরুষ মাছকে হ্যাচারিতে এনে পিজি বা এইচ সি জি হরমোন ইনজেকশনের মাধ্যমে প্রজননের জন্য প্রণোদিত করা হয়। মাছের ডিম থেকে হ্যাচারিতে প্রাপ্ত রেণু প্রতিপালনের পর বিক্রি করে দেয়া হয়। এক হেক্টর বিশিষ্ট খামারের ০.১৩ হেক্টরে হ্যাচারি স্থাপন করে প্রায় ১৫০ কেজি রেণু উৎপাদন করা সম্ভব।	দেশে মাছ চাষ যত প্রসার লাভ করছে, রেণুর চাহিদা তত বাড়ছে। তাই এ সময় হ্যাচারি স্থাপনে পুঁজি বিনিয়োগকে একটি লাভজনক ব্যবসা হিসেবে নেয়া যায়। উপজেলা পর্যায়ে হ্যাচারি নির্মাণ করে ঐ এলাকার চাহিদা মেটানো সম্ভব । **চিত্র ঃ ১৪২** কার্প হ্যাচারি

প্যাকেজ বিবরণ	প্রয়োগক্ষেত্র
(৩) কার্প ও গলদা চিংড়ির মিশ্রচাষ ঃ কার্প জাতীয় মাছের সাথে গলদা চিংড়ির মিশ্রচাষ করা সম্ভব । মাছের খাদ্যাভ্যাস ও বাসস্থান বিবেচনায় এনে মিশ্রচাষের প্রজাতি নির্বাচন করতে হয়। গলদা চিংড়ি যেহেতু নীচের স্তরে থাকে তাই এর সাথে উপরের ও মাঝের স্তরের মাছ যেমন ঃ কাতলা, সিলভার, রুই, মজুদ করা যায়। চার হেক্টর বিশিষ্ট একটি গলদার খামারে অবকাঠামো স্থাপনের পর অবশিষ্ট তিন হেক্টর চাষ এলাকা হতে বছরে ১.৫-২.৫ টন গলদা চিংড়ি ও ১৫-১৮ টন কার্প মাছ উৎপাদন সম্ভব।	বাংলাদেশের সব এলাকায় কার্পের সাথে গলদার চাষ করা যেতে পারে। বাঁধদেয়া নীচু ধানক্ষেত, অগভীর পুকুর, বাওড়ের অগভীর অংশ, রাস্তা বা রেল লাইনের পাশের খাল, সেচ খাল ইত্যাদি স্বাদু পানির জলাশয়ে কার্প ও গলদা চিংড়ির মিশ্রচাষ করা যায়। কার্প এর জন্য নির্মিত খামারে একই সংগে পুকুরে কার্প ও গলদার চাষ করা যায়। কার্প ও গলদা মিশ্রচাষের জন্য পুকুরের গভীরতা ১.০-১.৫ মিটার হওয়া উচিত। 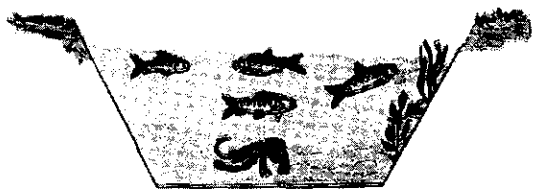 **চিত্র ঃ ১৪৩** গলদা চিংড়ি পুকুরের নিচের স্তরে থাকে
(৪) কার্প (রুই) জাতীয় মাছের পোনা প্রতিপালন ঃ দেশে মাছ চাষ প্রসারের সাথে সাথে এবং বৃহদায়তনের জলাশয়গুলোতে মৎস্যচাষ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পোনা মজুদ কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ায় পোনার চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। রেণু প্রতিপালন করে বড় পোনা উৎপাদন একটি লাভজনক কার্যক্রম। বিভিন্ন আকারের রুই জাতীয় পোনা পালনের জন্য বিভিন্ন ধরনের পুকুরের প্রয়োজন হয় ঃ • নার্সারি বা আঁতুড় পুকুর ঃ রেণু (৪.৫-৯.০ মি.মি.) ছেড়ে ধানী (৫ সে. মি. পর্যন্ত) পর্যন্ত বড় করা হয়। • লালন বা চারা পুকুর ঃ ধানী থেকে চারা পোনা বা ফিংগারালিং (১০-১৫ সেঃ মিঃ) পর্যন্ত বড় করা হয়।	সাধারণত ৫-৪০ শতাংশের (২৪৭ শতাংশ = ১ হেক্টর) পুকুর আঁতুড় পুকুর হিসাবে নির্বাচন করা ভাল। পুকুর বড় হলে বা গভীরতা বেশী হলে পানির চাপ বেশী থাকে, যা রেণু বা পোনা সহ্য করতে পারে না এবং এদের মারা যাবার সম্ভাবনা থাকে। আঁতড় পুকুরের গভীরতা ১.০-১.৫ মিটার হওয়া শ্রেয়। ধানক্ষেতের আইল উঁচু করে ধানের সাথে অথবা ক্ষেত্র বিশেষে ধান রোপন ছাড়াও ধানের জমিতে পোনার চাষ করা যায়। বড় জলাশয়ে (বদ্ধ বা উন্মুক্ত) যেখানে স্রোত কম থাকে সেখানে বড় আকারের হাপায় পোনার চাষ করা যেতে পারে। মাছ চাষের চেয়েও পোনার চাষে অতিঅল্প সময়ে অনেক বেশী লাভ করা যায়।

প্যাকেজ বিবরণ	প্রয়োগক্ষেত্র
(৫) রুই জাতীয় মাছের পোনা পরিবহণ ঃ দেশে সুষ্ঠু ও নির্ভরশীল পোনা পরিবহণ ব্যবস্থা নাই। এর ফলে পরিবহণকালে অনেক সময় উল্লেখযোগ্য হারে এমনকি পুরো লটের পোনাই মারা যায়। তাছাড়া পরিবহণকৃত পোনা পুকুরে মজুদ করার পর এর মৃত্যুহার অত্যন্ত বেশী হয়। ফলে মাছ চাষীরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে মাছ চাষের উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। বর্তমানে বড় আকারের পোনার নিরাপদ পরিবহণ অত্যন্ত গুরুত্ব পাচ্ছে। পরিবহণকালে পোনার মৃত্যু কেন হয়, অল্প দূরত্বে বা বেশী দূরত্বে পোনা পরিবহণ কিভাবে করা যায় ইত্যাদি বিষয়গুলি এ প্যাকেজের প্রধান বিষয়বস্তু।	যে স্থানে বা এলাকায় পোনা উৎপন্ন হয় সে সব জায়গা থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পোনা পরিবহণের সুযোগ আছে। পলি ব্যাগ, তাপ-কুপরিবাহী ট্যাংক ইত্যাদি পদ্ধতিতে পোনা পরিবহণ করা যায়। 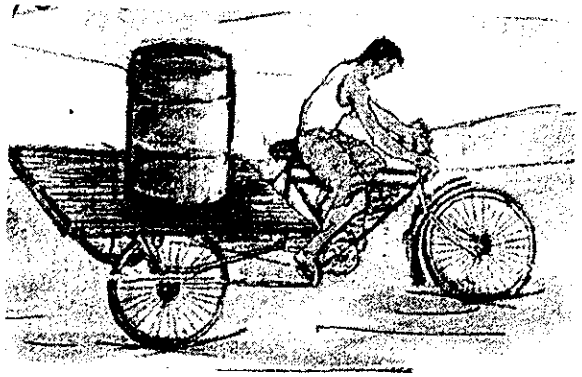 **চিত্র ঃ ১৪৪ (ক)** রিক্সাভ্যানে ড্রামে পোনা পরিবহণ 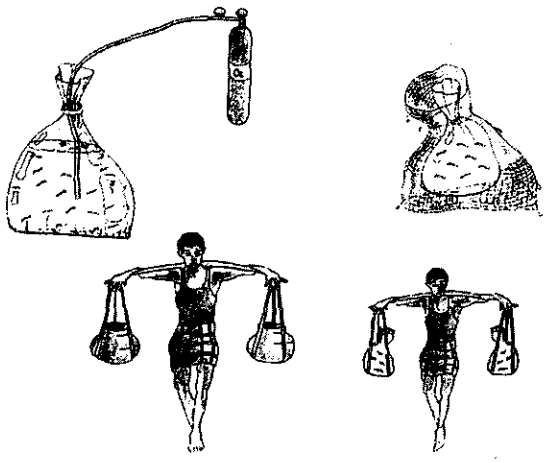 **চিত্র ঃ ১৪৪ (খ)** পোনা পরিবহণ

প্যাকেজ বিবরণ	প্রয়োগক্ষেত্র
(৬) গলদা চিংড়ির হ্যাচারি ব্যবস্থাপনা ঃ সারাদেশে বিদ্যমান প্রায় ১৫ লক্ষ পুকুর দিঘিতে, ধানক্ষেতে গলদা চিংড়ির চাষ সম্ভব, কিন্তু গলদা চিংড়ির পোনার সরবরাহ চাহিদার তুলনায় খুবই নগন্য। গলদা চিংড়ির পোনার ব্যাপক এই চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজন গলদা চিংড়ির হ্যাচারি স্থাপন। এই প্যাকেজে গলদা হ্যাচারির অবকাঠামোগত বিভিন্ন অংঙ্গ যেমন- ডিম ওয়ালা চিংড়ি পালন ট্যাংক, লার্ভা হ্যাচিং ট্যাংক, লার্ভা পালন ট্যাংক, আর্টিমিয়া হ্যাচিং ট্যাংক, পানি মজুদ ও পরিশোধন ট্যাংক, মিশ্রণ ট্যাংক, ফিলটার, পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশন সুবিধা, পাম্প, বাতাস সরবরাহ ব্যবস্থা, জেনারেটর ইত্যাদি নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রযুক্তি বর্ণনা করা হয়েছে।	গলদা হ্যাচারিতে ১০-১৫ পিপিটি লবণাক্ত পানির প্রয়োজন হয়। এ জন্যে সমুদ্র তীরবর্তী স্থানে হ্যাচারি স্থাপন সুবিধাজনক। তবে দেশের অভ্যন্তরেও হ্যাচারি নির্মাণ করা যায়। তবে এক্ষেত্রে লবণ চাষের মাঠ থেকে ২০০ পিপিটি লবণাক্ত পানি সংগ্রহ পূর্বক মজুদ রাখা হয়। ব্যবহারের সময় স্বাদুপানি মিশিয়ে ১০-১৫ পিপিটি করে পুনঃসঞ্চালন পদ্ধতিতে বার বার ব্যবহারের মাধ্যমে হ্যাচারি পরিচালনা করা হয়। গলদা হ্যাচারী দেশের সর্বত্রই স্থাপন করা যায়। 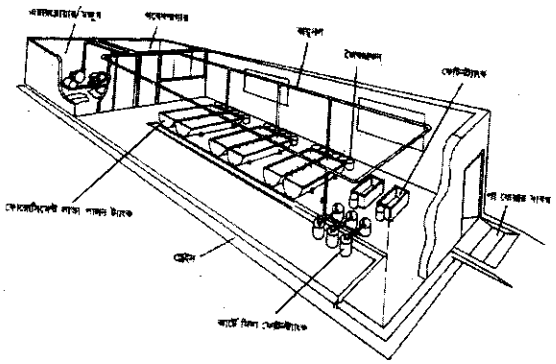 **চিত্র ঃ ১৪৫** গলদা চিংড়ি হ্যাচারির নকশা
(৭) গলদা চিংড়ির পোনা প্রতিপালন ঃ অনেক চিংড়ি চাষীই হ্যাচারি থেকে পি এল (পোনা) কিনে এনে সরাসরি মজুদ পুকুরে ছেড়ে দেন। এতে করে পোনার মৃত্যুর হার বেশী হয়। উচ্চমূল্য দিয়ে ক্রয় করা এসব পোনা মারা যাওয়ায় চাষী উৎপাদন ভাল পান না এবং ক্ষতির সম্মুখীন হন। পোনাকে যত্নসহকারে প্রতিপালন করে পুকুরে ছাড়া উপযোগী করে বড় করা হয়। এটি একটি লাভজনক ব্যবসা হতে পারে।	বাংলাদেশের যে কোন অঞ্চলেই বিদ্যমান মিঠা পানিতে গলদা চিংড়ির পোনা প্রতিপালনের জন্য নার্সারি স্থাপন সম্ভব। • পুকুরের আয়তন ঃ ০.১৩ -০.২৭ হেক্টর • পুকুরের গভীরতা ঃ ৭০ - ৮০ সে. মি. • মাটির ধরণ ঃ এটেল মাটি, এটেল দোঁআশ বা বেলে দোঁআশ। পুকুরের তলদেশ সমতল হওয়া উচিত।

প্যাকেজ বিবরণ	প্রয়োগক্ষেত্র
(৮) গলদা চিংড়ির চাষ ব্যবস্থাপনা ঃ গলদা চিংড়ি অত্যন্ত সুস্বাদু ও মূল্যবান। গলদা চিংড়ির রপ্তানীকারক দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম সারিতে। দেশের সর্বত্রই গলদা চাষ করা যায়। এ প্যাকেজে পুকুরে প্রধানত: গলদা চাষ প্রদ্ধতি অনুসরণ করে তার সঙ্গে কিছু কার্প রাখা হয় পানির গুণাগুণের ভারসাম্য রক্ষার জন্য। এককভাবে গলদার চাষ করলে বছরে হেক্টর প্রতি ১০০০-১৫০০ কেজি উৎপাদন করা সম্ভব।	বাঁধদেয়া নীচু ধানক্ষেত, অগভীর পুকুর, বাওড়ের অগভীর অংশ, রাস্তা বা রেল লাইনের পাশের খাল, সেচ খাল ইত্যাদি স্বাদু পানির জলাশয়ে এবং খামার স্থাপনের মাধ্যমে গলদা চিংড়ির একক চাষ করা যেতে পারে।
(৯) চিংড়ি পোনা পরিবহণ ঃ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এলাকাভিত্তিক হ্যাচারি ও পোনা উৎপাদন শিল্প গড়ে উঠেছে। সেসব জায়গা থেকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সনাতন পদ্ধতিতে চিংড়ির পোনা পরিবহণ করা হয়ে থাকে। সুষ্ঠু নির্ভরশীল পরিবহণ পদ্ধতির অভাবে পরিবহণকালে এবং পরিবহণকৃত পোনা পুকুরে মজুদ করার পর মৃত্যুহার অত্যন্ত বেশী হয়। ফলে, চিংড়ি চাষীরা চাষের উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। তাই, বিজ্ঞানসম্মত ভাবে দেশে পোনা পরিবহনের নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি এ প্রযুক্তি প্যাকেজে বর্ণিত হয়েছে।	ফাইবার গ্লাস মেটেরিয়াল এর সাহায্যে ট্যাংক তৈরী করে পোনা পরিবহণ সুবিধাজনক। ব্যাটারিচালিত এয়ারেটর বা প্রেসার ট্যাংক হতে ট্যাংকে অক্সিজেন দেয়া যেতে পারে। পলিথিন ব্যাগে অক্সিজেন সরবরাহ সাপেক্ষে লিটার প্রতি ৫০০টি হারে পোনা পরিবহণ করা যায়। একটি ৬০×৪০ সেঃ মিঃ ব্যাগে ৬-৮ লিটার পানিতে ৩০০০-৪০০০টি ১০-১৫ দিনের পোনা ১২ ঘন্টা পর্যন্ত নিরাপদে পরিবহণ করা যায়।
(১০) বাগদা চিংড়ির হ্যাচারি ব্যবস্থাপনা ঃ দেশে বর্তমানে ৪৩টি হ্যাচারি আছে। প্রয়োজন মেটানোর জন্য বর্তমানে প্রকৃতি থেকে বাগদা চিংড়ির পোনা ধরা হয়। হ্যাচারি নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা এ দেশে নতুন প্রযুক্তি এবং ব্যয়সাপেক্ষ। হ্যাচারি পরিচালনার জন্য প্রয়োজন দক্ষ জনশক্তি। এই সব বিষয় নিশ্চিত হয়ে হ্যাচারি নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত।	উপকূলীয় এলাকা যেখানে ২৮-৩৪ পিপিটি লবণাক্ততা - সহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য গুণাগুণ সম্পন্ন সামুদ্রিক পানির এবং স্বাদু পানির সরবরাহ রয়েছে, এ ধরনের দূষণমুক্ত এলাকায় হ্যাচারি স্থাপন করা যায়। তবে হ্যাচারির স্থান যেন হ্যাচারির নকশার সাথে সর্ম্পকিত হয় সে বিষয়টির দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার।
(১১) বাগদা চিংড়ির চাষ ব্যবস্থাপনা ঃ বাগদা সামুদ্রিক লোনা পানির চিংড়ি। এ চিংড়ির রপ্তানী বাজার ব্যাপক। বাগদা দ্রুতবর্ধনশীল, ৫-৬ মাস চাষ করে বাজারজাত করা যায়। এরা সর্বভূক, তাই খাদ্য যোগান ও উৎপাদন সহজ। বর্তমানে বাংলাদেশে বাগদা চিংড়ি চাষের তিনটি পদ্ধতি চালু আছে ঃ ১। সনাতনী চাষ পদ্ধতি (Extensive) ঃ পুকুরের আয়তন ৫০ হেক্টরের কম। হেক্টরে ১০-১৫ হাজার পোনা মজুদ করা হয় এবং ২০০-২৫০ কেজি চিংড়ি উৎপাদিত হয়। ২। উন্নত সনাতনী চাষ পদ্ধতি (Improved Extensive) ঃ পুকুরের আয়তন ৪ হেক্টরের কম। হেক্টরে পোনা মজুদের পরিমাণ ৩০-৪০ হাজার এবং উৎপাদন ৪০০-৫০০ কেজি। ৩। আধানিবিড় চাষ পদ্ধতি ঃ পুকুরের আয়তন ০.৫-১.০ হেক্টর। হেক্টরে পোনা মজুদের পরিমাণ ২-৩ লক্ষ এবং হেক্টরে ২-২.৫ টন চিংড়ি উৎপাদিত হয়।	বাগদা চিংড়ি চাষের জন্য ৮-২৫ পিপিটি লবণাক্ত পানির প্রয়োজন। সুতরাং সমুদ্র উপকূলবর্তী স্থানেই কেবল এর চাষ সম্ভব। চিংড়ি চাষের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উপযুক্ত স্থান নির্বাচনে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি লক্ষ্যণীয় ঃ দূষণমুক্ত এলাকা, প্লাবন ও অতিবৃষ্টিজনিত ঢলমুক্ত এলাকা, পানির উৎস, চাষ জমির উচ্চতা, মাটি ও পানির গুণাগুণ, বিদ্যুৎ সরবরাহ, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা দক্ষজনশক্তি ইত্যাদি।

প্যাকেজ বিবরণ	প্রয়োগক্ষেত্র
আধানিবিড় চাষ পদ্ধতির সম্প্রসারণ ঘটিয়ে চিংড়ির উৎপাদন কয়েকগুণ বাড়ানো সম্ভব। তবে এ পদ্ধতি বাস্তবায়ন করতে অভিজ্ঞ জনবল প্রয়োজন।	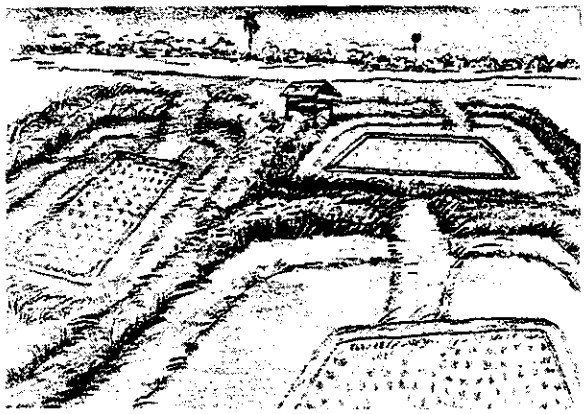 **চিত্র ঃ ১৪৬** বাগদা চিংড়ির ঘের
(১২) রাজপুঁটি মাছের চাষ ঃ এ মাছটি ১৯৭৭ সালে থাইল্যান্ড হতে বাংলাদেশে আমদানী করা হয়। মাছটি থাই সরপুঁটি/রাজপুঁটি নামেও পরিচিত। এরা দ্রুতবর্ধনশীল, সর্বভূক, রোগ বালাই তুলনামূলকভাবে কম, চাষ পদ্ধতি অনেক সহজ, কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে এর রেণু উৎপাদন প্রক্রিয়া অতি সহজ এবং চাষের জন্য প্রয়োজনীয় পোনার সরবরাহ থাকায় এর চাষ দ্রুত প্রসার লাভ করছে। মাছটি খেতে সুস্বাদু এবং দ্রুত বর্ধনশীল। ৪-৬ মাসের মধ্যে এরা ২০০-২৫০ গ্রাম পর্যন্ত হতে পারে।	মাছ চাষের উপযোগী ছোট বড় যে কোন স্বাদু পানির জলাশয়ে সরপুঁটি মাছের চাষ করা যায়। দ্রুত বর্ধনশীল বিধায় মৌসুমী পুকুর এবং ধানক্ষেতে চাষের জন্য এ মাছ অত্যন্ত উপযোগী। কম অক্সিজেনযুক্ত ও অধিক তাপমাত্রার পানিতে এরা বাচঁতে পারে। স্বল্পগভীর ও ঘোলা পানিতেও এ মাছের চাষ সম্ভব। 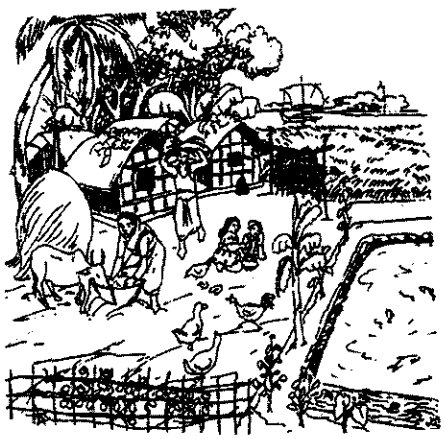 **চিত্র ঃ ১৪৭** বাড়ীর পাশে মৌসুমী পুকুর

প্যাকেজ বিবরণ	প্রয়োগক্ষেত্র
(১৩) নাইলোটিকার চাষ ঃ বাংলাদেশে ১৯৭৪ সালে থাইল্যান্ড থেকে এ মাছটি আনা হয়। নাইলোটিকা খেতে সুস্বাদু এবং বাজারে এর চাহিদা রয়েছে। মাছটি দ্রুত বর্ধণশীল ও উচ্চ ফলনশীল। এরা সর্বভূক মাছ। এদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশী এবং বেশ শক্ত অর্থ্যৎ বিরুপ পরিবেশেও টিকে থাকতে পারে। ৪-৫ মাসে এরা ২০০-২৫০ গ্রাম হয়। কম খরচে ও সহজ ব্যবস্থপনায় এদের চাষ করা যায়। সম্পূরক খাদ্য হিসাবে চালের গুড়া ও সরিষার খৈল প্রয়োগ করে হেক্টরে ৪.০-৫.০ টন মাছ উৎপাদন করা যায়। বর্তমানে গিফট জাতের তেলাপিয়ার চাষ বেশ লাভজনক। এ জাতের তেলাপিয়া নাইলোটিকার চেয়েও দ্রুত বর্ধনশীল।	এ মাছের চাষের জন্য অল্প গভীরতার পুকুর উপযোগী। ছোট গর্ত, ডোবা, নালা, খাদ, পুকুর, ধানক্ষেত, পেন, এবং খাচাঁয় নাইলোটিকা চাষ করা যেতে পারে। খামার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেও এ ক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগ লাভজনক।
(১৪) হাইব্রিড মাগুরের চাষ ঃ দেশীয় স্ত্রী মাগুরের সাথে আফ্রিকান পুরুষ মাগুরের প্রজনন ঘটিয়ে হাইব্রিড মাগুর উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ মাগুর দেশী মাগুরের মত দেখতে এবং সুস্বাদু, কিন্তু দেশীয় মাগুরের চেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল। মাত্র ৩ মাসে ২০০-২৫০ গ্রাম ওজন হয়। এদের বৃদ্ধির হার দেশীয় মাগুরের ৪ গুণ।	ছোট বড় যে কোন ধরনের জলাশয়েই হাইব্রিড মাগুরের চাষ করা যায়। তবে ১০০ -১০০০ বর্গমিটার আয়তনের এবং ১..৫ মিটার গভীর পুকুর এর চাষ উপযোগী। খাঁচাতেও এর চাষ করা যায়।
(১৫) সমন্বিত মাছ চাষ ঃ মৎস্য চাষকে প্রাধান্য দিয়ে এর সাথে সমন্বয়ের মাধমে খামারের পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রেখে অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্য বা পশুসম্পদের উৎপাদন ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করাকে সমন্বিত মাছ চাষ বলা হয়। যেমন - মাছ ও মুরগির (ব্রয়লার/লেয়ার) সমন্বিত চাষ, মাছ ও হাঁসের সমন্বিত চাষ, মাছ ও গরুর সমন্বিত চাষ, মাছ ও ছাগলের সমন্বিত চাষ, মাছের সাথে ফলমূল ও সবজির সমন্বিত চাষ, মাছ, মুরগি, ফলমূল ও শাকসবজির সমন্বিত চাষ ইত্যাদি। সমন্বিত মাছ চাষের কতিপয় সুবিধা ১। জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে অধিক মুনাফা অর্জন। ২। একটি ফসল অপর ফসলের সহায়ক হিসাবে কাজ করে ফলে উৎপাদন খরচ কম হয়। ৩। পুকুরের তলার অতিরিক্ত পচাঁমাটি খুবই উর্বর এবং এ পচাঁমাটি ফলমূল/সবজির উৎপাদন বাড়ায়। ৪। সমন্বিত মাছ চাষে গবাদিপশু ও পাখির উচ্ছিষ্ট ও পরিত্যাক্ত দ্রব্য মাছের খাবার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। দেখা গেছে, এ ধরণের কর্যক্রমের মাধ্যমে বছরে হেক্টর প্রতি ৫-৬ টন মাছ ছাড়াও অন্যান্য ফসল/প্রাণীর পণ্য বাড়তি আয়ের যোগান দেয়।	দেশে বিদ্যমান পুকুর, দিঘি, ঘের ও মাছ চাষের অন্যান্য জলাশয়ে সমন্বিত মাছ চাষ করা যেতে পারে। তবে নিরাপত্তার জন্য জলাশয়টি বাড়ির সংলগ্ন হওয়া প্রয়োজন বা পাহারার ব্যবস্থা রাখতে হবে। বড় ধরনের মৎস্য খামারে একাধিক ধরনের সমন্বয়ের মাধ্যমে মৎস্য চাষ সম্ভব। **চিত্র ঃ ১৪৮** মাছ ও মুরগির সমন্বিত চাষ

প্যাকেজ বিবরণ	প্রয়োগক্ষেত্র
(১৬) পাংগাস মাছের চাষ ও হ্যাচারি ব্যবস্থাপনা ঃ ১৯৯০ সালে প্রথম থাইল্যান্ড থেকে আমাদের দেশে থাই পাঙ্গাসের পোনা আনা হয়। ইদানিং এই মাছের চাষ বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করছে এবং বাজারে এর যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। আধানিবিঢ় পদ্ধতিতে চাষ করে প্রতি হেক্টরে ২০ টন পাঙ্গাস মাছ উৎপাদন করা যায়। রুই জাতীয় মাছের চেয়ে পাঙ্গাসের এ ফলন ৪-৫ গুণ বেশী। পাঙ্গাস চাষে কার্পের চেয়ে অনেক বেশী পুজিঁর প্রয়োজন। কারন এই মাছ চাষে ২৫-৩০% প্রাণিজ আমিষ সমৃদ্ধ সম্পূরক খাদ্য - দেহ ওজনের ৫-১০% হারে প্রতিদিন সরবরাহ করতে হয়। পাঙ্গাসের পোনার চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই, পাঙ্গাসের হ্যাচারি স্থাপন লাভজনক পুঁজি বিনিয়োগের অন্যতম ক্ষেত্র। উদ্যোক্তাগন শুধু পাঙ্গাস চাষ বা হ্যাচারি স্থাপন বা উভয় প্রকার প্রকল্প গ্রহণ করতে পারেন। ২ হেক্টর জমিতে পাংগাসের হ্যাচারি (পুকুরসহ) স্থাপন করে বছরে প্রায় ১০০ কেজি রেণু ও ৫-৭ সে. মি. আকারের ১০.০-১৫.০ লক্ষ পোনা উৎপাদন করা যাবে।	পাঙ্গাস মূলত নদীর মাছ। তবে আমাদের দেশে পুকুর, দিঘি বা অন্যান্য জলাশয় যেখানে সারা বৎসর পানি থাকে সেখানে পাঙ্গাস চাষ ভাল হয়। পাঙ্গাস চাষের জন্য পুকুরের আয়তন কমপক্ষে ০.১৩ হেক্টর (৩৩ শতাংশ) এবং গভীরতা ২ মিটার হওয়া ভাল। এ মাছ খাঁচায়ও চাষ করা যায়।
(১৭) খাঁচায় মাছ চাষ ঃ খাঁচায় মাছ চাষ বাংলাদেশের জন্য একটি নতুন প্রযুক্তি। খাঁচা দু'ধরনের হতে পারে, ভাসমান ও স্থির। স্থির খাঁচা জলাশয়ের অগভীর অংশে স্থাপন করা হয়। ভাসমান খাঁচা অগভীর ও গভীর উভয় ধরনের জলাশয়ে স্থাপন করা যায়। খাঁচা বর্গাকার বা আয়তাকার হতে পারে। খাঁচার আকার ১ ঘনমিটার থেকে ১২ ঘনমিটার হতে পারে। খাঁচার কাঠামো তৈরীর জন্য ৩ সুতি লোহার রড, পিভিসি পাইপ বা বাঁশ ব্যবহার করা হয়। ফ্রেম তৈরী হয়ে গেলে এর চারিদিকে পলিইথিলিন জাল দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়। খাঁচার উপরিভাগে একটি ঢাকনা থাকে, যা পোনা মজুদ, খাবার দেয়া ইত্যাদির জন্য কাজে লাগে। পুকুরে চাষ যোগ্য যে কোন মাছই খাচাঁয় চাষ করা যায়। যেমনঃ পাঙ্গাস, তেলাপিয়া, সরপুঁটি, গ্রাসকার্প ইত্যাদি। খাচাঁয় চাষের জন্য দ্রুত বর্ধনশীল মাছ নিবার্চন করা শ্রেয়।	নদী, প্লাবনভূমি, হাওর, বাওড়, বিল, ঝিল, সেচ প্রকল্পের খাল যেখানে বছরে কমপক্ষে ৪-৬ মাস নূন্যতম ১-১.৫ মিটার পানি থাকে, যেখানে পানির ঘোলাত্ব কম, স্রোত বা ঢেও কম এমন স্থানে মাছ চাষের জন্য খাচাঁ স্থাপন করা যায়। উপকূলবর্তী অঞ্চলেও খাচাঁ স্থাপন করে মাছ/চিংড়ি চাষ করা সম্ভব।
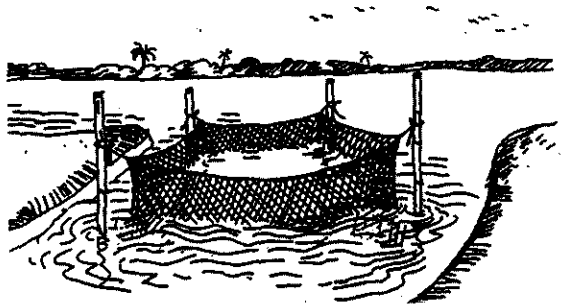 চিত্র ঃ ১৪৯ (ক) খাঁচায় মাছ চাষ	চিত্র ঃ ১৪৯ (খ) খাঁচায় মাছ চাষ

প্যাকেজ বিবরণ	প্রয়োগক্ষেত্র
(১৮) ধানক্ষেতে মাছ চাষঃ ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু জমি কমে আসছে। জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রতিটি মানুষকেই বাড়তি আয়ের দিকে নজর দিতে হচ্ছে। সে হিসেবে ধানক্ষেতে মাছ চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হওয়ায় একই জমি থেকে বাড়তি আয়ের এবং সেই সাথে পরিবারের পুষ্টি চাহিদা পূরনের পথও সুগম হয়েছে। এখন প্রয়োজন ব্যাপক সম্প্রসারণ কার্য্যক্রমের মাধ্যমে এ প্রযুক্তি কৃষকের কাছে পৌঁছে দেয়া। ধানক্ষেতে মাছ চাষের জন্য জমিতে কিছু মাটি কেটে গর্ত করতে হয়। আইল মজবুত ও উচু করতে হয়। যেন বর্ষাকালে এসব জমিতে বৃষ্টির পানি নিদিষ্ট সময় পর্যন্ত ধরে রেখে মাছ চাষ করা যায়। প্রয়োজনে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা থাকলে আরো ভাল হয়। কম অক্সিজেনে বাঁচতে পারে এবং দ্রুত বর্ধনশীল প্রজাতির মাছ যেমনঃ থাই সরপুঁটি, মিররকার্প, কার্পিও, তেলাপিয়া ইত্যাদি মাছ ধানক্ষেতে চাষের উপযোগী। ধান চাষের পর মাছ চাষ করলে ঐ জলাশয়ে রুই জাতীয় মাছের চাষ করা যায়।	শুধু ধানের সাথে নয় ধান উঠানোর পর অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে মাছ চাষ করা হয়। পোনা মাছের চাষও ধানের জমিতে সম্ভব। 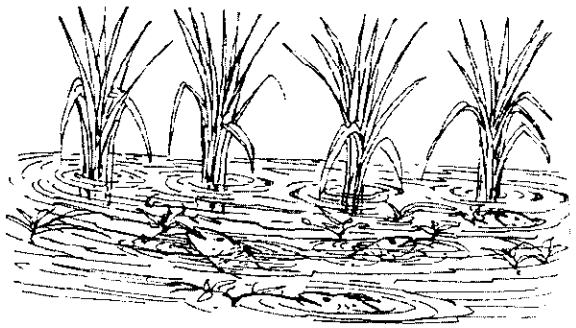 **চিত্র ঃ ১৫০** ধানক্ষেতে মাছ চাষ
(১৯) পেনে মাছ চাষ ঃ কোন উন্মুক্ত বা আবদ্ধ জলাশয়ের এক বা একাধিক দিক বাশঁ, বানা, বেড়া, জাল বা অন্য কোন উপকরণ দিয়ে ঘিরে উক্ত ঘেরের মধ্যে মাছ মজুদ করে চাষ করাকে পেন বা ঘেরে মাছ চাষ বলে। পেনে মাছ চাষের বৈশিষ্ট্য হলো পেনের ঘের বা বেড়া জলাশয়ের তলায় প্রোথিত থাকে এবং পেনের পানির সাথে বাইরের পানির সংযোগ বা প্রবাহ বিদ্যমান থাকে। পেন নির্মাণে বাঁশের বেড়া/বানা, খুঁটি, গীটবিহীন পলিথিন জাল, টায়ার কর্ডের জাল, জিআই তার ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন প্রজাতির মাছ যেমন রুই, কাতলা, মৃগেল সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প, সরপুঁটি, পাঙ্গাস, তেলাপিয়া ইত্যাদি পেনে চাষের উপযোগী। পেনে প্রতি হেক্টরে ৬ মাসে ২.০-৪.০ টন মাছ উৎপাদন করা সম্ভব। বর্তমানে এ পদ্ধতিতে মাছ চাষ প্রসার লাভ করছে।	দেশে বিদ্যমান সেচ খাল, বিল, প্লাবন ভূমি, হাওড়, বাওড়গুলোর কিছু অংশে যেখানে ৬-৮ মাস পানি থাকে সে সমস্ত জলাশয়ে বেড়া দিয়ে এ পদ্ধতিতে মাছ চাষ করা যায়। পেনে সমন্বিত ভাবে হাঁস, মুরগি ও মাছের চাষও করা যায়। 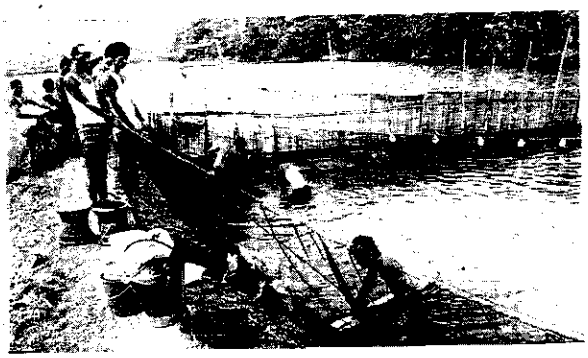 **চিত্র ঃ ১৫১** পেনে মাছ চাষ

প্যাকেজ বিবরণ	প্রয়োগক্ষেত্র
(২০) ক্ষুদ্র প্লাবন ভূমির উন্নয়ন ও চাষভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা ঃ বর্ষা মৌসুমে দেশের যে নিম্নাঞ্চল তলিয়ে যায় এবং ৬ মাসের মত পানিতে নিমজ্জিত থাকে তাকেই প্লাবনভূমি বলে। দেশের এক তৃতীয়াংশ নিম্নাঞ্চল প্লাবনভূমি। প্রতিবছর বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ঠ কারণে প্লাবনভূমিতে রুইজাতীয় মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। উন্নত প্রযুক্তিতে ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্লাবনভূমি থেকে প্রচুর মাছ উৎপাদন সম্ভব। বছরে হেক্টর প্রতি প্রায়১২০০ কেজি মাছ উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে।	দেশে প্রায় ১.১৪ লক্ষ হেক্টর বিল এবং প্রায় ৫৫০০ হেক্টর বাওড় আছে। এগুলোর মধ্যে যে সব জলাভূমিতে পোনা মজুদের মাধ্যমে মাছ চাষ সম্ভব সে সব জলাশয়ে সমাজভিত্তিক অথবা ব্যক্তি উদ্যোক্তার দ্বারা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এ কার্যক্রম গ্রহণ করা যায়।
(২১) বাওড় মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনাঃ দেশের পশ্চিমাঞ্চলের এসব বাওড় উন্নয়ন করে মাছ চাষ করা যেতে পারে। বাওড়ে বছরে হেক্টর প্রতি ১-১.৫ টন মাছ উৎপাদন করা যায়। বর্তমানে বাওড়ে সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মাছ চাষ করা হচ্ছে।	বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বৃহত্তম ফরিদপুর, যশোর এবং কুষ্টিয়া জেলায় ছোট বড় নানা আকারের বাওড় আছে। যার জলায়তন প্রায় ৫৪৮৮ হেক্টর। এ সমস্ত বাওড়ে মাছচাষ, সমন্বিত মৎস্যচাষ, খাচাঁয় মাছ চাষ, পেনে মাছ চাষ করা সম্ভব। ব্যক্তিমালিকানায় বা সমবায় ভিত্তিতে পুঁজি যোগার করে এ সমস্ত বাওড়ে বাড়তি মাছের উৎপাদনসহ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব।
(২২) মৎস খাদ্য উৎপাদন ঃ দেশে প্রচলিত চাষ পদ্ধতিতে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বর্তমানে প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি বাহির থেকে পুকুরে/জলাশয়ে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করা হচ্ছে। যেমন ঃ চালের কুড়া, গমের ভূসি, সরিষার খৈল, কোন কোন ক্ষেত্রে ফিসমিল ইত্যাদি। মাছের পুষ্টি চাহিদার ভিত্তিতে খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান আনুপাতিক হারে মিশিয়ে সুষম সম্পূরক খাবার প্রয়োগ করলে মাছের এ উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। বিভিন্ন উপাদানের মিশ্রণে এ খাদ্য উৎপাদন করা হয়। এ খাদ্য হতে পারে পাউডার বা দানাদার শুকনা পিলেট খাদ্য।	সাধারণ মাছ চাষী, মৎস্য খামার মালিক এবং আগ্রহী উদোক্তারা সুষম সম্পূরক মৎস্য খাদ্য তৈরিতে এগিয়ে আসতে পারেন। সাধারণ মাছ চাষী সুষম খাদ্য তৈরির যে কোন সূত্র অনুসরণ করে খাদ্য তৈরি করে পুকুরে সরবরাহ করতে পারেন। খামার মালিকগণ হস্তচালিত সেমাই মেশিনের মাধ্যমে পিলেট খাদ্য প্রস্তুত করতে পারেন। উদ্যোক্তাগণ মৎস্য খাদ্য কারখানা স্থাপনের জন্য পুঁজি বিনিয়োগ করতে পারেন। ক্রম বর্ধমান মৎস্য/চিংড়ি খাদ্যের চাহিদায় এটি একটি চমৎকার বিনিয়োগ হবে।
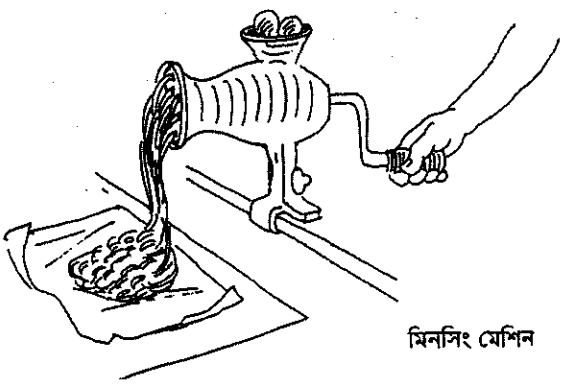 মিনসিং মেশিন **চিত্র ঃ ১৫২ (ক)** সেমাই মেশিনে (মিনসিং) মাছের খাদ্য তৈরী	 **চিত্র ঃ ১৫২ (খ)** মাছের খাদ্য তৈরীর কারখানা

প্যাকেজ বিবরণ	প্রয়োগক্ষেত্র
(২৩) পিটুইটারী গ্রন্থি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি ঃ দেশে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে প্রচুর মৎস্য হ্যাচারি স্থাপিত হয়েছে। এ সমস্ত হ্যাচারিতে মাছের কৃত্রিম প্রজননের জন্য প্রচুর পিটুইটারী গ্রন্থির প্রয়োজন হয়। পিটুইটারী গ্রন্থিকে সংক্ষেপে পিজি বলা হয়। মাছের মগজ থেকে পিটুইটারী গ্রন্থি সংগ্রহ করা হয়। এ হরমোনের সাহায্যে মাছের পরিপক্কতা এবং মাছের প্রজনন ক্রিয়া সম্ভব হয়। বর্তমানে বিদেশ থেকে পিজি আমদানী করে বহুলাংশে হ্যাচারিগুলির চাহিদা পূরণ করা হচ্ছে।	পিজি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষজনশক্তি তৈরি করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্ঠি করা যায়। এতে করে এ খাতে বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় রোধ হবে এবং হ্যাচারি মালিকগন অনেক কম দামে পিজি ক্রয় করতে পারবেন। এ বিষয়ে বাজারে মাছ বিক্রেতাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা যায়। তারা মাছ বিক্রির পূর্বেই মাছের মাথা থেকে শুধু পিজিটা সংগ্রহ করে তা বিক্রি করে বাড়তি আয় করতে পারেন। উদ্যোক্তাগণ এ বিষয়ে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পুঁজি বিনিয়োগ করতে পারেন।

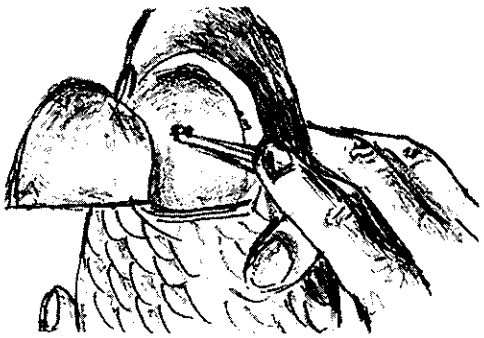

চিত্র ঃ ১৫৩ (খ) পিজি সংগ্রহ পদ্ধতি

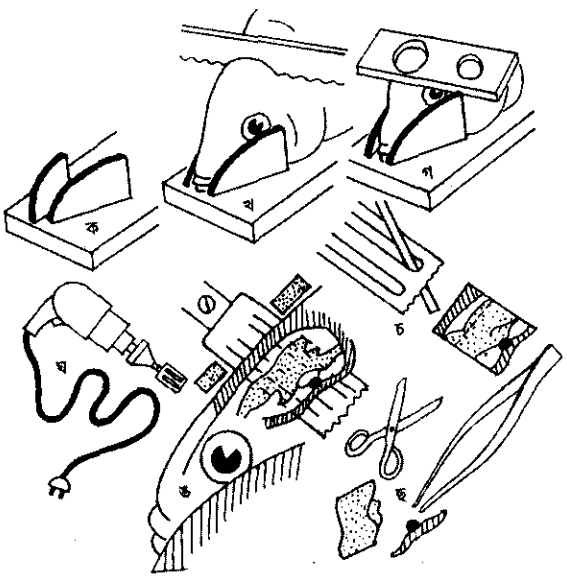

চিত্র ঃ ১৫৩ (ক) মাছের মাথা কেটে পিজি সংগ্রহ

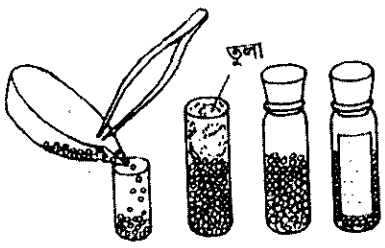

চিত্র ঃ ১৫৩ (গ) বোতলে সংরক্ষিত পিজি

দ্বাদশ অধ্যায়

মৎস্য প্রক্রিয়াজাত ও বাজারজাতকরণ

সুস্থভাবে বেঁচে থাকার লক্ষ্যে মান সম্পন্ন খাদ্যমান যুক্ত আমিষ সমৃদ্ধ মৎস্য পণ্য খাওয়া সকলের কাম্য। মাছ একটি দ্রুত পঁচনশীল আমিষ জাতীয় পণ্য। আমাদের দৈনন্দিন আমিষের চাহিদা মিটানোর লক্ষ্যে দেশের এক অঞ্চল হতে অন্য অঞ্চলে বাজারজাত করা এবং দেশের বাহিরে বিদেশে বাজারজাত করার জন্য মৎস্য পণ্যের মান ধরে রেখে ক্রেতাদের বা ভোক্তাদের সরবরাহ করাই হচ্ছে সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের উদ্দেশ্যে।
মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণে হলো এমন এক বা একাধিক পন্থা যা খাদ্যের পঁচন প্রতিরোধ করে ভোক্তাদের চাহিদা অনুসারে স্বল্প মেয়াদী বা দীর্ঘমেয়াদীভাবে সংরক্ষণ ও বাজারজাত করতে সহায়তা করে। মাছ আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকার অপরিহার্য অংশ। আমাদের জাতীয় জীবনে মৎস্য খাতের অবদান অনস্বীকার্য। প্রাণীজ আমিষের প্রায় ৬৩% যোগান দেয় মাছ। বাংলাদেশে বর্তমানে মাথাপিছু মোট মাছ ভক্ষণের পরিমাণ বছরে প্রায় ১২ কেজি। তবে দৈনন্দিন জীবনে মাছের প্রয়োজন প্রায় ১৮ কেজি।

স্বাধীনতা পূর্ব হতেই বাংলাদেশের মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানী হতো। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ - ৭৩ অর্থ বছরে মাছ হতে রপ্তানী আয়ের পরিমাণ ছিল ২.৩ কোটি টাকা। তবে বর্তমানে মৎস্য সম্পদ রপ্তানী হতে আয় দাড়িয়েছে প্রায় ২০০০ কোটি টাকা।
বর্তমানে বাংলাদেশের ১২৭টি হিমায়িত মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা এবং সারা দেশেই বেশ কিছু শুটকী ও লবণাক্ত মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা রয়েছে। উল্লেখিত ১২৭টি কারখানার মধ্যে মান সম্পন্ন লাইসেন্স প্রাপ্ত কারখানার সংখ্যা মাত্র ৫৫টি। বর্তমানে কারখানা সমূহের প্রতিষ্ঠানিক মানের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। ব্যবস্থাপনারও কিছুটা উন্নতি হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে আহরিত মাছের বা চিংড়ির গুণগত মান বজায় রাখার লক্ষ্যে সরকার চিংড়ি চাষ অঞ্চলে ২১টি সার্ভিস সেন্টার স্থাপন করেছে। এর মাধ্যমে কাঁচামাল প্রাথমিক পরিচর্যার পর কারখানায় প্রেরণ করা হলে কাঁচামালের মান আরো উন্নত হবে। বর্তমানে বিদেশে বাংলাদেশের উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। EU এবং USFDA এর চাহিদা অনুসারে হ্যাসাপ কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে পণ্যের মানের উন্নতি হয়েছে। এ ছাড়া সনাতন পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষের ফলে ক্রেতা দেশে বাংলাদেশের চিংড়ির চাহিদা উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজার

১৯৯২-৯৩ অর্থ বছর হতে ২০০০-০১ অর্থ বছরের উৎপাদন পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় গত নয়-দশ বছরে অভ্যন্তরীণ জলসম্পদ এবং সামুদ্রিক জলসম্পদ থেকে মৎস্য উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ৬ লক্ষ মেঃ টন। পাশাপাশি ১৯৯২-৯৩ অর্থ বছরে মোট মৎস্য ও মৎস্য পণ্য রপ্তানী হয়েছে ২৬,৬০৭ মেঃ টন এবং উহা হতে রপ্তানী আয় হয়েছিল প্রায় ৭০০ কোটি টাকা। গত ৯-১০ বছরে রপ্তানীর পরিমাণ ও আয় বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৩৯,৫৫৮ মেঃ টন এবং ২০০০ কোটি টাকা।
উল্লেখিত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে মোট উৎপাদনের মাত্র ২.৫% আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রি হচ্ছে। আর অবশিষ্ট ৯৭.৫% উৎপাদিত মৎস্য ও মৎস্য পণ্য অভ্যন্তরীণ বাজারে বাজারজাত করা হচ্ছে। দেশের আপামর জনসাধারণ এই ৯৭.৫% ভাগ মৎস্য পণ্যের দ্বারা তাদের দৈনন্দিন আমিষের চাহিদা পূরণ করছেন। অভ্যন্তারীণ বাজারে বাজারজাত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন করপোরেশন বেসরকারী ও ব্যক্তি ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি কাজ করছে। স্বাধীনতার পূর্ব হতেই মৎস্য উন্নয়ন করপোরেশন স্থানীয়ভাবে মৎস্য ও মৎস্য পণ্য বাজারজাত করছে। বেশ কিছু বেসরকারী প্রতিষ্ঠান প্রোটিন হাউজ নামে ঢাকা শহরের হিমায়িত ও তাজা মাছ বাজারজাত করছে। তবে বর্তমানে চাহিদা অনুসারে তাদের সরবরাহের পরিমাণ অত্যন্ত কম। অভ্যন্তরীণ বাজারে বাজারজাত করার লক্ষ্যে এবং স্থানীয় জনসাধারণকে মান সম্পন্ন মৎস্য পণ্য সরবরাহ করার জন্য স্থানীয় মৎস্য বাজার, আড়ত সমূহের মান উন্নয়ন অপরিহার্য। আন্তর্জাতিক বাজারে আমাদের পণ্যের সুনাম বজায় রাখতে হলে অভ্যন্তরীণ বাজারের মান উন্নয়ন করতে হবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের চাহিদা এবং WTO সমঝোতা স্মারক অনুসারে আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে মিল রেখে স্থানীয়

বাজারের উন্নয়ন করতে হবে। অর্থাৎ SPS(Sanitary & Phytosanitory) বিষয়গুলো রপ্তানীকারক দেশ এবং আমদানীকারক দেশের মানের সমান হতে হবে।

বর্তমান বিশ্বের চাহিদা অনুসারে স্বাস্থ্যসম্মত মৎস্য পণ্য উৎপাদন এবং তা রপ্তানীর মাধ্যমে ২০০৫ সালের মধ্যে রপ্তানীর পরিমাণ ৬০,০০০ মেঃ টনে উন্নীত করা সম্ভব এবং রপ্তানী আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব বর্তমানের ২০০০ কোটি থেকে ৩,০০০ কোটি টাকায়।

অভ্যন্তরীণ বাজারে বাজারজাত করার জন্য সুষ্ঠু সংরক্ষণ ও স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা না থাকার কারণে মোট মাছ উৎপাদনের ৪-৫% পণ্য ভোক্তাদের নিকট পৌঁছার পূর্বেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যার মূল্য বর্তমান বাজার দর অনুসারে ৪০০-৫০০ কোটি টাকা। এই বিপুল পরিমাণ মৎস্য সম্পদ দূষণ ও পঁচন থেকে রক্ষা করে স্বাস্থ্যসম্মত অবস্থায় সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরা হলে দেশে আমিষের চাহিদা পুরণে যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারে।

বর্তমানে আমাদের উৎপাদিত পণ্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হচ্ছে। ইইউ এর দেশসমূহে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, জাপান আমাদের মৎস্য পণ্যের প্রধান ক্রেতা। এদের চাহিদা অনুসারে আমাদের স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের মধ্যে সমন্বয় আনতে হবে। তাহলেই আন্তর্জাতিক বাজার ধরে রাখা সম্ভব।

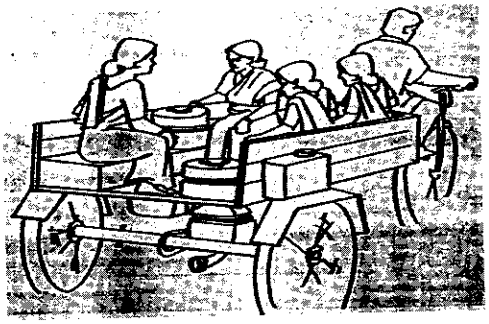

১৫৪ (ক)

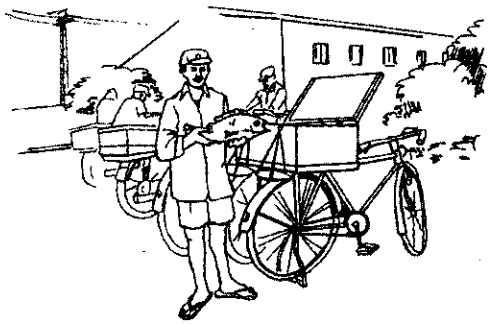

১৫৪ (খ)

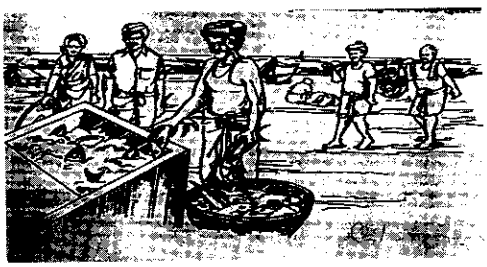

১৫৪ (গ)

১৫৪ (ঘ)

চিত্র ঃ ১৫৪ পরিবহণের বিভিন্ন চিত্র

বিভিন্ন প্রকার প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি

মৎস্য ও মৎস্য পণ্যের গুণাগুণ সংরক্ষণ বলতে যে তাজা ধৃত মাছের যে সকল গুণাগুণ রয়েছে তার সকল খাদ্যমান ও গুণাগণ বজায় রেখে ক্রেতার চাহিদা অনুসারে দীর্ঘ মেয়াদী ও স্বল্প মেয়াদীভাবে সংরক্ষণ করে বাজারজাত করা।

মাছ বা চিংড়ি বিভিন্নভাবে প্রক্রিয়াজাত করে সংরক্ষণ করা যায়। সাধারণতঃ যে সকল প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাত করা হয় তা হলো -

১। বরফায়িত করে বা বরফ দ্বারা সংরক্ষণ করা
২। শুকিয়ে শুটকী তৈরী করা
৩। হিমায়িত করা
৪। কৌটাজাত করা

বরফায়িত বা বরফ দ্বারা সংরক্ষণ

মাছ ধরার পর পরিষ্কার ঠান্ডা পানি দিয়ে ধোয়ার পর ১:১ হারে মাছ ও বরফ মিশিয়ে মাছকে সংরক্ষণ করা যায়। বরফ মিশানোর ফলে মাছের দেহের তাপমাত্র ১°-৫° সেঃ এর মধ্যে নেমে আসে। এর ফলে মাছের ভিতরের অনুজীবের বংশ বৃদ্ধি হ্রাস পায়। অভ্যন্তরীণ বাজারজাত করার লক্ষ্যে এই প্রক্রিয়ায় মাছ সংরক্ষণ করতে হয়। এই পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াজাত মাছের গুণাগুণ প্রায় ৭ দিন পর্যন্ত বজায় থাকে। কাঠের বা প্লাষ্টিকের বাক্সে মাছ এ ভাবে সংরক্ষণ করলে মাছের গায়ে চাপ পড়ে না ফলে অন্যান্য গুণাগুণসহ আকার সুন্দর থাকে। ক্রেতার গ্রাহ্যতা বৃদ্ধি পায়। অভ্যন্তরীণ বাজারের জন্য এ পদ্ধতিতে মাছ সংরক্ষণ করে বাজারজাত করা অপরিহার্য। যে পানি দিয়ে বরফ তৈরি করা হয় তার মান স্বাস্থ্যসম্মত হওয়া বাঞ্চনীয়।

১৫৫ (ক)

১৫৫ (খ)

চিত্র ঃ ১৫৫ বরফায়িত বা বরফ দ্বারা সংরক্ষণ

হিমায়িত করে সংরক্ষণ

কারখানায় সংগৃহিত মাছ/চিংড়ি মাথা ছাড়ানো/খোসা ছাড়ানো কাজ করার পর ঠান্ডা পান উপযোগী পানি দ্বারা ধৌত করার পর ব্লাস্ট ফিজারে বা কন্ট্রাক্ট প্লেট ফ্রিজারে বা আধুনিক আইকিউ এফ মেশিনে - ৪০° থেকে -৪৫° সেঃ নিম্ন তাপমাত্রায় হিমায়িত করা হয়।

মাছের ভিতরের তাপমাত্রা যখন- ১৮° সেঃ নেমে আসে তখন তাকে ভালো ভাবে বায়ূহীন এবং ছিদ্রহীন অবস্থায় মোড়কজাত করে - ১৮° সেঃ নিম্ন তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় প্রক্রিয়াজাত মাছ ৩ থেকে ১০ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

চিত্র ঃ ১৫৬ হিমায়িত করে সংরক্ষণ

কৌটাজাত করে সংরক্ষণ

বাংলাদেশে এখনও কৌটাজাত করে মৎস্য ও মৎস্য জাত পণ্য উৎপাদন বাণিজ্যিক ভাবে শুরু হয় নাই। এই প্রক্রিয়ায় মাছ /চিংড়ি ক্রেতার চাহিদ অনুসারে, নাড়িভুড়ি/খোসা পরিষ্কার করার পর পান উপযোগী পানি দ্বারা ধুয়ে নিয়ে প্রয়োজনীয় মশলা/লবণ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি মিশিয়ে ছিদ্রহীন প্লাষ্টিক বা টিনের কৌটায় বায়ুশূণ্য ভাবে কৌটাজাত করা হয়। কৌটাজাত করার পর ১২১° সেঃ তাপমাত্রায় ১৫ পাউন্ড পিএসআই চাপে সিদ্ধ করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় প্রক্রিয়াজাত পণ্য সাধারণ তাপমাত্রায় প্রায় একবছর ভালো অবস্থায় থাকে। কৌটাজাত মাছ তৈরী করার সময় কৌটার মধ্যে কোন বাতাস যাতে ঢুকতে না পারে সেই ভাবে সীল করতে হবে। ইলিশ মাছ এ ধরণের কৌটাজাত করা যেতে পারে।

শুটকি তৈরী করা

শুকিয়ে শুটকী তৈরী করে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য সংরক্ষণ করা খুবই সহজ এবং কম মূলধনে করা যায়।

সাধারণতঃ নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ায় শুটকী তৈরী করা হয়

(ক) মাছ শুধু রোদে শুকিয়ে (খ) মাছ লবণ দিয়ে রোদে শুকিয়ে (গ) মাছ শুধু লবণ দিয়ে (ঘ) ধুমায়িত করে (ঙ) সোলার ড্রায়ারের সাহায্যে (চ) সিদল বা ফারমেন্টেট করে এবং (ছ) যান্ত্রিক ড্রায়ারের সাহায্যে।

মাছ শুধু রোদে শুকিয়ে শুটকী করা

আমাদের দেশে যখন প্রচুর মাছ ধরা পড়ে তখন শুটকী তৈরী করা হয। পর্যাপ্ত রোদ না থাকলে রোদে শুকিয়ে তৈরী শুটকীর মান রক্ষা করা যায় না। বাংলাদেশের কক্সবাজার টেকনাফ, দুবলারচর, চরফেশন, ময়মনসিংহ, সিলেট, সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, মৌলভীবাজার, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, বরিশাল, ঝালকাঠি এলাকায় বেশ কিছু শুটকী প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা রয়েছে। রোদে শুকিয়ে শুটকী তৈরীর সময় মাছকে ভালোভাবে কেটে নাড়ি ভুড়ি ফুলকা ফেলে দিয়ে পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হয়। তারপর মাচানে বা চাটাইয়ের উপর রোদ দিতে হয়। কোন কোন এলাকায় ঘাসের উপর বালির উপর মাছ বিছিয়ে শুকানো হয়। যা কোনক্রমেই স্বাস্থ্যসম্মত উপায় নয়।

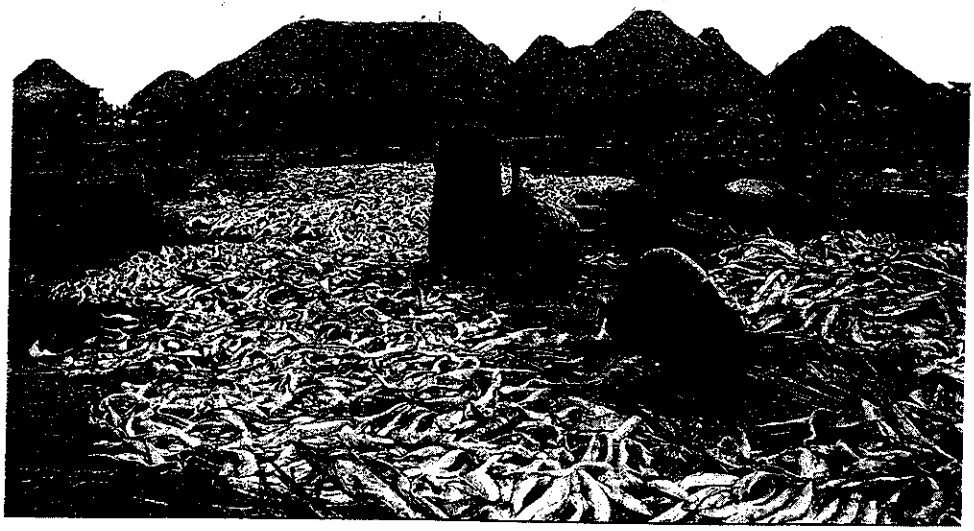

চিত্র ঃ ১৫৭ মাছ রোদে শুকিয়ে শুটকি করা

রোদে শুকিয়ে শুটকী করতে প্রায় ৫ থেকে ৭দিন সময় লাগে। যদি মাছ শুকানোর পর তার মধ্যে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ১৫-২০% এর মধ্যে থাকে তাহলে ধরে নিতে হবে মাছ ঠিকভাবে শুকিয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় প্রক্রিয়াজাতকালে শুটকীতে মাছি/পোকামাকড় বসে এবং অনেক সময় মাছি ডিম পাড়ে। যা দ্বারা মানুষ নান ধরণের রোগে আক্রান্ত হয়। আবার অনেকে শুটকীকে পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য নানা ধরণের রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে। যা মানুষ খাওয়ার ফলে নানা প্রকার রোগ সহ ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। স্বাস্থ্যসম্মতভাবে শুটকী তৈরী করতে পারলে এবং স্বাস্থ্যসম্মতভাবে সংরক্ষণ করলে এর খাদ্যমান অনেক দিন পর্যন্ত বজায় থাকে। কোন অবস্থাতেই শুটকীতে বিষাক্ত কোন কীটনাশক ব্যবহার করা যাবে না। এটা আইনতঃ অপরাধ।

লবণাক্ত করে সংরক্ষণ

মাছ ধরার পর নাড়িভুড়ি ফেলে দিয়ে পরিষ্কার পানি দ্বারা ধোয়ার পর পরিষ্কার পাত্রে বা প্লাষ্টিকের টাবের মধ্যে ৪:১ মাছ ও লবণ মিশিয়ে ২৪ ঘন্টা মাছকে ডুবিয়ে রাখা হয়। মাছ লবণে ভিজিয়ে রাখার ফলে প্ররিশ্রাবণ প্রক্রিয়ায় মাছের ভিতর লবণ ঢুকে যায় এবং মাছের ভিতরের পানি বের হয়ে যায়। পরে মাছের গায়ের উপরের লবণ পরিষ্কার করে রোদে শুকিয়ে বায়ু শূন্য প্লাষ্টিক ব্যাগে সংরক্ষণ করতে হয়। লবন মাছের পঁচন প্রতিরোধ করে। বাংলাদেশে ইলিশ, পোয়ামাছসহ বেশ কিছু সামুদ্রিক মাছ লবণাক্ত করে প্রক্রিয়াজাত করা হয়। এ সকল প্রক্রিয়াজাত মাছ সাধারণতঃ সিংগাপুর, হংকং ও চীনে রপ্তানী হয়ে থাকে। আমাদের স্থানীয় বাজারে লোনা ইলিশের চাহিদা প্রচুর।

লবণ ও রোদে শুকিয়ে

১০% লবণ দ্রবণে মাছকে ৩০ থেকে ৬০ মিনিট ভিজিয়ে রাখার পর মাছ রোদ শুকানো হয। এই প্রক্রিয়ায় মাছ শুকানোর সময় সাধারণঃ রোদে শুকিয়ে শুটকী তৈরির চেয়ে সময় কম লাগে এবং এর মানও কিছুটা ভালো থাকে। শুকানোর পর ছিদ্রহীন পলিথিনে +৫° সেঃ হইতে +১০° সেঃ তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা হলে মাছের মান দীর্ঘ দিন ভালো থাকে।

ধুমায়িত করে শুটকী তৈরী

বাংলাদেশে এই প্রক্রিয়ায় শুটকী করা খুব একটা প্রচলিত নয়। বর্ষা মৌসুমে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে কিছু কিছু মাছ/চিংড়ি ধুমায়িত করে প্রক্রিয়াজাত করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় মাটিতে গর্ত করে বা ড্রামে চুল্লি বানিয়ে কাঠ/ধানের কুড়া দ্বারা ধোঁয়া তৈরী করা হয়। চুল্লির উপর তাকে (সলফ) মাছ সারিবদ্ধ ভাবে সাজিয়ে রাখা হয়। ধোঁয়া সঞ্চালনের ফলে মাছের বর্ণ হলুদ হয়ে যায় এবং চুল্লির ভিতরের তাপমাত্রার চেয়ে ৮ থেকে ১০° সেঃ বৃদ্ধি পায়। ফলে মাছ তাড়াতাড়ি শুকায়। মাছ যখন হলুদাভ বর্ণ ধারণ করে ৭৫তখন বুঝা যাবে মাছ শুকিয়েছে। এ অবস্থায় তৈরী শুটকী ছিদ্রহীন বায়ুশুন্য ব্যাগে ভরে + ৫° সেঃ হইতে- ১০° সেঃ নিম্ন মাত্রায় সংরক্ষণ করা হলে উপাদিত শুটকী অনেক দিন পর্যন্ত মান বজায় থাকে।

সোলার ড্রয়ারের সাহায্যে

ইহা খুবই স্বাস্থ্যসম্মত পন্থা। এই প্রক্রিয়ায় প্রক্রিয়াজাত শুটকী বিভিন্ন রোগ জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। বাঁশের মাচানে প্লাষ্টিক দ্বারা তাঁবু বানাতে হয়। তাঁবুর যে দিক দিয়ে সুর্যের আলো পৌছাবে তার উল্টোদিকের অংশটুকু কালো হতে হবে যাতে আলো প্রতিফলিত হতে পারে। ফলে তাবুর ভিতরের তাপমাত্রা ৫-৮° সেঃ বেড়ে যায়, এতে মাছ সনাতন পদ্ধতির শুটকী তৈরীর প্রায় অর্ধেক সময়ে শুকায়। সুর্যের আলো পর্যাপ্ত হলে এভাবেই প্রক্রিয়াজাত করা সহজ ও খরচ কম। কিন্তু অতিরিক্ত বাতাসে এই প্রক্রিয়াজত করা যায় না কেননা বাতাস তাবুকে নষ্ট করে দেয়।

যান্ত্রিক ড্রায়ারের সাহায্যে

পৃথিবীর উন্নত দেশ সমুহে যান্ত্রিক ড্রায়ারের সাহায্যে মাছ শুকানো হয। আমাদের দেশে এই ভাবে প্রক্রিয়াজাতকরণ এখনও চালু হয় নাই। এর খরচ বেশী বিধায় আমাদের আর্থ সামাজিক অবস্থায় ইহা দ্বারা শুটকী তৈরীর পদক্ষেপ কেহ গ্রহন করেন নাই।

শুটকী সংরক্ষণ ব্যবস্থা

শুটকী তৈরী করে ছিদ্রহীন বায়ুশুন্য পলিথিনে +৫° সেঃ ১০° সেঃ নিম্ন তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা হয় তা হলে ১২-১৫ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। সিদল বা ফারমেন্টেড শুটকী সাধারন অবস্থায় বায়ুহীন পাত্রে সংরক্ষণ করা হলে ৬-৯ মাস মান সম্পন্ন ভাবে সংরক্ষণ করা যায়।

সিদল বা ফারমেন্টেড শুটকী

বাংলাদেশের বিশেষ করে সিলেট এলাকায় এই পদ্ধতি প্রক্রিয়াজাত করার ক্ষেত্রে পাতিলটি ছিদ্রহীন করে নিতে হয়। প্রথমে মাটির পাতিলটিকে মাছের তৈল বা সোয়াবিন তৈল দ্বারা ভিতরে মুছে আগুনের হালকা তাপে শুকিয়ে নিতে হয়। তারপর মাছ পাতিলে সারিবদ্ধভাবে বিছিয়ে দিতে হয়। প্রতি এক পরল পর কলাপাতা দিয়ে বায়ুরোধী করা হয। বায়ুরোধ হওয়ায় মাছ আরো ভালো ভাবে ফারমেন্টেড হয়। মাছ পাতিলে ভরার পর এর মুখ কলাপাতা ও মাটির ঢাকনা লাগাতে হয। ঢাকনাযুক্ত মাছ ভর্তি পাতিল ২-৩ মাস মাটিতে পুতে রাখতে হয। মাটির নীচে এই মাছ ফারমেন্টেড হয়। তিন মাস পর মাটি থেকে তুলে উপরের পানি ফেলে দিয়ে পরিস্কার পাত্রে সংরক্ষণ করা হয়।

উন্নত ও স্বাস্থ্য সম্মত বাজার ব্যবস্থা

উন্নত ও স্বাস্থ্য সম্মত বাজার ব্যবস্থার বিষয়টি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে খুবই ব্যাপক পরিসরে বিস্তৃত। উন্নত ও স্বাস্থ্যসম্মত বাজার ব্যবস্থা বলতে আমরা সাধারণ ভাবে বুঝি আমাদের বর্তমান ও সনাতন পদ্ধতির পরিবর্তন করে কিভাবে মান সমপন্ন পণ্য বাজারজাত করা যায়। এ প্রেক্ষিতে আমাদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় আনতে হবে।

পরিবহন ব্যবস্থা

বাংলাদেশের অধিকাংশ মৎস্য পণ্যই পরিবহণ ব্যবস্থার ত্রুটির কারণেই সাধারণতঃ দুষিত বা নষ্ট হচেছ। পরিবহনকালে যে বিষয়গুলো নজর দেয়া প্রয়োজন তা হলো,

১। হোগলা পাতা, চাটাই, বাঁশের ঝুড়িতে মাছ বা চিংড়ি সংরক্ষণ ও পরিবহন না করা।

২। পরিস্কার তাপ নিরোধক প্লাষ্টিকের বাক্সে মাছ বা চিংড়ি সংরক্ষণ ও পরিবহণের ব্যবস্থা করা।

৩। বরফবিহীন অবস্থায় মাছ বা চিংড়ি পরিবহন না করা।

৪। মাছের বা চিংড়ির সতেজতা কৃত্রিমভাবে ধরে রাখার জন্য কোন ধরণের রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার না করা।

৬। অস্তরীত (Insulated van) যান বা হিমায়িত যানে মাছ বাক্সে বরফসহ সংরক্ষণ করে পরিবহন করা।

অভ্যন্তরীণ বাজার উন্নয়ন

দেশে মাছের বাজার বলতেই একটি অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের চিত্র ভেসে উঠে। অথচ মাছের বাজার তুলনামূলকভাবে বেশী স্বাস্থ্যসম্মত হওয়া বাঞ্চনীয়। কারণ বাজারে মাছ সাধারণতঃ মৃত প্রাণির বাজার বিশেষ। যা সহজেই সংক্রমিত হতে পারে। তাই উন্নত স্বাস্থ্যসম্মত বাজার অবকাঠামো দরকার। উপজেলা পর্যায় থেকে জেলা শহর পর্যায়ে মাছ বাজারগুলোর অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রয়োজন। মাছের বাজারে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, উঁচু পাকা প্লাটফর্ম, ঢাকনাযুক্ত ড্রেন, ছাদযুক্ত সেড, চারিদিকে তারের জাল যাতে সহজেই মাছি ঢুকতে না পারে ইত্যাদি প্রয়োজন। মাছের বাজারে বরফ সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকা অপরিহার্য। এই বাজারে সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা অপরিহার্য।

মাছের পরিবহণ ও বাজার ব্যবস্থার উন্নতি হলে সার্বিকভাবে দেশের মানুষের কাছে গুণগত মাছের প্রাপ্যতা সহজ হবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ব্যাংক ঋণ প্রাপ্তির নিয়ম ও পদ্ধতি

প্রাণিজ আমিষের যোগানে, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে ও কর্মসংস্থানে মাছের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত চাপে মাছের চাহিদা আর যোগানের ফারাক দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে উদ্যোগক্তাগণের অর্থাভাব। তাদের পুঁজির অভাবে বিনিয়োগ কম, ফলে উৎপাদন ও আয় আরো কম। এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশিকা, অনুসরনের মাধ্যমে কৃষি ঋণের পাশাপাশি মৎস্যচাষের জন্য বিভিন্ন ব্যাংক ঋণ প্রদান করে আসছে।

পুকুরে মৎস্যচাষ ঋণদান কর্মসূচী

এই কর্মসূচীটি রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহ কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

আবেদনকারীর যোগ্যতা

দরখাস্তকারীকে এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। পুকুরের মালিক, ইজারাদার, যৌথ মালিকানাধীন পুকুরের অংশীদারগণ হতে আমোক্তার নামা (Power of attorney) বা সম্মতিপত্র (Letter of Consent) প্রাপ্ত অংশীদারগণ আবেদনের যোগ্যতা রাখেন।

ঋণের আবেদনপত্র দাখিল

আগ্রহী প্রার্থীগণকে ব্যাংক শাখা/স্থানীয় উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার অফিস হতে ঋণের আবেদনপত্র বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়। আবেদনপত্র যথাযথভাবে পুরণের পর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কাছে দাখিল করতে হবে। উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা আবেদনপত্র পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট পুকুরের কারিগরী সম্ভাব্যতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন। সরেজমিনে পুকুর তদন্ত শেষে কারিগরী সম্ভাব্যতা সন্তোষজনক হলে ও মালিকানা যথার্থ মনে হলে আবেদনপত্র সুপারিশসহ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের শাখায় পাঠাবেন।

ঋণের জামানত ও দলিলপত্র

ব্যাংক ঋণ পেতে হলে নিম্নোক্ত দলিলপত্র জমা দিতে হয় ঃ

জমির মালিকানা রেকর্ড ঃ পর্চা বা খতিয়ান (বিশেষ করে এস এ পর্চা)
পুকুরের বন্ধকী দলিল।
ঋণ গ্রহণকারী যদি পুকুরের মালিকানায় সঠিক দলিল দেখাতে না পারেন তাহলে স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক দিয়ে ঋণ নিতে পারেন।
অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে সম্মতিপত্র এবং আম-মোক্তার নামা দাখিল
পুকুর ইজারা নেয়া হলে ইজারার দলিলপত্র দাখিল এবং তাছাড়া সম্মানিত লোক যেমনঃ ইউ,পি, চয়ারম্যান, সদস্য, স্থানীয় ডাক্তার এবং শিক্ষকদের নিকট হতে ব্যক্তিগত জামানত ।

ঋণের দরখাস্ত গ্রহণের সময়সূচি

২০ জানুয়ারীর মধ্যে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার নিকট দরখাস্ত দিতে হবে। ১৫ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দরখাস্তগুলি ব্যাংকের নিকট প্রেরণ করবেন। ১৫ মার্চের মধ্যে উপযুক্ত প্রার্থীর ব্যাংক ঋণ বরাদ্ধ মঞ্জুর করবেন।

ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ

ব্যাংকের কর্মকর্তা প্রাপ্ত আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট দলিলপত্রাদি পরীক্ষা করবেন। প্রয়োজনে একক বা যৌথভাবে পুকুর পরিদর্শন করবেন। ঋণ মঞ্জুরীর পর জামানত সংক্রান্ত এবং অন্যান্য চুক্তিপত্র সম্পাদনের পর ব্যাংক শাখা ঋণ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ঋণ গ্রহীতার একটি তালিকা ঋণের তথ্যাবলীসহ ব্যাংক শাখা স্থানীয় মৎস্য কর্মকর্তাকে সরবরাহ করবে যেন উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট পুকুরগুলি যথাযথ তত্ত্বাবধানে রাখতে পারেন। যে সকল আবেদন বাতিল করা হবে তার তালিকাও কারণসহ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার নিকট ব্যাংক শাখা প্রেরণ করবে। প্রার্থীত ঋণ মঞ্জুরে ব্যাংক কোন কারণে অপারগ হলে ব্যাংক তাদের সিদ্ধান্ত আবেদনকারীকে কারণসহ লিখিতভাবে জানাবে।

ঋণের সর্বোচ্চ সীমা

মৎস্য ঋণ হিসাবে ব্যাংক বিঘা প্রতি সর্বোচ্চ ১৭২০০/- টাকা প্রদান করবে এবং সর্বোচ্চ ৩ বিঘা বিশিষ্ট পুকুরের মৎস্য ঋণ প্রদান করবে।

পুনঃ খননকৃত পুকুরের ক্ষেত্রে ৩ কিস্তিতে এই ঋণ প্রদান করা হয়। প্রতি কিস্তির পর পরিদর্শন রিপোর্টের প্রয়োজন হয়। সকল ঋণ গ্রহীতাকে ঋণের জামানত ও দলিলপত্র জামানত হিসেবে ব্যাংকের নিকট অঙ্গীকারপত্র (ডি, পি, নোট) প্রদান এবং ব্যাংকের অনুকূলে পুকুরের মৎস্য বন্ধকীকরণ দলিল (Hypothecation Deed) সম্পাদন করতে হয়। অঙ্গীকার পত্রের (ডি,পি, নোট) অর্পন পত্র (Delivery letter) জামানতকারীর দ্বারা (যদি থাকে) স্বাক্ষর করাতে হয়। এ ছাড়াও নিম্নোক্ত জামানত ক্ষেত্র বিশেষে ব্যাংক গ্রহণ করবে।

- ঋণ গ্রহীতা নিজে পুকুরের মালিক হলে সহায়ক জামানত (Co-Sharer) হিসেবে সংশ্লিষ্ট পুকুরটির বন্ধকী দলিল ব্যাংকের অনুকূলে রেজিষ্ট্রি করে দিতে হবে। যদি পুকুরের মূল মালিকানা দলিল না থাকে তবে অন্য কোন স্থাবর সম্পত্তি ব্যাংকের অনুকূলে নিবন্ধনকৃত বন্ধক হিসেবে প্রদান করবে।

- ঋণ গ্রহীতা পুকুরের অংশীদার (Co-Sharer) হলে অবশিষ্ট সকল অংশীদার হতে আম-মোক্তারনামা (Power of attorney) অথবা তাদের সম্মতিপত্র (letter of consent) ব্যাংকে জমা দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতাকে তার অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি ব্যাংকের অনুকূলে নিবন্ধিকৃত (registered) বন্ধকী হিসেবে প্রদান করতে হবে। ব্যাংকের অনুকূলে বন্ধকীকৃত পুকুর বা জমি সকল প্রকার দায়মুক্ত বলে ঋণ গ্রহীতাকে ষ্ট্যাম্প পেপারে একটি প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করতে হবে।

- ঋণ গ্রহীতা পুকুরের ইজারাদার হলে সংশ্লিষ্ট চুক্তিপত্র গ্রহণ করতে হবে। এ ছাড়া স্থানীয় গণ্যমান্য ও যথেষ্ট স্থাবর সম্পত্তির মালিক (চেয়ারম্যান/মেম্বার/ডাক্তার/শিক্ষক) এর নিকট থেকে ব্যক্তিগত পরিশোধ নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে।

- বন্ধকীকৃত জমির/পুকুরের মূল্য প্রচলিত বাজার দরের সাথে সংগতি রেখে নির্ধারণ করতে হবে।

ঋণ পরিশোধ

ঋণ বিতরণের ১৮ মাস পর ঋণ পরিশোধ শুরু হবে এবং ঋণ গ্রহীতার ৪টি সমান বার্ষিক কিস্তিতে সম্পূর্ণ সুদসহ ঋণ পরিশোধ করবে।

সুদের হার

এই ঋণের ক্ষেত্রে সুদের হার বর্তমান সুদনীতি অনুযায়ী স্ব স্ব ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত হবে। খেলাপী ঋণের ক্ষেত্রে ঋণ পরিশোধের নির্দিষ্ট তারিখের পরের দিন থেকে ঋণ প্রদানকারী ব্যাংক সমূহ ঋণ গ্রহীতার নিকট থেকে নির্ধারিত হারে সুদ আদায় করবে।

ঋণ ব্যবহারের তদারকী ও আদায়

ব্যাংক শাখা প্রদত্ত অর্থের সঠিক ব্যাখ্যা নিশ্চিত করবে। উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ঋণ গ্রহীতাকে প্রয়োজনীয় কারিগরী পরামর্শ প্রদান পূর্বক ব্যাংক ঋণের যথাযথ ব্যবহারের প্রতি নজর রাখবে এবং পরবর্তীতে ঋণ আদায়ের ব্যাপারে ব্যাংক শাখাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে। ঋণ গ্রহীতা মৎস্য বিভাগ ও ব্যাংক প্রতিনিধির উপস্থিতিতে পুকুরে পোনা ছাড়ার ব্যবস্থা করবে এবং মাছ ধরার তারিখেও উক্ত প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থাকবেন।

এ ছাড়াও বড় আকারের মাছ চাষের জন্য প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যাংকের নিজস্ব ঋণ ব্যবস্থা রয়েছে।

চিত্রঃ ১৫৮ মৎস্য চাষের জন্য ব্যাংক ঋণ

চতুর্দশ অধ্যায়

মৎস্য চাষের উপকরণ ও প্রাপ্তিস্থান

বাংলাদেশে মাছ চাষের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। বর্তমানে দেশে শত শত হ্যাচারি ও বাণিজ্যিক মৎস্য খামারে পোনা উৎপাদন ও মাছ চাষ ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সব কর্মকান্ডে ব্যবহৃত উপকরণ যেমন, মাছের উন্নত জাতের পোনা, চুন, সার, খাদ্য, জাল, ঔষধ ও রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি প্রাপ্তির তথ্য সম্পর্কে হ্যাচারি, নার্সারী অপারেটর, মৎস্য চাষী ও উদ্যোক্তাবৃন্দ অবহিত নয়। তাই তাদের সুবিধার্থে নিম্নে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদত্ত হল ঃ

পোনা

পুকুরে মাছ চাষের সফলতা নির্ভর করে উন্নত জাতের সুস্থ্য সবল ও সঠিক প্রজাতির বড় পোনা মজুদের উপর। সুস্থ্য সবল পোনা পেতে হলে নিকটস্থ সরকারী মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারে যোগাযোগ করে সংগ্রহ করা যায়। দেশে মোট ১১২টির সরকারী মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার/হ্যাচারি রয়েছে। তাছাড়া ব্যক্তি মালিকানাধীন খামার থেকেও সুস্থ্য সবল পোনা সংগ্রহ করা যায়। তবে সেক্ষেত্রে তার গুণগত দিকটা নিশ্চিত হওয়া দরকার। উন্নত জাতের পোনা সংগ্রহের জন্য বাংলাদেশ মাৎস্য গবেষণা ইনিষ্টিটিউটের বিভিন্ন কেন্দ্রে/উপ-কেন্দ্রেও যোগাযোগ করা যাতে পারে।

সার

পুকুরে প্রকৃতিক খাদ্যের যোগান দিতে জৈব এবং অজৈব সার প্রয়োগ করতে হয়। জৈব সার আমাদের গৃহস্থালি মজুদ থেকেই পাওয়া যায়। অজৈব বা রাসায়নিক সার (ইউরিয়া, টিএসপি,এমপি ইত্যাদি) স্থানীয় বাজারে সারের ডিলারদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা যায়।

সম্পূরক খাদ্য

অধিক উৎপাদন পেতে হলে প্রাকৃতিক খাবারের সাথে সাথে সম্পূরক খাবার বাহির থেকে দিতে হয়। বর্তমানে কারখানায় তৈরী খাবারও পাওয়া যায়। সুষম খাবার তৈরীর জন্য বাংলাদেশ মাৎস্য গবেষণা ইনিষ্টিটিউট কর্তৃক প্রদত্ত খাদ্য তৈরী ফর্মূলা প্রয়োগ করা যেতে পারে। তাছাড়া বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সম্পূরক খাদ্য তৈরি করে থাকে।

জাল

প্রতিমাসে নিয়মিত ভাবে পুকুর থেকে কিছু মাছ ধরে মাছের বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হয়। তাছাড়া উৎপাদন মৌসুম শেষে মাছ বাজারজাতকরণের জন্য মাছ ধরতে হয়। এ কাজটা করতে হলে জালের প্রয়োজন হয়। এ জাল **বিএফডিসি** থেকে সংগ্রহ করা যায়। তাছাড়া ঢাকার কেরানীগঞ্জের জিঞ্জিরা বাজারে, চাঁদপুরে, মুন্সিগঞ্জে এবং স্থানীয় বাজারেও জাল পাওয়া যায়।

ঔষধ পত্র

মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য পুকুরের উর্বরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সার, চুন ইত্যাদি ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়ে পরে। অন্যদিকে মাছের পোনা ও বিপণনযোগ্য মাছকে রোগের প্রাদুর্ভাব থেকে রক্ষা করতে হলে বিভিন্ন ঔষধ ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার আবশ্যক। বিভিন্ন প্রয়োজনীয় এই সব দ্রব্যাদির তথ্য দেয়া হল।

ক্রমিক নং	দ্রব্যের নাম	ব্যবহার
১।	চুন	পুকুর প্রস্তুত ও মাছ চাষ কার্যক্রমে ।
২।	রাসায়নিক সার	পুকুরে মাছের খাবার তৈরীর জন্য।
৩।	ডিপটারেক্স, সুমিথিয়ন	হাঁসপোকা মারার জন্য ও আরগুলাস দমন করার জন্য।
৪।	রোটেনন	পুকুরের রাক্ষুসে ও অচাষযোগ্য মাছ দমনের জন্য।
৫।	ম্যালাকাইট গ্রীণ ও মিথিলিন ব্লু	ছত্রাক জনিত রোগ দমনের জন্য।
৬।	পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট	ব্যাকটেরিয়া বা প্রোটোজোয়াজনিত রোগ দমনের জন্য।
৭।	তুতেঁ	শ্যাওলা দমনের জন্য।
৮।	এন্টিবায়োটিক (টেরামাইসিন)	ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগ দমনের জন্য।
৯।	লবণ	পোনা শোধন, ছত্রাকজনিত রোগ দমন, পরজীবি আক্রান্ত মাছ চিকিৎসার জন্য।

পরামর্শক সেবা

মৎস্য অধিদপ্তরের কার্য-পরিধীর মধ্যে চাষীদেরকে পরামর্শ সেবা দেওয়া উল্লেখযোগ্য। জেলা মৎস্য অফিস, উপজেলা মৎস্য অফিস, উপ-পরিচালক (মৎস্য) এর অফিসে মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে চাষীদেরকে পরামর্শ প্রদান করা হয়। তাছাড়াও সরকারী মৎস্যবীজ উৎপাদন খামার/হ্যাচারিতে এবং মৎস্য অধিদপ্তরের সদর দপ্তর এর সম্প্রসারণ শাখা হতেও চাষীদেরকে পরামর্শ প্রদান করা হয়। মাছের প্রজনন, ব্রুড ব্যবস্থাপনা, জাত উন্নয়ন, খাদ্য প্রয়োগ, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন প্রজাতি সংরক্ষণ, চিংড়ি চাষ ও ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে বাংলাদেশ মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুটের বিভিন্ন কেন্দ্রে/উপ-কেন্দ্রে পরামর্শ প্রদান করে থাকে। বাজারজাতকরণের বিভিন্ন বিষয়ে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো এবং মৎস্য অধিদপ্তরের খুলনা, চট্টগ্রাম ও ঢাকাস্থ দপ্তর পরামর্শ প্রদান করে থাকে। গ্রাম পর্যায়ে ফলাফল প্রদর্শক মৎস্য চাষীরাও সাধারণভাবে মাছ চাষের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে কিছু পরামর্শ দিতে পারেন।

মৎস্যচাষে উপকরণসমূহের প্রাপ্তি স্থান

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের মান ও ঠিকানা	উপকরণাদির নাম
১।	সেমকো সুবাস্ত টাওয়ার (১২ তলা) ৬৩, পান্থপথ, ঢাকা।	রোটেনন, রটিফার, আর্টিমিয়া, সেকুফন-৮০ এমসি, কেল্পমিল, চিংড়ি ও মৎস্য খাবার।
২।	বাংলাদেশ ব্রিডিং কমপ্লেক্স তালুকদার ভবন, ৬৭/এ, সেন্টাল রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা। ফোন- ৮৬১৬৭১০,ফ্যাক্স-৮৬১১৯৯৭	চিংড়ি ও মৎস্য খামারের যন্ত্রপাতি আর্টিমিয়া, রটিফার, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, এয়ার ব্লোয়ার।
৩।	বেঙ্গল ওভারসীজ লিমিটেড ২৮/এ, নয়াপল্টন, (৪র্থ তলা) ঢাকা-১০০০	আর্টিমিয়া, ভিটামিন, মিনারেল প্রিমিক্স, পিজি, এইচ,সি,জি কোরোলন, রটিফার, ওভাপ্রিম ইত্যাদি।
৪।	প্রগতি ফিস লিমিটেড কেডি-এ এ্যাভিনিউ, খুলনা ফোন- ০৪১-২৪৫৭৭, ২২৩৬৭	চিংড়ি ও মাছের সম্পুরক খাদ্য প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী
৫।	নিরিবিলি ফিস ফিড মিলস লিঃ শহীদ সরণী, হোটেল নিরিবিলি, কক্সবাজার ফোন- ০৩৪১-৪৩২৪	চিংড়ি ও পাংগাস মাছের পিলেট খাদ্য উৎপাদনকারী ও সরবরাহকারী
৬।	ওরিয়েন্টাল ফিস ফিড ইটাখোলা, নরসিংদী। মোবাইল- ০১৭৩৩০২১৭	মাছের পিলেট খাদ্য উৎপাদনকারী ও সরবরাহকারী
৭।	সৌদি বাংলা ফিস ফিড লিমিটেড ১/বি আউটার সার্কুলার রোড, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭	চিংড়ি, পাংগাস মাছের খাদ্য প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী
৮।	কোয়ালিটি ফিড্স লিমিটেড বাড়ী নং- ১৫ (৩য় তলা) সড়ক নং- ৮, সেক্টর- ৩, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০ ফোন- ৮৯৬০২৪-৫	চিংড়ি, পাংগাস ও অন্যান্য মৎস্য এবং পোল্ট্রী খাবার প্রস্তুতকারক
৯।	ইউরো এশিয়াটিক ২৮/এ, নয়াপল্টন (৩য় তলা) ঢাকা- ১০০০ ফোন- ৯৩৩৪৬৬৪	ফিস মিল, হ্যাচারির যন্ত্রপাতি সরবরাহকারী।
১০।	ক) রামা কর্পোরেশন ৪২, তোপখানা রোড প্রীতম ভবন (দোতলা), ঢাকা- ১০০০ ফোন- ৯৫৫৭১২৯, ৯১২১১৫৪ খ) এম এ সামাদ ৮৫/এ ,তেজকুনি পাড়া, তেজগা, ঢাকা। মোবাইল-০১৭৩১৩৬৭৯	এরেটর (প্যাডল হুইলার), এয়ার ব্লোয়ার, পিজি, এইচ সি জি, এল, আর, এইচ, ডম ইত্যাদি।

১১।	ক্রিসেন্ট গ্রুপ অব কোম্পানীজ ৩৬, তোপখানা রোড, ঢাকা-১২০০ ফোন- ৯৫৬২৫০৮, ৯৫৬২৯৬৯	এরেটর এবং আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি
১২।	হালিম ফাউন্ডেশন ৩২, বঙ্গবন্ধু এ্যাভিনিউ, ঢাকা- ১০০০	আর্টিমিয়া, বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও যন্ত্রপাতি
১৩।	ডি, ইউ ইনস্ট্রুমেন্ট ৩২, বঙ্গবন্ধু এ্যাভিনিউ, ঢাকা- ১০০০	মৎস্য চাষের জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যদি
১৪।	এসেনসিয়াল সাইন্টিফিকস ৩২, শহীদ সজরুল ইসলাম সড়ক,হাটখোলা, ঢাকা। ফোন- ৯৬৬৭০১৯	পানি পরীক্ষার কীট বক্স ও বিভিন্ন হ্যাচারির যন্ত্রপাতি
১৫।	রোন পুল্যাংক এগ্রোভেট বাংলাদেশ লিঃ ২৯, তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০ ফোন- ৮৬১৯৩৪৬	ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স
১৬।	এগ্রোকেয়ার লিঃ ক)১২৭/২, শাহ আলীবাগ মীরপুর-১, ঢাকা। ফোন- ৮০৭১১৯,৮০১১৫৪ খ) হোটেল সীভিউ লিঃ রুম নং- ২০১, কক্সবাজার। ফোন- (০৩৪১) ৪৪৯১, ৩৫১৮	আর্টিমিয়া, আর্টিমিয়া ফ্লেপ, এ,পি, স্পাইরোলিনা
১৭।	মেসার্স রশিদ পিটুইটারী ইন্ডাষ্ট্রি পুলের হাট, বেনাপোল রোড, যশোর। হেড অফিস ঃ ফোন- (০৪২১) ৩৯০৫ খ) পূর্ণমনি এন্টারপ্রাইজ মাসকান্দা, ময়মনসিংহ। ফোন- (০৯১) ৫৪১৫৮ গ) মোঃ শাহাজান মিয়া ধলা বাজার, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ ঘ) আলহাজ্ব আবদুল ওহাব ৮১/৩, শুক্রাবাদ, ঢাকা। ফান- ৯১৩১৬৯২ ঙ) শ্রী বিশ্বনাথ সরকার শাহাপুর, শান্তাহার, নওগাঁ রোড, বগুড়া। চ) কল্পতরু মৎস্য হ্যাচারি প্রোঃ ডাঃ সুলতান আহমেদ, কোম্পানীগঞ্জ, কুমিল্লা। ছ) মোঃ মফিজ মজুমদার রায়পুর, লক্ষীপুর। জ) আল-মদিনা মৎস্য হ্যাচারি, তেমুহনী, মহিপাল, ফেনী। ফোন- (০৩৩১) ৭৩৬৬৫ ঝ) নবীন মৎস্য হ্যাচারি প্রোঃ মোঃ মোস্তফা মিয়া রেল ষ্টেশন গেট, নাটোর। ফোন- (০৭৭১) ৬৬৮৩	পিজি, এইচ সিজি, কোরোলন, ওভাপ্রিম।

১৮।	ক) আন্তরিক ইন্টারন্যাশন্যাল কর্পোরেশন রুম নং- ১২ ও ১৩ দেলওয়ার কমপ্লেক্স (১ম তলা), ২৬, হাটখোলা রোড, ঢাকা-১২০৩ খ) গোল্ড কোষ্ট শ্রিম্প হ্যাচারি হ্যাচারি জোন মেরীন ড্রাইভ রোড কলাতলী, কক্সবাজার। ফোন- (০৩৪১) ৪৭২০	চিংড়ি হ্যাচারি ও মৎস্যচাষ সংক্রান্ত যাবতীয় যন্ত্রপাতি, ঔষধ, আর্টিমিয়া, খাদ্য।
১৯।	জেনারেল ডাইনামিক্স লিঃ মডার্ন ম্যানশন (১১ তলা) ৫৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা। ফোন- ৯৫৫৭১৪০	এ্যাকোয়াকালচার ইকুইপমেন্ট এবং কেমিক্যাল
২০।	লাকি ষ্টোরস, কে,সি,ডে, রোড, চট্টগ্রাম। ফোন-(০৩১) ২২৩১১০	চিংড়ি ও মাছের খাদ্যে ব্যবহৃত প্রিমিক্স
২১।	প্যারাগন এন্টারপ্রাইজ লিঃ ১৩/৫, আউটার সার্কোলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা।	মৎস্য সম্পর্কিত বিভিন্ন দ্রব্য।
২২।	জেনেটিকা ১১৪, মতিঝিল বা/এ, রেড ক্রিসেন্ট ভবন, ঢাকা-১০০০। ফোন- ৯৫৫১৩১৩	মাইক্রো ব্যাক্টার (পানি পরিশোধক), ষ্টোরিডোল-২০ (পানি দুষন নিয়ন্ত্রক এবং মৎস্য রোগ প্রতিরোধক) মাইক্রো ব্লু (শৈবাল নামক) মাইক্রো পার্ল, মোল্ট- ৭ (চিংড়ির খোলস পাল্টানোর সহায়ক সম্পুরক খাদ্য) এম এইচ-১০ (পুকুরে মাছের খাদ্যের অভাব পুরনকারী)
২৩।	কাজী মহিউদ্দিন ১২/৬, সলিমুল্লাহ রোড,মোহাম্মদপুর, ঢাকা- ১০২৭	পিজি ,এইসিজি, ফসটকসিন, কুইকফস, রোটেনন,আর্টিমিয়া
২৪।	এ, ইন্ট্রাকো (বাংলাদেশ) লিঃ ১১৪, মতিঝিল বা/এ, রেড ক্রিসেন্ট বিল্ডিং (২য় তলা) ঢাকা-১০০০	মোল্ট-৭ এম এইচ-১০
২৫।	বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, ২৪-২৫, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০	ফিসমিল, জাল
২৬।	মেসার্স হক এন্ড কোং এ-৩৪, বিসিক শিল্প নগরী, নরসিংদী।	মাছের পিলেট খাদ্য
২৭।	টেকনোকমার্স ৬, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০	হ্যাচারির যন্ত্রপাতি
২৮।	এগ্রোসার্ভ রেড ক্রিসেন্ট ভবন (৩য় তলা) ১১৪, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।	মোল্ট-৭ এম এইচ-১০ (জৈব রাসায়নিক সার)

২৯।	ইতালী এগ্রিকালচার মেডিসিন ২১১/১, আলী মার্কেট, কুড়িল চৌরাস্তা, বিশ্বরোড, ঢাকা ক্যান্ট- ঢাকা-১২১২	মোল্ট-৭ এম এইচ-১০
৩০।	বাংলাদেশ এগ্রো লাইভষ্টক ফাউন্ডেশন ৯, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, হোটেল ডন প্লাজা, (৪র্থ তলা) ঢাকা।	ফিসমিল, মাইক্রো ফার্টিলাজার।
৩১।	ফনিক্স পোলট্রি লিঃ ১৬, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০	ফসটকসিন ট্যাবলেট
৩২।	আরিফ বানিজ্য বিতান কাচারী রোড টংগী বাজার।	রোটেনন, মাছের খাদ্য, ভিটমিন প্রিমিক্স।
৩৩।	এম আর এন্টারপ্রাইজ ২/১২, ব্লক বি, হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর। ফোন- ৮১২২৮৫৭, ৮১২৪২৩ মোবাইল- ০১৮২৪০২০৮, ০১৭৮৮১৮৩৬	থাই কৈ, মনোসেক্স নাইল তেলাপিয়া পোনা
৩৪।	দেশের সকল সরকারী ও বেসরকারী মৎস্য খামার প্রয়োজনে জেলা ও উপজেলা কর্মকর্তার সহিত যোগাযোগ করে পোনার প্রাপ্তি স্থান জেনে নেয়া যাবে।	রুই জাতীয় পোনা, রাজপুটি, গিফ্‌ট তেলাপিয়া, গলদা চিংড়ি, পাংগাস ইত্যাদি
৩৫।	ক) স্বাদুপানি কেন্দ্র বাংলাদেশ মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট, ময়মনসিংহ। ফোন- (০৯১) ৫৪২২১ খ) নদী কেন্দ্র বাংলাদেশ মাৎস্য গবেষনা ইনষ্টিটিউট, চাঁদপুর	গিফট তেলাপিয়া, উন্নত রাঁজপুটি, উন্নত রুই ও কাতলা, দেশী শিং ও মাগুর, মহাশোল মাছ, কমন-কার্প, পাবদা, গুলশা, বাটা, ঘনিয়া, রেবা, কালিবাউশ, দেশী সরপুঁটি ও গলদা চিংড়ি

মুরগির বাচ্চা প্রাপ্তিস্থান

সমন্বিত মাছ ও মুরগি কার্যক্রমের জন্য মুরগির বাচ্চার প্রয়োজন। নিম্নে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে মুরগির বাচ্চার প্রাপ্তিস্থান দেয়া হলো

কেন্দ্রীয় মুরগি খামার, মিরপুর, ঢাকা (সরকারী)
বিমান পোল্ট্রি কমপ্লেক্স, ১৬ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিঃ, ইসলাম চেম্বার, ৫ম তলা, মতিঝিল, ঢাকা।
ফিনিক্স পোল্ট্রি লিঃ, ৩৪ পুরানো পল্টন, ঢাকা।
সিলভার কার্প লিঃ, আদমজী কোর্ট (নীচ তলা), ১১৫-১২০ মতিঝিল, ঢাকা।
সেবার বেঙ্গল, ৩২৫ দক্ষিন পাইক পাড়া, কল্যাণপুর, মিরপুর, ঢাকা।
উপ-পোল্ট্রি লিঃ, বাড়ী নং ৮/এ,রোড নং ১৩ (নতুন), ধানমন্ডি, ঢাকা।
কাজলী খামার, প্রঃ আলম ব্রাদার্স, ৫৩ মতিঝিল, (৪র্থ তলা) ঢাকা
ইউনাটেড ফুড কমপ্লেক্স, ১৬ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
এগস এন্ড হেনস লিঃ, কড্ডা জয়দেবপুর, গাজীপুর।

এছাড়াও দেশের বিভিন্ন জেলায় মুরগির বাচ্চা পাওয়া যায়।

পরিমাপক সমূহ

সাধারণ পরিমাপক

কঠিন পদার্থ

১ মেট্রিক টন	=	১০০০ কিলো	=	২৬.৮ মণ
১ কুইন্টাল	=	১০০ কিলো	=	২.৬৮ মণ
১ মণ	=	৩৭.৩২ কিলো	=	০.৩৭ কুইন্টাল
১ কিলোগ্রাম	=	১.০৭ সের	=	২.০২ পাউন্ড
১ সের	=	০.৯৩ কিলো	=	০.৯৩৩ পাউন্ড
১ ছটাক	=	৫৮.১২৫ গ্রাম		

তরল পদার্থ

১ গ্যালন পানি	=	৮.৩৬ পাউন্ড	=	৪.৫ লিটার	=	৩৮০০ সিসি
১ ঘনফুট পানি	=	৭.৫ গ্যালন	=	৬২.৪ পাউন্ড	=	২৮৩৫৪.৩ গ্রাম

আয়তন

১ শতাংশ	=	৪৩৫.৬ বর্গফুট	=	৪০.৪৮ বর্গমিটার
১বিঘা	=	০.৩৩ একর	=	৩৩ শতাংশ
১ একর	=	১০০ শতাংশ	=	০.৪০৫ হেক্টর
১ হেক্টর	=	২.৪৭ একর	=	১০,০০০ বর্গমিটার
১ কিলোমিটার	=	০.৬২ মাইল		
১ মিটার	=	৩.২৮ ফুট	=	১.০৯৪ গজ
১ ঘনমিটার	=	১.৩০ ঘন গজ	=	৩৫.৩১ ঘনফুট
১ ঘনফুট	=	০.০২৮ ঘনমিটার	=	২৭ লিটার পানি
১ বর্গমিটার	=	১০.৭৬ বর্গফুট	=	১০০ লিটার পানি

সাধারণ পরিমাণ

১% লবণ	=	১০ গ্রাম/ লিটার
১ঃ ১০,০০০	=	১ মিলিলিটার/১০ লিটার পানি
১ঃ ৪০,০০০	=	১ মিলিলিটার/৪০ লিটার পানি
পি.পি.এম	=	১০০০ লিটার বা ১ ঘন মিটার পানিতে ১ গ্রাম পরিমাণ
পি.পি.টি	=	১ মিলি লিটার বা ১ ঘন সেন্টিমিটার পানিতে ১ মিলি গ্রাম পরিমাণ

নির্ঘন্ট

		পৃষ্ঠা
অ	অতিরিক্ত কাদা	৪৫, ৪৬, ৮৪, ১০৪,
	অচাষযোগ্য মাছ	৪৬, ৪৭, ৪৮, ৬৬, ১১১
	অক্সিজেনের চাহিদা	৮৫
	অবকাঠামো	১৫৬, ১৬৭, ১৬৯
	অন্তঃপ্রজনন	১১০, ১১৩, ১৬৪
	অর্থনৈতিক গুরুত্ব	১৪১
	অপ্রচলিত জলাভূমি	১৫২
	অভয়াশ্রম	১৫৬
	অবক্ষয়	১৫৩
	অপরিকল্পিত সংকরায়ন	১৬৫
	অপরিণত মাছের প্রজনন	১৬৫
	অক্সিজেন	১৭০, ১৭৫, ১৮০
	অসমসত্ব	১৬৪
আ	আগাছা পরিষ্কার	৩৮, ৬৬
	আয়-ব্যয়	৯০, ৯৭
	আহরণ	১০৯, ১১৫
	আটা	১৫০
	আগাছা	১১৮, ১৩২
	আধা নিবিড়	১০৬, ১৩২
	আইল	১৩১
	আগাছা ও পাড় পরিষ্কার	৪৬, ১৩২
	আস্থাশীল সংগঠন	১৩৭
	আমিষ	১৫৮, ১৭৬
	আশ্রয়স্থল	৪৫, ৫৪
	আক্রান্ত	৮৮, ১৭৫
ই	ইউরিয়া	৪০, ৪৪
	ইছাব্রাউন	১২২
উ	উৎপাদনশীলতা	১০০, ১৬৪
	উপরি সার প্রয়োগ	৪১
	উর্বরতা	৩৮, ৫৩
	উন্নত প্রযুক্তি	৫৪, ১০০
	উন্নত পদ্ধতি	১১০
	উচচ ফলনশীল	৭৪, ১১৭
	উপযোগী জমি	১৩০, ১৩৬
এ	এরেটর	২১৮
	এন্টিবায়োটিক	২১৭

	এইচ সিজি	২২০
	এলআরএইচ	২১৮
ও	ওভাপ্রিম	২১৮
ঔ	ঔষধপত্র	২১৭
ক	কমনকার্প	১৩৩, ১৩৮
	কম্পোষ্ট	১০৬, ১১২
	কলাপাতা	৫৮
	কপার সালফেট	১০৫
	কলিচুন	৮৬, ১৫০
	ক্যালসিয়াম	১৬, ১৭
	কার্পের মিশ্রচাষ	১৬৩
	কারেন্ট জাল	১৫৭
	কারিগরি জনবল	১০১
	কীটনাশক	১৩২, ১৫৭
	কৃত্রিম প্রজনন	২৩, ৩১, ৩২
খ	খতিয়ান	৯৭
	খাদ্য দানী	৬০
	খাবার প্রয়োগ	৪২, ৫৬
গ	গলদার পোনা	৪৫, ৫৫
	গরু মোটা তাজা করন	৯৮
	গভীর নলকুপ	১০২, ১১১
	গ্যাসের সৃষ্টি	৪৬
	গিফট জাতের তেলাপিয়া	১৯, ৭১
	গিটবিহীন নাইলন জাল	১৬০
ঘ	ঘোলা পানি	৫৮, ৬৩
চ	চাষ প্রযুক্তি	৩৭, ১০০
	চিংড়ির আশ্রয় স্থল	৩৫, ৫৪
	চুন প্রয়োগ	৩৯, ৪৫
	চুনের উপকারিতা	৫০
ছ	ছত্রাক রোগ	১৮৭
	ছোট মাছ	৪৭, ১১৪

জ জলজ আগাছা পরিষ্কার ৩৮

জলাভূমি ১০০, ১০১
জীব-বৈচিত্র ১৫৭
জীবানু ২১, ৩০

ঝ ঝুঁকি কম ৮৩

ট টায়ার কর্ড জাল ১৬০

টি.এস.পি ৪১, ৫১
টেষ্ট বোরিং ১৭১

ড ডলোমাইট ১৫০

ডিপটারেক্স ৭৬, ১৮১
ডিমওয়ালা মাছ ১৫৮

ত তাপমাত্রা ৪১, ৫৭

তিলের খৈল ৮৯, ৯৫
তুঁতে ২১৭
তৈল বীজের খৈল ৫৮

থ থাই পাংগাস ১১০

দ দারিদ্রের অভিশাপ ১৬২

দারিদ্র বিমোচন ১৫
দীঘিপুকুর ১৮, ১০০
দূষণ ৮২, ১৬৯

ধ ধান ক্ষেতে মাছ চাষ ১৩০

ধানের সাথে মাছ চাষ ১৩০

ন নরম ঘাস ৫৮, ৭৫

নাইলন জাল ১৫১, ১৬০
নাইট্রেট ১৫৪
নির্গমনশীল ১১১
নেপিয়ার ঘাস ১০৮

প পদ্ধতিগতভাবে ব্যবস্থাপনা ১৩০

পরিপক্ক ৩১, ৩৬
পরিবেশের বিপর্যয় ১৬২

	পলিথিন ব্যাগ	৪১, ১৮১
	প্লাবনভূমি	১০১
	পানির বিষাক্ততা	৫৩
	পানি পরিবর্তন	৪১, ৫৬
	পিলেট	৬৭, ৬৮
	পিপিটি	১৪৯
	পিএইচ	১৪৯
	পুষ্টিমান	১৬
	পুকুর নির্বাচন	৮৪, ১০৪
	প্রতিরোধ	২৫, ৬৩
	প্রজনন ট্যাংক	১৭০, ১৭৪
	প্রণোদিত প্রজনন	১৬৮, ১৭৫
ফ	ফসফেট	১৫৪
	ফিসমিল	১০৮, ১৮৪
	ফুলকা পচাঁ রোগ	২২
ব	ব্রয়লার মুরগি	৮৭, ৮৮
	বন্দোবস্ত	১৬২
	বাঈদ	১৩৫, ১৩৬
	ব্লিচিং পাউডার	৬৩, ১০৪
	ব্রুড ব্যাংক	১৬৭
ভ	ভিটামিন	১৬, ৪২
	ভিটামিন প্রিমিক্স	৪২, ৮৮
ম	মজুদ পরবর্তী সার প্রয়োগ	
	মহুয়ার খৈল	৪৯
	মৎস্য পক্ষ	১৬
	ম্যালা কাইট গ্রীণ	২১৭
	মাছের বৃদ্ধির হিসাব	৪২
	মাছ আহরণ	৪৪, ৬৪
	মাছের রোগ	১৫, ২৪, ২৫, ৩১
	মিরর কার্প	১৯
	মেঘলা দিনে	৫৮
	মুরগির বিষ্ঠা	৪০
	মৃগেল	১৬
র	রটিফার	২১৮
	রপ্তানী	১৫, ১৪৮
	রাক্ষুসে ও অচাষ যোগ্য মাছ	৩৯
	রান্নাঘরের উচিছষ্ট-	৭২

	রোটেন	৪৮
	রোগ বালাই	৬৩, ১১৪
ল	লবনাক্ততা	১১০
	লাল মাটি	৩৯
	লাভজনক	১৫
	লাগসই	১০৪
শ	শিলা কাঁকড়া	১৪৮
	শিং	২৬
	শ্যাওলা	২১৭
স	সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ	৭৬
	সতর্কতা	৫০
	সম্পূরক খাদ্য	৫৮
	সংযোগ নালা	১৩৬
	সংকরায়ন	১৬৬
	সার প্রয়োগ	৪০
	সাংগঠনিক ব্যবস্থা	১৩৭
	সুমিথিয়ন	২১৭
হ	হরমোন ইনজেকশন	১৭৩
	হররা	১৮৪
	হাঁসের জাত	৯৪
	হ্যাচিং জার	১৭০
ক্ষ	ক্ষতিকর পোকামাকড়	৩৯
	ক্ষতিকর গ্যাস	৪২

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই ম্যানুয়েলটিতে ডঃ কামাল সিদ্দিকী সম্পাদিত 'মৎস্য', বিএআরআরএ, কেয়ার ও আইআইআরআর কর্তৃক মূদ্রিত 'বাংলাদেশে মিঠা পানিতে ক্ষুদ্র পরিসরে মাছ চাষ; বাফ্রু, বিএফআরআই, মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত বিভিন্ন পুস্তিকা, পানকৌড়ি মৎস্য প্রকল্পের তথ্য এবং অন্যান্য বই থেকে বহু তথ্য ও অংশ সন্নিবেশিত করা হয়েছে।